আধুনিক ভূগোল

লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী

Approved by the West Bengal Board of Secondery Education
as a Text-Book on Geography for Class VII
Vide Notification No. T. B. VII/G/81/64, Dated 8. 1. 81.

আধুনিক ভূগোল

প্রথম ভাগ
[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী এম. এ, বি. টি.
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ কলেজ অফ এডুকেশন,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৭০০ ০৩২
প্রাক্তন অধ্যাপক, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলিকাতা-৭০০ ০১৯

চারু পাবলিশিং কোম্পানি
সি-৮, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

ভূমিকা

আমরা ভারতবাসী। আমরা আমাদের দেশ ও দেশের মানুষকে আপন বলিয়া মনে করি, ভালবাসি। আর ভারতবাসী বলিয়া আমরা গৌরব বোধ করি। এই গৌরবের কারণ অনেক। অতীত কালে আমাদের দেশের উন্নতির কাছে পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গা হার মানিয়াছে। বর্তমানেও নানা বিষয়ে আমাদের উন্নতি হইতেছে যথেষ্ট দ্রুত তালে। অবশ্য এখনও অনেক বিষয়ে প্রয়োজনমত উন্নতি হয় নাই। তাই ভবিষ্যতে আরও উন্নতির ব্যবস্থা করা দরকার। এ বিষয়ে সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

আমাদের ভারতের সম্পর্কে আলোচনা কালে একথা মনে রাখিতে হইবে যে ইহা একটি বিচ্ছিন্ন জায়গা নহে। ইহা বিরাট পৃথিবীর অন্তর্গত ইউরেশিয়া ভূভাগের দক্ষিণ অংশের একটি দেশ। পৃথিবীতে আরও দেড় শতের বেশী দেশ আছে। যেমন, পাশেই নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্র, চীন, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি, একটু দূরে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, ইরান, ইরাক, মিশর প্রভৃতি, আরও দূরে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ব্রেজিল প্রভৃতি। পৃথিবীর সকল দেশের লোকের সহিতই আমাদের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ।

আমাদের পৃথিবী কেবল আয়তনে বড় বা বিরাট নহে, ইহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও অপরূপ। তারপর ইহাই বর্তমানে প্রায় ৫০০ কোটি মানুষের ও অসংখ্য উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর বাসভূমি। ইহাদের সকলের, বিশেষতঃ মানুষের জীবন ও আচরণে লক্ষ্য করা যায় প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশের সুস্পষ্ট প্রভাব।

তাই আমাদের নিজেদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও স্বদেশ ভারতের বিষয় আলোচনার সময় স্বভাবতঃ পৃথিবীর সম্পর্কে নানা কথাও আমাদের মনে জাগে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে তাহার গুরুত্ব আরও বেশী। এসকল কারণে কতক প্রধান জায়গার নাম ও অন্যান্য বিবরণ মুখস্থ করা ভূগোল শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এই শিক্ষা আরম্ভ হয় প্রত্যেকের আপন আপন পরিবেশের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রে। এই প্রসঙ্গে প্রত্যেকেই লক্ষ্য করি নিজ নিজ বাড়ি ঘরের আশপাশের জমি কি ভাবে ব্যবহার করা হয়। আরও লক্ষ্য করি আমাদের কোন্ কাজের কিরূপ ফল। এভাবেই আমরা লক্ষ্য করি পরিবেশের সহিত মানবসমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আরও লক্ষ্য করি মানুষের জীবন, জীবিকা অর্জন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে ক্রমোন্নতি হইতেছে। এসকলই ভূগোল শাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। কাজেই ভূগোল ভালভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে এক দিকে পরিচিত অঞ্চলের পরিধির ক্রমশঃ বিস্তার আবশ্যক। অন্য দিকে ভৌগোলিক জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি, নূতন নূতন বিষয় জানিবার ও গভীর ভাবে চিন্তা করিবার জন্য উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি প্রভৃতি ভূগোল শিক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত পুস্তক, মানচিত্র, শিক্ষাসহায়ক বিভিন্ন উপকরণ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক প্রভৃতি সকলের সহায়তাতেই একাজ সহজ ও আকর্ষণীয় হয়। ইহার ফলেই ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে বুঝিতে পারে কিভাবে পৃথিবীর রূপ অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে।

মানুষ তাহার জয়যাত্রার পথে ক্রমশঃ আগাইয়া চলিতেছে। ফলে, মানুষের পক্ষে পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া চন্দ্রলোক, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ প্রভৃতিতে অভিযান সম্ভবপর হইতেছে। ভবিষ্যতে আরও কত কি ব্যবস্থা হইবে তাহা এখন কল্পনা করাও কঠিন।

ভূগোল শিক্ষা সম্পর্কে উপরিলিখিত বিভিন্ন বিষয় স্মরণ রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সপ্তম শ্রেণীর নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে এই পুস্তকখানা রচিত হইয়াছে। প্রথম ভাগের অন্তর্গত প্রথম হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত প্রাকৃতিক ভূগোলের বিষয়সমূহ ভালভাবে বুঝিতে পারিলে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে পরবর্তী অধ্যায়সমূহের বিষয় বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে। আর তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের অন্তর্গত ঊনবিংশ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত আঞ্চলিক বিষয়সমূহ পাঠ করিবার সময় প্রত্যেক অংশের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ সমগ্র পৃথিবীর ভৌগোলিক বিবরণ জানিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে।

ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে সমস্ত বিষয় সহজ ভাবে বুঝিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই পুস্তকের ভাষা অত্যন্ত সরল। তাহাছাড়া এই পুস্তকে বর্ণিত ও আলোচিত বিষয়বস্তু সহজ ভাবে বুঝিবার পক্ষে সহায়তার উদ্দেশ্যে আধুনিক বিবরণ ও তথ্য এবং বহু মানচিত্র, চিত্র, ছবি, নক্সা প্রভৃতি ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহাছাড়া এই পুস্তকের প্রত্যেক অধ্যায় সংক্রান্ত বহু অনুশীলনী দেওয়া হইয়াছে। Desk Work অংশে বিভিন্ন ধরনের অনেক নৈর্ব্যক্তিক বা বস্তুধর্মী অভীক্ষা (Objective Test) দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভিন্ন মানচিত্র অঙ্কন সম্পর্কে দুইটি পদ্ধতি আলোচনা করিয়া কয়েকখানা নমুনা মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। তাহাছাড়া এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের মানচিত্র সহ নির্দিষ্ট অঞ্চলসমূহের (Type regions) মোট ৬ খানা মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। কোন্ মানচিত্রে কি নির্দেশ করিতে হইবে তাহাও অনুশীলনীতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আশাকরি তাহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূগোল শিক্ষা সার্থক হইবে এবং একাজে তাহারা অধিকতর আগ্রহ ও উৎসাহ বোধ করিবে। মধ্য শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুসারে ১৯৮৬ খ্রীঃ হইতে **মাধ্যমিক পরীক্ষায়** এই পুস্তকের পঞ্চবিংশ অধ্যায় অর্থাৎ **নীলনদের অববাহিকা** হইতে **একটি প্রশ্ন** থাকিতে পারে। ১৯৮৬ খ্রীঃ হইতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বিষয়ে যে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে তাহা অনুশীলনীতে দেওয়া গেল।

এই পুস্তক রচনা সম্পর্কে বহু ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য সুহৃদের সাহায্যে ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট এজন্য কৃতজ্ঞ।

এই পুস্তকের উন্নতি সম্বন্ধে যে-কোন প্রকার সাহায্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব।

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় ভাগ—এশিয়া

চতুর্থ—ভাগ আফ্রিকা

প্রাকৃতিক ভূগোল

প্রথম অধ্যায় | *পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি ও ঋতু পরিবর্তন*

আমরা বৎসরের পর বৎসর লক্ষ্য করি একটি **নির্দিষ্ট নিয়ম** ও ছন্দে **দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্য,** উষ্ণতা ও শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতির পরিবর্তন। ইহাই **ঋতু পরিবর্তন।** এরূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে দেখি পরিবর্তনের প্রভাব। **সমগ্র মানবসমাজ** ও **প্রকৃতির রাজ্যে** বিভিন্ন ক্ষেত্রেও দেখি ঋতু পরিবর্তনের স্পষ্ট প্রভাব। এজন্য সকলেরই **প্রশ্ন,** কি ভাবে ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

পৃথিবী আমাদের বাসভূমি। ইহা একটি অভিগত গোলক বা প্রায় সম্পূর্ণ গোল পদার্থ এবং সতত **গতিশীল।** ইহার গতি দুইটি। আকাশমণ্ডলে ইহার অবস্থান এবং গতি সম্পর্কে কতক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, ইহার **মেরুরেখা** ইহার কক্ষের বা ভ্রমণপথের উপর সর্বদা একই দিকে ৬৬½° **কৌণিক** বা **হেলান** ভাবে অবস্থিত। এভাবে থাকিয়া পৃথিবী অনবরত নিজের **মেরুরেখার চারিদিকে** পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরিতেছে। ইহাই পৃথিবীর **আহ্নিক** বা **আবর্তন গতি।** এই গতিবশতঃ মেরুরেখার চারিদিকে আবর্তন করিতে করিতে পৃথিবী সর্বক্ষণ **সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে।** এই ঘুরিবার দিক্‌ও পশ্চিম হইতে পূর্বে। ইহাই পৃথিবীর বার্ষিক বা **পরিক্রমণ গতি।** পৃথিবী যে **কক্ষে** বা পথে সূর্যকে পরিক্রমণ করিতেছে তাহার আকৃতি **উপবৃত্তের** (Ellipse) মত বা প্রায় **ডিমের আকৃতির** মত। এই পথে ভ্রমণ করিবার সময় **সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব** গড়ে প্রায়

পৃথিবীর কক্ষ
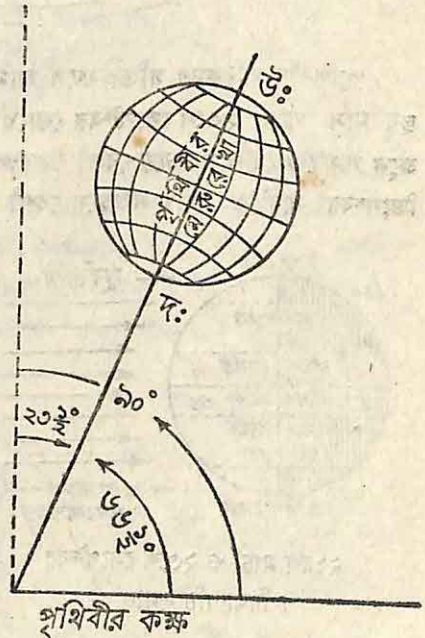
১৪.৯ কোটি কিলোমিটার। **জুলাই** মাসে এই দূরত্ব একটু বেশী এবং **জানুয়ারি**তে একটু কম। এই পথে সূর্যের চারিদিকে একবার **সম্পূর্ণ**রূপে ঘুরিয়া আসিবার জন্য পৃথিবীর সময় লাগে প্রায় ৩৬৫¼ দিন। **ইহাই পৃথিবীতে বৎসর গণনার হিসাব**। আর একারণেই এই গতিকে পৃথিবীর **বার্ষিক গতিও** বলে।
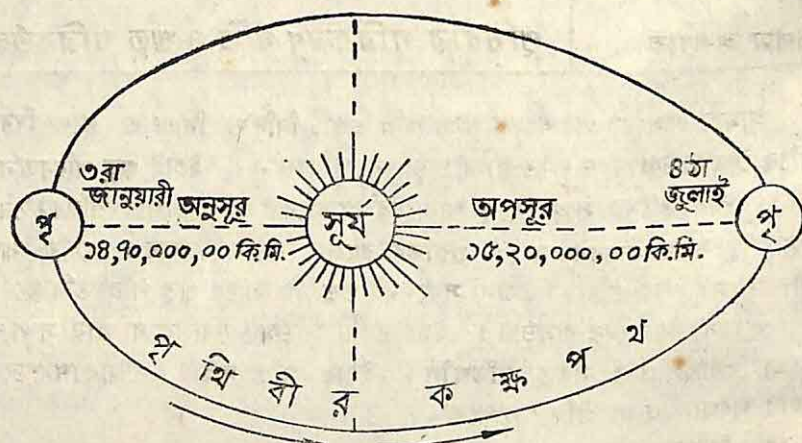
পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে আমরা প্রতি বৎসর **২১শে মার্চ** ও তাহার ছয় মাস পরে **২৩শে সেপ্টেম্বর** ভোরে সূর্যকে দেখি ঠিক পূর্বদিকে। **২১শে জুন** সূর্যকে দেখি সবচেয়ে বেশী উত্তর-পূর্ব দিকে। তাহার ছয় মাস পরে **২২শে ডিসেম্বর** সূর্যকে দেখি সবচেয়ে বেশী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। প্রকৃতপক্ষে **সূর্যের** এরূপ **গতি নাই** বা সূর্য এভাবে স্থান পরিবর্তন করে না। আমাদের পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির জন্যই আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া সূর্যের এপ্রকার আপাত স্থান পরিবর্তনের অবস্থা দেখি। অর্থাৎ আমাদের মনে হয়, সূর্য যেন এভাবে স্থান পরিবর্তন করিতেছে। তাই আমাদের দেখা অনুসারে সূর্যের এরূপ স্থান পরিবর্তনের অবস্থাকে
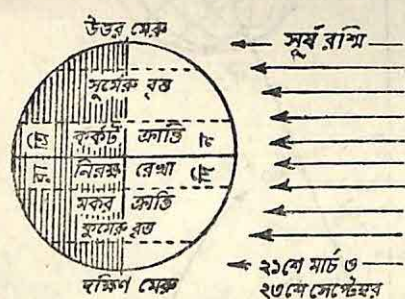
২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর
দিবারাত্রি সমান

সূর্যের আপাত গতি বলা হয়। **২২শে ডিসেম্বর** হইতে **২১শে জুন** পর্যন্ত ছয় মাস এই আপাত গতি উত্তরদিকে বা **উত্তরায়ণ**। অর্থাৎ এই ছয় মাস দেখা যায় সূর্য যেন একটু একটু করিয়া উত্তরদিকে সরিতেছে। আর **২১শে জুন**

হইতে **২২শে ডিসেম্বর** পর্যন্ত ছয় মাস এই আপাত গতি দক্ষিণদিকে বা **দক্ষিণায়ন**। অর্থাৎ এই ছয় মাস দেখা যায় সূর্য যেন একটু একটু করিয়া দক্ষিণদিকে সরিতেছে। পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলেই **মার্চের শেষ** (চৈত্রের মধ্য) ভাগে **নিরক্ষরেখার আশপাশে** মধ্যাহ্নে **সূর্যের কিরণ লম্ব** বা **খাড়াভাবে পতিত হয়**। এজন্য তখন সমগ্র পৃথিবীতে **দিবাভাগ ও রাত্রির দৈর্ঘ্য** প্রায় সমান। পৃথিবীর মেরুরেখা ইহার কক্ষের উপর লম্ব বা খাড়াভাবে থাকিলে
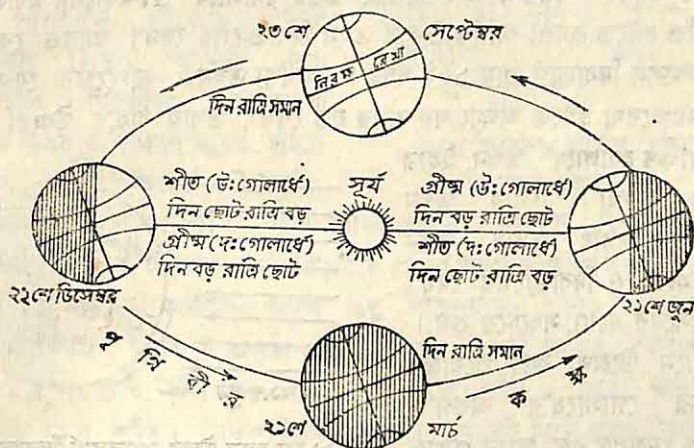
সারা বৎসরই এই অবস্থা হইত। ভূপৃষ্ঠের যে-কোন স্থানের নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণে অক্ষরেখার দূরত্ব যত বেশী, সেখানে সূর্যের কিরণ তত অধিক হেলান ভাবে পতিত হয়। **মার্চের শেষভাগে** উত্তর বা দক্ষিণ কোন গোলার্ধেই অপর গোলার্ধের তুলনায় উষ্ণতা বেশী বা কম নয়। ফলে, তখন **উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল**, আর **দক্ষিণ গোলার্ধে** তখন **শরৎকাল**। ২১শে মার্চ
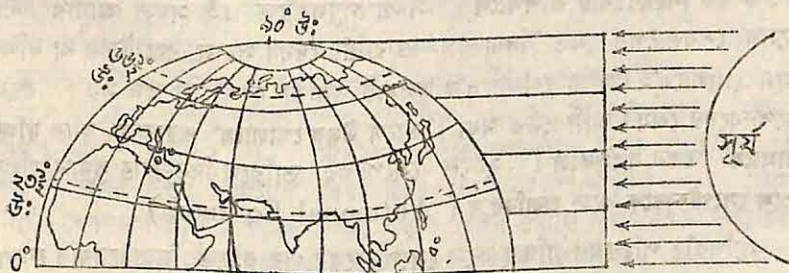
তারিখে দিন-রাত্রি সমান বলিয়া **২১শে মার্চকে** বলা হয় **মহাবিষুব** (Vernal or Spring Equinox. Equi = Equal ; nox = night)।

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে **মার্চের পর** হইতে নিরক্ষরেখার ক্রমশঃ

অধিক উত্তরদিকে মধ্যাহ্নে সূর্যের কিরণ লম্বভাবে পতিত হইতে থাকে। তাই, তখন হইতে **উত্তর গোলার্ধে** দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ও উষ্ণতার পরিমাণ বাড়িতে থাকে, অর্থাৎ তখনই উত্তর গোলার্ধে **গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হয়**। **জুনের শেষ** (আষাঢ়ের মধ্য) ভাগে কর্কটক্রান্তির আশপাশে মধ্যাহ্নে সূর্যের কিরণ লম্বভাবে পতিত হয়। তখন এসকল স্থানে **দিবাভাগের দৈর্ঘ্য** প্রায় ১৩½ ঘন্টা অর্থাৎ বৎসরের মধ্যে **সবচেয়ে বেশী**। এসকল জায়গাতে **উষ্ণতার** পরিমাণও তখন **সর্বাপেক্ষা অধিক**। ফলে, এই সময়ই **উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগ**। কর্কটক্রান্তি হইতে ক্রমশঃ অধিক উত্তরে তখন দিবাভাগের দৈর্ঘ্য আরও বেশী। যেমন, লণ্ডনে দিবাভাগ প্রায় ১৬½ ঘন্টা। অবশ্য তখনও ভূপৃষ্ঠের যে-কোন স্থানে নিরক্ষরেখা হইতে অক্ষাংশের দূরত্ব যত বেশী, তথায় বায়ুর উষ্ণতা তত কম। **দক্ষিণ গোলার্ধে** তখন ইহার বিপরীত অবস্থা। তথায় তখন **শীতকাল**। অর্থাৎ তথায় তখন বায়ুর উষ্ণতা ও দিবাভাগের দৈর্ঘ্য দুইই বৎসরের মধ্যে সবচেয়ে কম।

২১শে জুন উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগ অনেক বড়

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উত্তর গোলার্ধের অন্তর্গত আমাদের দেশসহ বহু স্থানে গ্রীষ্মকালের পর **সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি** হয়। এসকল স্থানে তখনই **বর্ষাকাল**। এদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে **২১শে জুনের** পর হইতে সূর্যের কিরণ মধ্যাহ্নে কর্কটক্রান্তির ক্রমশঃ অধিক দক্ষিণে লম্বভাবে পতিত হইতে থাকে।
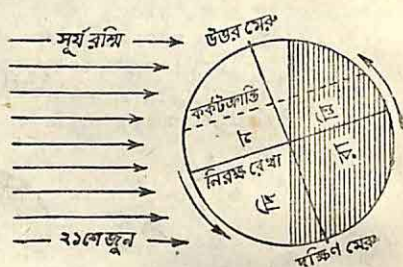
সেপ্টেম্বরের শেষ (আশ্বিনের মধ্য) ভাগে মধ্যাহ্নে **সূর্যের কিরণ লম্বভাবে** পতিত হয় **নিরক্ষরেখার আশপাশে**। সমগ্র পৃথিবীতে এই সময় আবার মার্চ মাসের শেষভাগের মত দিবাভাগ ও রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান এবং উত্তর বা দক্ষিণ কোন গোলার্ধেই অপর গোলার্ধের তুলনায় উষ্ণতা বেশী বা কম নয়। ফলে, সেপ্টেম্বরের শেষ (আশ্বিনের মধ্য) ভাগে **উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল**, আর **দক্ষিণ গোলার্ধে** তখন **বসন্তকাল**। ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে দিন-রাত্রি সমান বলিয়া **২৩শে সেপ্টেম্বরকে** বলে **জলবিষুব** (Autumnal Equinox)।

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে সেপ্টেম্বরের পর হইতে নিরক্ষরেখার ক্রমশঃ অধিক দক্ষিণে মধ্যাহ্নে সূর্যের কিরণ লম্বভাবে পতিত হইতে থাকে। তারপর **ডিসেম্বরের শেষ** (পৌষ মাসের মধ্য) ভাগে সূর্যরশ্মি মধ্যাহ্নে **লম্বভাবে** পতিত হয় **মকরক্রান্তির** আশপাশে। এজন্য তখনই **দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগ**।

তখন তথায় দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ও বায়ুর উষ্ণতার পরিমাণ বৎসরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। অপর দিকে **উত্তর গোলার্ধে** তখন **শীতকালের মধ্যভাগ**। কলিকাতাতে তখন দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ১০½ ঘণ্টা, লণ্ডনে ৭½ ঘণ্টা ; অর্থাৎ বৎসরের মধ্যে সবচেয়ে কম।
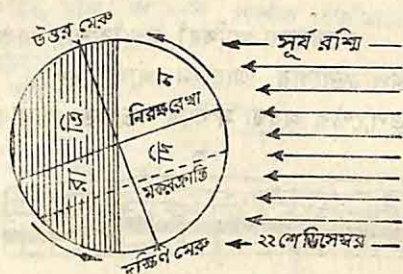
২২শে ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধে দিবাভাগ অনেক বড়

এভাবে বৎসরের পর বৎসর ঋতু পরিবর্তন হইতেছে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মধ্যে অবস্থিতি, বিশেষতঃ নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণে দূরত্ব, সমুদ্র হইতে দূরত্ব, ভূপ্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে **পার্থক্য** খুব বেশী। ফলে, বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু সম্বন্ধে পার্থক্যও খুব বেশী। তাই বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কেও পার্থক্য প্রচুর। তবে পৃথিবীর সামান্য কয়েকটি অংশে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় না। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বৎসরই উষ্ণতা অধিক, আবার রোজই দুপুরের পর প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং রাত্রে মৃদু শীত। মেরু অঞ্চলে সমস্ত বৎসরই তীব্র শীত। মরুভূমিতেও সারা বৎসরই দিনে গরম, রাত্রে সামান্য শীত এবং কখনও বৃষ্টি হয় না।

অনুশীলনী

১। পৃথিবীর গতি কয়টি ? কোন্‌টির কি নাম ? আবর্তন গতি কি ? কোন্ গতির ফলে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে ? ইহার পক্ষে সূর্যের চারিদিকে একবার সম্পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য কত সময় প্রয়োজন ? পৃথিবীতে কি হিসাবে বৎসর গণনা করা হয় ? ২। মার্চমাসের শেষ ভাগে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য কিরূপ থাকে ? তখন উষ্ণতা সম্বন্ধে কিরূপ অবস্থা লক্ষ্য কর ? তখন উত্তর গোলার্ধে কোন্ ঋতু ? তখন দক্ষিণ গোলার্ধে কোন্ ঋতু ? ৩। জুন মাসের শেষ ভাগে উত্তর গোলার্ধে কোন্ ঋতু ? তখন উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য কিরূপ থাকে ? তখন দক্ষিণ গোলার্ধে কোন্ ঋতু ? সেখানে তখন দিবাভাগের দৈর্ঘ্য কিরূপ থাকে ? ৪। সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে উত্তর গোলার্ধে কোন্ ঋতু ? তখন উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য কিরূপ থাকে ? ৫। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে উত্তর গোলার্ধে কোন্ ঋতু ? তখন এখানে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য কিরূপ থাকে ? তখন দক্ষিণ গোলার্ধে কোন্ ঋতু ? দক্ষিণ গোলার্ধে তখন দিবাভাগের দৈর্ঘ্য কিরূপ থাকে ? ৬। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কিরূপে দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাহা বর্ণনা কর। মহাবিষুব কি ? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬ Ext.) ৭। ভৌগোলিক কারণ দেখাও—নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তন অপরিচিত ঘটনা। (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬ Ext. ।

আমাদের পৃথিবী মহাবিশ্বের এক বিচিত্র ও বিস্ময়কর পদার্থ। ইহার উপরিভাগের আয়তন খুব বেশী। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপরিভাগের বা ভূপৃষ্ঠের অবস্থা সম্বন্ধে স্বভাবতঃ পার্থক্য খুব বেশী। তবে মোটামুটি হিসাবে ভূপৃষ্ঠের **ভূ-প্রকৃতি তিন ভাগে বিভক্ত** :—(ক) পাহাড়, পর্বত, (খ) সমভূমি ও (গ) মালভূমি। তন্মধ্যে ভূপৃষ্ঠের অর্ধেকের অধিক **সমভূমি**। মানবসমাজের বসবাস, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা অর্জন, যাতায়াত ও পরিবহন প্রভৃতি সকল বিষয়ে **সমভূমির গুরুত্ব** সবচেয়ে বেশী। ফলে, সমভূমিই পৃথিবীর ৮৫-৯০% লোকের বাসভূমি। অস্ট্রেলিয়া **মহাদেশে** সমভূমির আয়তন সবচেয়ে কম। সেখানে লোকও বাস করে কম। ভূপৃষ্ঠের প্রায় ২৮% উচ্চ মালভূমি ও পাহাড়, পর্বত। আর প্রায় ১৮% নিম্ন মালভূমি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু প্রভৃতি কারণে পাহাড়, পর্বতের আকর্ষণ খুব বেশী।

ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থা

ভঙ্গিল পর্বতে পাললিক শিলার স্তর

(ক) **পাহাড়, পর্বত**—ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১/৫ অংশ **পাহাড়, পর্বতময়**। পাহাড় আয়তনে ছোট। ইহাদের উচ্চতাও ৯০০ মিটারের কম। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশে বিহারীনাথ, শুশুনিয়া, বাগমুণ্ডী প্রভৃতি পাহাড় আছে। পাহাড় (৯০০ মিঃ) অপেক্ষা অধিক উচ্চ ও বহুদূর বিস্তৃত অঞ্চলকে বলা হয় **পর্বত**।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে হিমালয় পর্বতের কতক অংশ আছে। পাহাড়, পর্বতগুলি তাহাদের উৎপত্তি ও গঠন অনুসারে **চার** ভাগে বিভক্ত।

(১) **ভঙ্গিল পর্বত**—**হিমালয়, আল্পস, রকি, আন্দিজ** প্রভৃতি বর্তমানে

পৃথিবীর প্রধান পর্বত। যে সকল স্থানে এসকল পর্বত দাঁড়াইয়া আছে সে সকল জায়গাতে ৫-৭ কোটি বৎসর পূর্বেও ছিল **অগভীর সমুদ্র** বা **অতিগভীর** বহুদূর বিস্তীর্ণ খাত। ইহাদিগকে **মহীখাত** (Geosyncline) বলে। ইহাদের মধ্যে ইওরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ হইতে মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বিখ্যাত **টেথিস সাগর**। কোটি কোটি বৎসর এসকল খাতে সঞ্চিত হইয়াছে **অসংখ্য পলিস্তর**। স্তরগুলি ক্রমশঃ উঁচু ও কঠিন হইয়াছে।

এভাবে এগুলি পরিণত হইয়াছে **পাললিক শিলাতে**। এই দীর্ঘ সময় পৃথিবীর অভ্যন্তরে বারে বারে **প্রবল ভূ-আন্দোলন** হইয়াছে। এখনও হইতেছে। তাহার ফলে ও অধিক **পার্শ্ব চাপের** প্রভাবে শিলাস্তরগুলি ক্রমশঃ উঁচুনীচু হইয়াছে। এভাবে **ভাঁজিল পর্বতের** সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন, আল্পস, হিমালয় প্রভৃতি পর্বত।

(২) **স্তূপ পর্বত**—ভূপৃষ্ঠের কতক অংশ **কঠিন শিলাদ্বারা** গঠিত। পৃথিবীর মধ্যভাগের **প্রবল ভূ-আন্দোলনের** ফলে ঐ সকল অংশে প্রথমে চির বা

ফাটলের সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ ফাটল **গম্ভীর ও প্রশস্ত** হয় এবং বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাদের মধ্যে **উচ্চতারও পার্থক্য হয়।** এভাবে উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে

কতক পাহাড়, পর্বতের সৃষ্টি হয়। তাহাদিগকে বলে **স্তূপ পর্বত** বা **চ্যুতি পর্বত**। এভাবে ভূপৃষ্ঠের কতক অংশের উচ্চতা বৃদ্ধির সময় আশপাশের কিছু যথেষ্ট **দীর্ঘ** বা বিস্তীর্ণ অংশ **নীচু** অবস্থায় থাকিয়া যায়। অর্থাৎ এভাবে কিছু নীচু উপত্যকার সৃষ্টি হয়। তাহাদিগকে বলে **গ্রস্ত উপত্যকা**।

দাক্ষিণাত্যের **নীলগিরি, আন্নামালাই** প্রভৃতি স্তূপ পর্বত। আফ্রিকাতে গ্রস্ত উপত্যকা অনেক। তথাকার হ্রদগুলি বিখ্যাত। আমাদের দেশের নর্মদা ও তাপী (তাপ্তী) নদী সম্ভবতঃ গ্রস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

(৩) **সঞ্চয়জাত পর্বত** বা **আগ্নেয় পর্বত**—পৃথিবীর উপরিভাগ বা ভূপৃষ্ঠ হইতে ক্রমশঃ **মধ্যভাগের দিকে উত্তাপের পরিমাণ অধিক**। ফলে, পৃথিবীর মধ্য অংশের অনেক উপাদানের অবস্থা অসামান্য পরিমাণে **উত্তপ্ত, গলন্ত ও তরল**। কিন্তু চারিদিকের উপাদানসমূহের প্রবল চাপের ফলে সেগুলি প্রায়
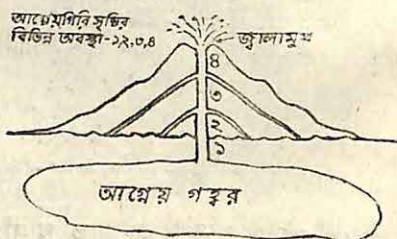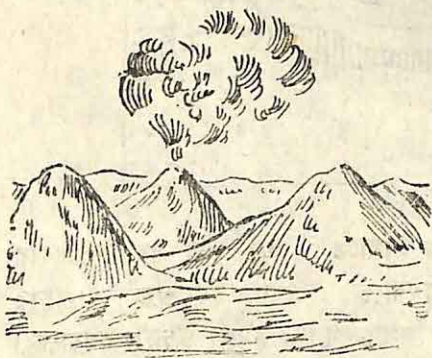
আগ্নেয় পর্বত

স্থিতিশীল বা স্থির। তবে কখনও পৃথিবীর মধ্যভাগে চাপের অধিক পার্থক্য ঘটিলে ও অন্যান্য কারণে তথাকার কতক উত্তপ্ত তরল বা গলন্ত পদার্থের

স্থিতিশীল থাকা সম্ভব হয় না। ফলে, ঐরূপ উত্তপ্ত তরল পদার্থ কখন কখন ভূপৃষ্ঠের দুর্বল অংশের অর্থাৎ ফাটল বা চির প্রভৃতির মধ্য দিয়া খুব জোরে বাহিরে **উৎক্ষিপ্ত হয়** ও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ঐসঙ্গে প্রচুর ধূম, **ভস্ম**, বাষ্প প্রভৃতিও বাহিরে আসে। পৃথিবীর উপরিভাগে কোথাও এসকল জিনিস অধিক **সঞ্চিত** হইলে তথায় সৃষ্টি হয় **সঞ্চয়জাত পর্বত** বা **আগ্নেয় পর্বত**। যেমন, জাপানের **ফুজিয়ামা** বা **ফুজিসান**।

(৪) **নগ্নীভূত বা ক্ষয়জাত পর্বত**—কোটি কোটি বৎসর যাবৎ ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়কার্য বা ক্ষয়ীভবন চলিতেছে। এরূপ **ক্ষয়ীভবনের** ফলে দেখা যায় অনেক কোমল অংশের **চিহ্নমাত্র** নাই, অথচ কতক কঠিন অংশ পাহাড়, পর্বতের মত দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদিগকে বলে **ক্ষয়জাত** বা **নগ্নীভূত পর্বত**। যেমন, রাজস্থানের **আরাবল্লী** পর্বত, বিহারের **পরেশনাথ** পাহাড় প্রভৃতি।
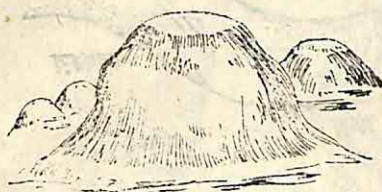
ক্ষয়জাত পর্বত

(খ) **সমভূমি**—পৃথিবীর অধিকাংশ সমভূমি নানা **কারণে** গঠিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে **সঞ্চয় কার্যের গুরুত্ব অধিক**। সমভূমির উৎপত্তি অনুসারে অর্থাৎ যে সকল শক্তির প্রভাবে সমভূমির সৃষ্টি বা গঠন হয়, তাহাদের **প্রাধান্য** ও অবস্থিতি অনুসারে সমভূমি নানা ভাগে বিভক্ত। যেমন—
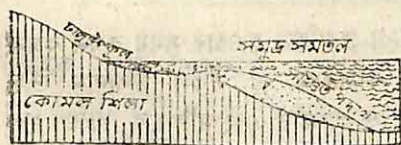
মহাদেশসমূহের উপরিভাগের ক্ষয়প্রাপ্ত কাঁকর, বালুকা প্রভৃতি অগভীর সমুদ্রে সঞ্চিত হওয়ার অবস্থা

উপকূল সমভূমি সৃষ্টির অবস্থা

(১) **প্রধানতঃ নদীর সঞ্চয়কার্য দ্বারা গঠিত সমভূমি**—(i) মহাদেশসমূহের বিভিন্ন অংশের ক্ষয়প্রাপ্ত কাঁকর, বালুকা প্রভৃতি বৃষ্টি ও নদীর জলস্রোত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির সাহায্যে নিম্নদিকে

প্রবাহিত হয়। স্থলভাগের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া এসকল উপাদান **অগভীর সমুদ্রে সঞ্চিত** হয়। এভাবে তথায় প্রথমে বালুচর, চর, দ্বীপ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। ঐ ভূভাগ কালক্রমে মূল ভূভাগের সহিত মিলিত বা যুক্ত হয়। এভাবে সৃষ্টি হয় **উপকূল সমভূমি**। এশিয়া, ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকার উত্তর উপকূলের সমভূমি অতিশয় বিস্তীর্ণ। (ii) স্থলভাগের ক্ষয়প্রাপ্ত কাঁকর, বালুকা প্রভৃতি
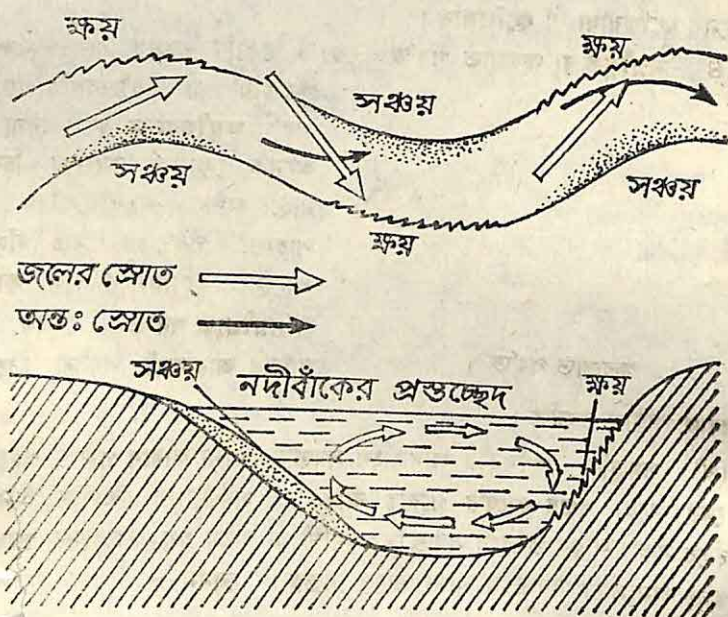
বৃষ্টির জল, নদী, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি দ্বারা প্রবাহিত হওয়ার সময় কখন কখন স্থলভাগের মধ্যেই কোন **হ্রদে সঞ্চিত** হয়। কালক্রমে ঐ সকল উপাদান উঁচু হইয়া তথায় সৃষ্টি হয় **হ্রদ সমভূমি**। জম্মু ও কাশ্মীর এবং মণিপুর রাজ্যে হ্রদ সমভূমি দেখা যায়। (iii) পাহাড়, পর্বতের ক্ষয়প্রাপ্ত পাথর, নুড়ি প্রভৃতি কখন কখন উচ্চ অংশ হইতে নীচের দিকে ধসিয়া পড়ে। কখনও বা এগুলি জলস্রোতের সহিত প্রবাহিত হইয়া নীচে নামে। এসকল জিনিস সাধারণতঃ ঐ সকল পাহাড়, পর্বতের **পাদদেশেই** প্রচুর পরিমাণে **সঞ্চিত** হইতে থাকে। এভাবে কালক্রমে তথায় **উচ্চ সমভূমি** (Piedmont plain) সৃষ্টি হয়। (iv) বর্ষাকালে নদীতে জলস্রোতের বেগ বৃদ্ধি হয়। তাহার আঘাতে নদীর যে কূলে বা তীরে ক্ষয় হয়, তাহার বিপরীত তীরের পাশে ঐ সকল ক্ষয়প্রাপ্ত জিনিসের বেশীর ভাগ সঞ্চিত হয়। নদীর বাঁকেই এরূপ ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্য বেশী দেখা যায়। তাহাছাড়া বন্যার সময় নদীর জলের সহিত প্রচুর পলি প্রবাহিত

হয়। এই পলি নদীর জলের সঙ্গে মিশিয়া থাকে বলিয়া ঐ জলের সঙ্গে নদীর দুই পাশে নীচু জমিতে সঞ্চিত হয়। ধীরে ধীরে তাহা তথায় উঁচু হইতে থাকে। এভাবে কালক্রমে নদীর দুই কূলে সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক বাঁধ। তাহার বাহিরে নীচু জায়গাতে সৃষ্টি হয় বিস্তীর্ণ সমভূমি। ইহাকে বলে **প্লাবন ভূমি বা পাললিক সমভূমি**। ভারতের সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি ইহার বিখ্যাত উদাহরণ। (v) নদীর জলের সহিত যে পলি প্রবাহিত হয় তাহার কতক অংশ **সমুদ্রের**
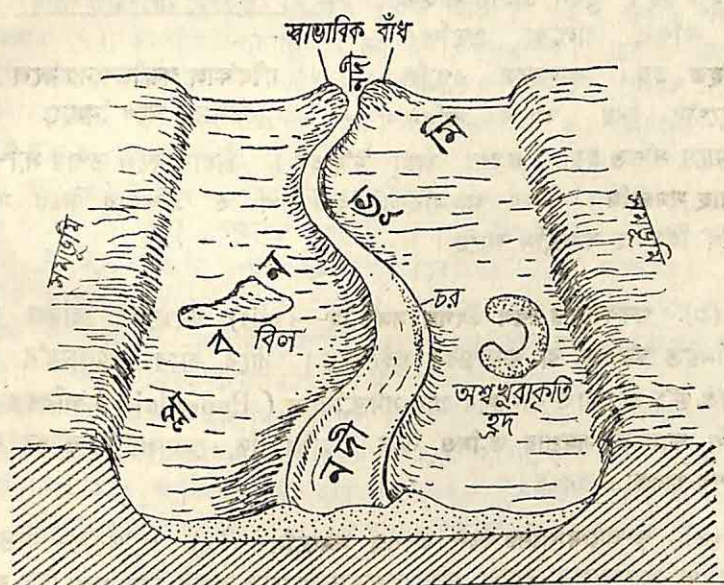
সহিত নদীর **মিলনস্থলে** সঞ্চিত হয়। ঐ মিলনস্থলকে বলে নদীর **মোহনা**। ঐ জায়গা ধীরে ধীরে উঁচু হয়। এভাবে কালক্রমে তথায় সৃষ্টি হয় **ব-দ্বীপ (Delta) সমভূমি** (১৮ পৃঃ চিত্র দ্রষ্টব্য)। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ **পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ** সমভূমি।

(২) **অন্য ভাবে সঞ্চিত উপাদান দ্বারা গঠিত সমভূমি**—(vi) পৃথিবীর **অভ্যন্তরের** বা **মধ্যভাগের** বিভিন্ন উপাদানের অবস্থা **অত্যন্ত উত্তপ্ত ও গলন্ত**। তাহা-ছাড়া ভূগর্ভে প্রায়ই প্রবল আন্দোলন হয়। তাহার ফলে এপ্রকার কতক **উপাদান** ভূত্বকের নীচ দিয়া প্রবাহিত হয়। তাহাকে বলে **লাভা**। কখন কখন তাহার কতক অংশ ভূপৃষ্ঠের চির, ফাটল প্রভৃতি দুর্বল অংশের মধ্য দিয়া উপর দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। এরূপ লাভাপ্রবাহের কতক অংশ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছে। তাহা তখন তথাকার ঢাল অনুসারে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। এসকল

উপাদানের কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠের কতক নিম্ন অংশে **সঞ্চিত** হয় এবং তথায় ধীরে ধীরে উঁচু হয়। এভাবে তথায় সৃষ্টি হয় **লাভা সমভূমি**। গুজরাটে এরূপ **লাভা সমভূমি** আছে। (vii) মেরু অঞ্চলে ও অতি উচ্চ পর্বতে কতক বিরাট আকারের হিমবাহ আছে। এসকল **হিমবাহ** অতি ধীরে প্রবাহিত হয়। তখন তাহার সহিত প্রচুর কাঁকর, বালুকা প্রভৃতিও **প্রবাহিত** হয়। কালক্রমে এগুলি ভূপৃষ্ঠের নিম্ন অংশে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়। ক্রমশঃ তাহা উঁচু হয়। তাহার ফলে তথায় সৃষ্টি হয় **হিমবাহ সমভূমি**। উত্তর আমেরিকা, ইওরোপ ও এশিয়ার উত্তর সীমায় বিস্তীর্ণ হিমবাহ সমভূমি আছে।
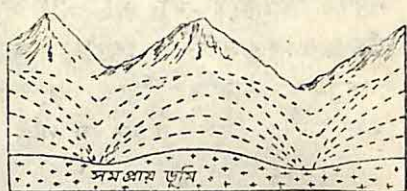
দীর্ঘকাল ক্ষয়ীভবনের ফলে উপরের অংশ বিলুপ্ত

(৩) **ক্ষয়কার্যের ফলে উৎপন্ন সমভূমি**—(viii) ভূত্বকের বিভিন্ন অংশে প্রতিনিয়ত ক্ষয়কার্য বা ক্ষয়ীভবন হইতেছে। বারে বারে ক্ষয়কার্যের ফলে অনেক উঁচু জায়গাও কালক্রমে প্রায় সমভূমিতে (Peneplain) পরিণত হয়। এরূপ স্থানকে **সমপ্রায় ভূমিও** বলে। নীলগিরি, মেঘালয় প্রভৃতির কতক অংশের অবস্থা এপ্রকার।

(৪) **ভূ-আন্দোলনের ফলে উৎপন্ন সমভূমি**—(ix) পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবল ভূ-আন্দোলন হইলে কখন কখন ভূপৃষ্ঠের কতক নিম্ন অংশ উঁচু হয় ও সমভূমিতে পরিণত হয়। তাহাছাড়া ভূপৃষ্ঠের কতক অংশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমভূমি (Structural plain) অবস্থায় রহিয়াছে।

(গ) **মালভূমি**—ভূপৃষ্ঠের প্রায় ⅓ অংশ মালভূমি। এসকল স্থান সমভূমির তুলনায় অনেক উঁচু। ইহাদের উচ্চতা কোথাও ধাপে ধাপে, কোথাও খাড়াভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। এরূপ স্থান কোথাও পাহাড়, পর্বতের আশ-পাশে, কোথাও পাহাড়, পর্বতের মাঝখানে, আবার কখনও বা পাহাড়, পর্বত হইতে দূরে অবস্থিত। সাধারণতঃ পাহাড়, পর্বতের কতক অংশে দীর্ঘকাল যাবৎ ক্ষয়কার্যের বা **ক্ষয়ীভবনের** ফলে ইহাদের সৃষ্টি হয়। আবার কোথাও পাহাড়, পর্বতের মাঝখানে বা পাশে বিভিন্ন জিনিস প্রচুর পরিমাণে **সঞ্চয়ের** ফলেও মালভূমির সৃষ্টি হয়। দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ অংশে ভূগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রচুর লাভা সঞ্চয়ের ফলে মালভূমি সৃষ্টি হইয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তরদিকে পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি পামির। তাহাকে **'পৃথিবীর ছাদ'** বলে।

অনুশীলনী

১। পর্বত ও পাহাড়ের মধ্যে পার্থক্য কি? পশ্চিমবঙ্গের কোথায় পাহাড় ও কোথায় পর্বত দেখিবে? ২। উৎপত্তি ও গঠন অনুসারে পর্বত কত ভাগে বিভক্ত? তাহাদের নাম লিখ। ৩। ভঙ্গিল পর্বত কাহাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও। কি ভাবে এই জাতীয় পর্বতের সৃষ্টি হয়? ৪। স্তূপ বা চ্যুতি পর্বত কি ভাবে সৃষ্টি হয়? এরূপ একটি পর্বতের নাম লিখ। ৫। সঞ্চয়জাত পর্বত কাহাকে বলে? কি ভাবে এই জাতীয় পর্বতের সৃষ্টি হয়? এরূপ একটি পর্বতের নাম লিখ। ৬। ভারতের কোথায় ক্ষয়জাত পর্বত আছে? এরূপ একটি পর্বতের নাম লিখ। ৭। উৎপত্তি অনুসারে পর্বতের শ্রেণী বিভাগ কর। চিত্র ও উদাহরণ সহযোগে উহাদের যে কোন একটির সৃষ্টির কারণ বর্ণনা কর। টেথিস সাগরের অবস্থান কোথায় ছিল? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬) ৮। আগ্নেয় পর্বত কাহাকে বলে? ক্ষয়জাত পর্বত হইতে ইহার পার্থক্য কোথায়? যে কোনও একটি আগ্নেয় পর্বতের নাম লিখ। (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৭) ৯। সমভূমি সাধারণতঃ কি কি ভাবে সৃষ্টি হয়? ভারতের কোথায় কোথায় নিম্নলিখিত প্রকারের সমভূমি আছে? উপকূল সমভূমি, ব-দ্বীপ সমভূমি, প্লাবন সমভূমি, হ্রদ সমভূমি। লাভা সমভূমি কাহাকে বলে? ভারতে কোথায় কোথায় এরূপ সমভূমি আছে? ১০। ক্ষয়জাত ও সঞ্চয়জাত সমভূমির সৃষ্টি কিরূপে হয় উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সমভূমিতে বাস করে কেন? কোন্ মহাদেশে সমভূমির আয়তন সবচেয়ে কম? (মাধ্যমিক পরীক্ষা ১৯৮৬ Ext.) ১১। উৎপত্তি অনুসারে মালভূমির শ্রেণী বিভাগ কর। সংক্ষেপে উহাদের সৃষ্টির কারণগুলি বর্ণনা কর। পামির মালভূমিকে 'পৃথিবীর ছাদ' বলা হয় কেন? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৭) ১২। সমপ্রায় ভূমি কাহাকে বলে? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬)।

তৃতীয় অধ্যায় | পর্বত ও সমভূমিতে নদীর উপত্যকার বিভিন্ন অবস্থা

পৃথিবীর বিভিন্ন **অংশে** নদ, নদী অসংখ্য। যে সকল অঞ্চলের উপর দিয়া নদী বহিয়া যায় তাহাদের মধ্যে ভূপ্রকৃতি ও ভূগঠন, বৃষ্টিপাত এবং অন্যান্য স্থান হইতে জল লাভের সুযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে পার্থক্য খুব বেশী। ফলে, একই নদীর বিভিন্ন অংশে উপত্যকার অবস্থা ও নদীর কাজ সম্পর্কে পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য অধিক। আবার বিভিন্ন নদীর মধ্যে এসকল বিষয়ে পার্থক্য প্রচুর। সাধারণতঃ বড় নদীগুলিতে **তিনটি পৃথক্ অবস্থা** লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ নদীর গতিপথের অবস্থা ও কার্য অনুযায়ী নদীর প্রবাহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। **গঙ্গা নদী** ইহার আদর্শ উদাহরণ।

পার্বত্য অঞ্চলে নদীর গভীর খাত

(ক) **পার্বত্য অঞ্চলে নদীর প্রাথমিক ও তরুণ অবস্থা**—পাহাড়, পর্বতের বৃষ্টির জল, প্রস্রবণের বা ঝর্ণার জল ও বরফগলা জল অসংখ্য **সরু ধারাতে** ভূমির খাড়া ঢাল অনুসারে বেগে নীচে নামিয়া আসে। গ্রীষ্মকালে বরফ বেশী গলে বলিয়া তখন প্রচুর বরফগলা জল পাওয়া যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পাওয়া যায় আরও বেশী। শীতকালে জল পাওয়া যায় খুব কম, বিশেষতঃ আমাদের দেশে। এরূপ নানা সূত্রের জলধারা ক্রমশঃ পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। এরূপ **মিলনের** ফলে সৃষ্টি হয় **নদী**। সকল নদীর মধ্য দিয়াই বৎসরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় বর্ষাকালে জলের প্রবাহ বৃদ্ধি হয়। এরূপ যে সকল সূত্র হইতে জল কোন নদীর মধ্য দিয়া বহিয়া যায় তাহাদের মধ্যে যেখান হইতে নিয়মিতভাবে সবচেয়ে বেশী জল পাওয়া যায়, তাহাকে বলে ঐ **নদীর উৎস** (Source)। যেমন, হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহের পাশে গোমুখ বা গোমুখী **গঙ্গা নদীর উৎস**। নদীর উৎস হইতে পাহাড়, পর্বতের উপরদিকের যে অংশের উপর দিয়া নদী প্রবাহিত হয় ততদূর পর্যন্ত

নদীর **প্রাথমিক** বা **প্রারম্ভিক** বা **পার্বত্য অবস্থা**। কঠিন বা **শক্ত** শিলার মধ্য দিয়া এখানে নদী বহিয়া চলে। তাই এখানে নদীর উপত্যকা থাকে অত্যন্ত **সরু** বা **সংকীর্ণ**। কাজেই তথায় এরূপ সঙ্কীর্ণ অংশেই নদী দ্বারা পরিবর্তন ঘটে। তাহার বাহিরে নদীর দ্বারা ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন হয় খুব কম। তাই এখানে নদীর ক্ষয়কার্যের বা **ক্ষয়ীভবনের প্রাথমিক বা শৈশব অবস্থা**।

পাহাড়, পর্বতের ক্রমশঃ নীচের দিকে নদীর উপত্যকাতে আরও বেশী জলস্রোতের মিলন ঘটে। এভাবে ক্রমশঃ বেশী জায়গা হইতে জল লাভের সুযোগ জুটে। ফলে, নদীতে জলের পরিমাণ ও স্রোতের বেগ বেশী হইতে থাকে। তাই ইহাই **নদীর তরুণ অবস্থার সূত্রপাত**। এই অবস্থাতে নদীর জলস্রোতের আঘাত হয় প্রবল। তাহার প্রভাবে নদীর উপত্যকার শিলাসমূহ ক্ষয় হইয়া খণ্ডবিখণ্ড হয়। ঐসকল পদার্থ নদীর জলের প্রবাহের সহিত ক্রমে নীচের দিকে নামিয়া আসে। ক্রমশঃ জলের প্রবল বেগে ও তাহার সহিত প্রবাহিত শিলাসমূহের ক্রমাগত ঘর্ষণে পার্বত্য অঞ্চলে নদীর উপত্যকার কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত অংশও অধিক গভীর হইতে থাকে। তাই তথায় নদীর উপত্যকা থাকে **সংকীর্ণ** এবং তাহার দুই পাশের **চাল** থাকে প্রায় খাড়া। ফলে, এখানে নদীর উপত্যকার আকৃতি I-এর মত। এরূপ উপত্যকাকে বলে **গিরিখাত** (Gorge)। হিমালয়ের পশ্চিম অংশে জম্মু ও কাশ্মীরে নাঙ্গা পর্বতের নিকট **সিন্ধু নদের** গিরিখাত বিখ্যাত। আর হিমালয়ের পূর্ব অংশে অরুণাচল প্রদেশের উত্তর-পূর্বদিকে নামচা বারোয়ার নিকট **ব্রহ্মপুত্রের** গিরিখাত বিখ্যাত। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে **কলোরেডো নদীর গিরিখাত** (Grand Canyon) পৃথিবীর মধ্যে **গভীরতম** গিরিখাত।
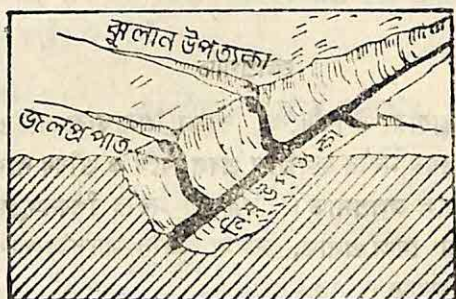
পাহাড়, পর্বতের ক্রমশঃ নিম্ন অংশে **ভূপ্রকৃতির ক্ষয়ীভবনের তরুণ** অবস্থা। অর্থাৎ নদীর **উপত্যকার** উপর অংশ হইতে ক্রমশঃ **নীচের দিকে** ক্ষয়কার্য অধিক। বিশেষতঃ নদীর উপত্যকার কঠিন শিলার তুলনায় কোমল শিলাতে নদীর ক্ষয়কার্য আরও বেশী। কাজেই এখানে উপত্যকার নীচের দিকে ক্ষয়ীভবন বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে **দুই পাশেও ক্ষয়কার্য** বাড়ে। তাই এখানে নদীর উপত্যকার আকৃতি V-এর মত। এই অংশে নদীর উপত্যকাতে অপর কতক বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। যেমন, **পাহাড়, পর্বতের উপর অংশে** ধস বা অন্য কোন কারণে

নদীর উপত্যকার, বিশেষতঃ তলদেশের বিস্তর পরিবর্তন ঘটিতে পারে। এরূপ অবস্থায় নদী পূর্বে যে পথে যে ভাবে প্রবাহিত হয়, পরে আর সেভাবে বা সেই পথে চলিতে পারে না। তখন ঐ জল তথা হইতে **খাড়া ভাবে নীচে পড়ে।** তারপর ঐ জলরাশি নীচের কোন নদীর মধ্য দিয়া বহিয়া চলে। এরূপ অবস্থাতে মনে হয় উপরের নদীর উপত্যকা যেন নীচের দিকে ঝুলিয়া আছে। ইহাই **ঝুলান উপত্যকা** (Hanging valley) নামে পরিচিত।

তাহাছাড়া ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য স্থানের মত কোন নদীর উপত্যকাতেও ভূপ্রকৃতি ও ভূগঠনের বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। ফলে, নদীর উপত্যকাতে **কঠিন ও কোমল শিলার স্তর** একটির নীচে অন্যটি পর পর থাকিতে পারে। এরূপ পার্থক্যের ফলে নদী দ্বারা স্তরগুলি **অসমান ভাবে ক্ষয় হয়।** এক্ষেত্রে নদীর তলদেশের ঢালের বিস্তর পরিবর্তন ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ নদীর উপত্যকার কোমল শিলা অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার উপরদিকের কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত অংশ **হঠাৎ ভাঙ্গিয়া** পড়িতে পারে। তখন নদীর জলরাশি **প্রবল বেগে ও ভীষণ শব্দে খাড়াভাবে** নীচে পড়ে। ইহাকেই বলে **জলপ্রপাত।** কাবেরী নদীর **শিবসমুদ্রম্** প্রপাত, সরাবতী নদীর **গারসোপা** বা **যোগ প্রপাত,** নর্মদা নদীর মার্বেল পাথরের উপর **ধুমানধারা প্রপাত** প্রভৃতি বিখ্যাত।
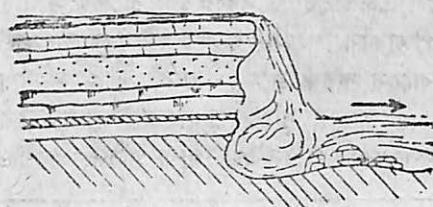
জলপ্রপাত

স্পষ্টই বুঝা যায় **পার্বত্য অঞ্চলে** নদীর প্রাথমিক ও তরুণ অবস্থাতে **নদীর কাজ দুইটি** —(এক) উপত্যকার ক্ষয়ীভবন ও (দুই) ক্ষয়প্রাপ্ত পাথর, নুড়ি, কাঁকর প্রভৃতিকে নীচের দিকে পরিবহন।

(খ) **পার্বত্য অঞ্চলের নিম্ন অংশ হইতে সমভূমিতে বহু দূর পর্যন্ত নদীর উপত্যকার পরিণত অবস্থা**—পাহাড়, পর্বতের নীচের দিকে মূল নদীর সহিত ক্রমশঃ অনেক ছোট নদীর মিলন ঘটে। ফলে, এখানে নদীর রূপ বা আকৃতি অনেকটা বহু **ডালপালা যুক্ত গাছের মত।** অথবা মনে হইতে পারে, নদী যেন **জালের মত** ছড়াইয়া আছে। এখানে নদীর উপত্যকার আকৃতি প্রশস্ত V-এর মত। তারপর উচ্চভূমির পাদদেশে নদী যেখানে সমভূমিতে পৌঁছে সেখানে সঞ্চিত হয় জলের সহিত উপরদিক হইতে প্রবাহিত **কাঁকর, পাথর, নুড়ি** প্রভৃতি বহু জিনিস। তাই এখানে সৃষ্টি হয় **উন্নত বা উচ্চ সমভূমি** (Piedmont plain)। উত্তর ভারতের সমভূমি ও হিমালয় অঞ্চলের পাদদেশের

মিলনস্থলে এরূপ উন্নত সমভূমি সুস্পষ্ট। এখান হইতে নীচের দিকে দেখা যায় **ভূপ্রকৃতির যথেষ্ট ক্ষয়প্রাপ্ত পরিণত অবস্থা**। এখানে **নদীর উপত্যকারও পরিণত অবস্থা**। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গঙ্গা নদী উত্তর প্রদেশের হরিদ্বারে সমভূমিতে পৌঁছিয়াছে। ইহার উপর পর্যন্ত গঙ্গা নদীর পার্বত্য অবস্থা। আর এখান হইতে নীচের দিকে এই নদীর সমভূমি অবস্থা।

তারপর সমভূমিতে ক্রমশঃ বহু ছোট নদী মূল নদীর সহিত মিলিত হয়। সমভূমিতে বা পার্বত্য অংশে যেখানেই কোন নদী মূল নদীর সহিত যুক্ত হয় না কেন, ঐ নদী **মূল নদীর উপনদী**। এসকল উপনদী তাহাদের প্রবাহের অঞ্চলের ভূমির ঢাল অনুসারে নানা দিক্ হইতে আসিতে পারে। তাহাদের মধ্যে যেগুলি মূল নদীর ডান দিক্ দিয়া ঐ নদীর সহিত যুক্ত হয় তাহাদিগকে বলে মূল নদীর **ডান তটের উপনদী** (Right bank tributary)। যেমন, **যমুনা, শোণ** প্রভৃতি গঙ্গার ডান (দক্ষিণ) তটের উপনদী। আর যে উপনদীগুলি মূল নদীর বাম দিক্ দিয়া ঐ নদীর সহিত যুক্ত হয় তাহাদিগকে বলে মূল নদীর **বাম তটের উপনদী** (Left bank tributary)। যেমন, **গোমতী, ঘাঘরা, কোশী** প্রভৃতি গঙ্গার বাম (উত্তর) তটের উপনদী।

সমভূমিতে মৃত্তিকা সাধারণতঃ কোমল। তাই এখানে নদীর উপত্যকার **দুই পাশে ক্ষয়কার্য** বা **ক্ষয়ীভবন বেশী, নিম্নদিকে ক্ষয়কার্য কম**। এখানে নদীর গতিপথের ক্রমশঃ নীচের দিকে নদীর **উপত্যকা** ক্রমশঃ অধিক **প্রশস্ত ও অগভীর**। ক্রমশঃ নীচের দিকে নদীর গতিবেগ কম, নদীর ক্ষয়কার্যও অনেক কম। তাহা-ছাড়া নদীর জলের সহিত পাথর, কাঁকর প্রভৃতির প্রবাহের পরিমাণ সম্বন্ধেও
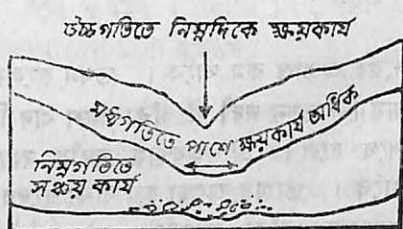
পার্থক্য ঘটে। নদীর গতিপথের উপর অংশের তুলনায় নীচের দিকে নুড়ি, বালুকা, কাঁকর প্রভৃতি ক্রমশঃ অধিক প্রবাহিত হয়। আর উপত্যকার নিম্ন অংশেই এসকল জিনিস ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে সঞ্চিতও হয়। ফলে, নদীর পরিণত অবস্থাতে **ক্ষয়, পরিবহন ও সঞ্চয়—এই তিন কাজই** সুস্পষ্ট। এই

অবস্থাতে নদীর উপত্যকার **দুই তীরে** কাঁকর, বালুকা প্রভৃতি ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে জমিয়া **স্বাভাবিক বাঁধ** (Levee) তৈরী হয়। বন্যার সময় নদীর দুই পাশে আরও বিস্তৃত অঞ্চলে নীচু জমিতে বারে বারে **পলি** সঞ্চিত হইতে থাকে। এভাবে এসকল অংশ ক্রমশঃ অধিক উঁচু হয় ও ক্রমে ক্রমে **সমভূমিতে** পরিণত হয়। ইহাদিগকে বলে **প্লাবন ভূমি বা পাললিক সমভূমি** (১১ পৃঃ চিত্র দ্রষ্টব্য)। উত্তর ভারতের সমভূমি ইহার বিখ্যাত উদাহরণ।

সমভূমি অঞ্চলের সমুদ্রের পাশের অংশ আরও **সমতল**। এখানে নদীর উপত্যকা আরও প্রশস্ত ও অগভীর। তাই এখানে নদীতে জলের বেগ অত্যন্ত কম। এজন্য এখানে নদীর উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত জল বা জলের প্রবাহ কোথাও সামান্য বাধা পাইলেই অন্য পথে বহিয়া যায়। ফলে, এখানে **নদীর উপত্যকা** অত্যন্ত **আঁকাবাঁকা** (Meandering)। এরূপ স্থানে কখন কখন বাঁকের দুই মাথার মধ্যে

অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি

দূরত্ব অত্যন্ত কম থাকে। তখন জলের সামান্য বেগেই ঐ অংশটুকু ভাঙ্গিয়া যায়। তখন নদী ঐ বাঁকা অংশ বাদ দিয়া নূতন সোজা পথ তৈরী করিয়া সে পথে চলে। ঐ অবস্থায় নদীর আগেকার **পরিত্যক্ত অংশে** কিছু জল জমিয়া থাকে। তাহার অবস্থা হয় বাঁকা হ্রদের মত। অর্থাৎ এভাবেই নদীর পরিত্যক্ত গতিপথে বাঁকা আকৃতির হ্রদ সৃষ্টি হয়। তাহাকে বলে **অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ** (Ox-bow or horse shoe lake)। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে এরূপ অনেক হ্রদ আছে।

(গ) **সমভূমির শেষ প্রান্তে বা সমুদ্রের নিকটবর্তী অংশে নদীর বার্ধক্য অবস্থা—** সমভূমির সমুদ্রের নিকটতম অংশে **ভূপ্রকৃতির পরিবর্তনের শেষ বা চরম অবস্থা**। এখানে ভূমির ঢাল প্রায় বুঝা যায় না। তার উপর এখানে নদীর অগভীর উপত্যকাতে ক্রমাগত প্রচুর পলি সঞ্চিত হয়। ফলে, তাহা ক্রমশঃ উঁচু হইয়া উপত্যকা প্রায় ভরিয়া যায়। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময় এই উপত্যকার অনেকটা শুকাইয়া যায়। তখন তাহার মধ্য দিয়া সরু আঁকাবাঁকা পথে ক্ষীণ জলধারা বহিয়া চলে। এখানে নদীর উপত্যকার তলদেশ সমুদ্রের সমতলে (Sea level) পৌঁছিয়া যায়। তাই এখানে দেখা যায় নদীর **বার্ধক্য** বা **শেষ অবস্থার** লক্ষণ। এখানে নদীর ক্ষয়কার্য সম্পূর্ণ বন্ধ। বরং নদীদ্বারা আগে ক্ষয়কার্যের ফলে

যে পরিমাণ কাঁকর, বালুকা প্রভৃতি নদীর জলের সহিত এখান পর্যন্ত পেঁছিয়াছে তাহার অনেকটা এখানে পলিরূপে সঞ্চিত হয়। বাকী অংশ সমুদ্রের দিকে বহিয়া যায়। কাজেই এখানে **নদীর দুই কাজ—(এক) পরিবহন** ও **(দুই) সঞ্চয়।** পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমাতে গঙ্গা নদী যেখানে এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে সেখান হইতেই গঙ্গার এই অবস্থা।

নদীর উপত্যকার শেষ প্রান্তে ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে তথায় অনবরত **মগ্নচর, চর** প্রভৃতি সৃষ্টি হইতে থাকে। তাহাতে **নদীর পথ বন্ধ** হইয়া যায়। তখন **নদী নূতন পথে** ধীর গতিতে সমুদ্রের দিকে **বহিয়া** চলে। এসকল নূতন পথ হইল মূল নদীর **শাখানদী** (Distributary)। পাশাপাশি বহু শাখানদী সৃষ্টির ফলে নদীর সমুদ্রের সহিত মিলনস্থলে বা নদীর মোহনাতে সৃষ্টি হয় **প্রায় ত্রিকোণভূমি** বা **ব-আকৃতির দ্বীপ**। ইহাকে বলে **ব-দ্বীপ** (delta)। **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপের** আয়তন পৃথিবীর ব-দ্বীপসমূহের মধ্যে **বৃহত্তম**।
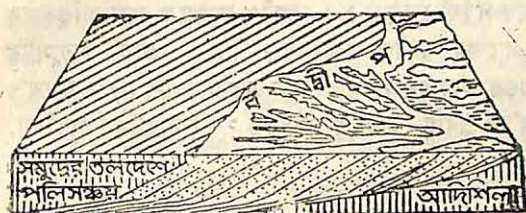
নদীর কাজ—নদীর উৎস হইতে মোহনা পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থাতে নদীর জলধারার দ্বারা মানবসমাজ নানাভাবে উপকৃত হয়। যেমন, পার্বত্য অংশে প্রবল জলস্রোতের সাহায্যে উৎপন্ন হয় জলজ বিদ্যুৎশক্তি। মধ্যগতিতেও নদীতে বাঁধ দিয়া কৃত্রিম জলপ্রপাতের সৃষ্টি করা হয়। তারপর সমভূমি অঞ্চলে নদীর জলের সাহায্যে সেচকার্য হয় প্রচুর পরিমাণে। ইহাদ্বারা কৃষির সুবিধা হয় খুব বেশী। তাহাছাড়া মানুষের যাতায়াত এবং মালপত্র পরিবহন সম্পর্কেও নদী বিশেষ উপকারী। এসকল কারণে নদীর আশপাশের সমভূমি অঞ্চলে লোক-বসতি আদিম কাল হইতেই খুব বেশী। পৃথিবীর আদি সভ্যতাও গড়িয়া উঠিয়াছে এরূপ স্থানে। মিশরে নীলনদের উপত্যকাতে, চীন দেশে ইয়াং সি কিয়াং নদীর উপত্যকাতে এবং আমাদের দেশে সিন্ধুনদের উপত্যকাতে তাহার বহু প্রমাণ আছে। শহর, নগর, গ্রাম, শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতিও নদীর আশপাশেই সবচেয়ে বেশী। অপরদিকে ইহাদের দ্বারাই নদীর দূষণ বা তাহার জলের দূষণ হইতেছে খুব বেশী। আমাদের দেশে গঙ্গা ও ভাগীরথীর জল বর্তমানে এতই দূষিত যে তাহা মানুষের পক্ষে ভীষণ অনিষ্টকর।

অনুশীলনী

১। নদীর উৎস কাহাকে বলে? গঙ্গা নদীর উৎস কোথায়? নদীর প্রথম অবস্থাতে কোন্ কোন্ কাজ অধিক লক্ষ্য করা যায়? ২। নদীর তরুণ অবস্থাতে ইহার উপত্যকার আকৃতি কিরূপ? এরূপ হওয়ার কারণ কি? ৩। নদীর উপত্যকাতে কঠিন ও কোমল শিলা একটির নীচে অন্যটি থাকার ফলে নদীর উপত্যকার অবস্থা কিরূপ হয়? একটি উদাহরণ দাও। ৪। ঝুলান উপত্যকা কাহাকে বলে? ৫। পার্বত্য অঞ্চলের নিম্ন অংশে নদীর উপত্যকার অবস্থা কিরূপ? ৬। উপনদী কাহাকে বলে? গঙ্গার ডান তটের ও বাম তটের একটি করিয়া উপনদীর নাম লিখ। ৭। প্লাবন ভূমি কাহাকে বলে? ইহা কিভাবে সৃষ্টি হয়? ৮। অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ কাহাকে বলে? ইহা কিভাবে সৃষ্টি হয়? ৯। বদ্বীপ কাহাকে বলে? কিভাবে বদ্বীপ সৃষ্টি হয়? পৃথীবীর বৃহত্তম বদ্বীপ কোথায়? ১০। কার্য অনুসারে নদীর প্রবাহকে কি কি ভাগে বিভক্ত করা হয়? যে কোন একটি অংশে নদীর কার্যের বিবরণ দাও। গঙ্গা নদীর পার্বত্য প্রবাহ কতদূর বিস্তৃত? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৭)।

চতুর্থ অধ্যায় — ভূপৃষ্ঠের অক্ষাংশ ও উচ্চতার সহিত বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্তন

আমরা জানি, একটি জলন্ত উনুনের পাশে উত্তাপ যত বেশী, তাহা হইতে ক্রমশ দূরে উত্তাপ তাহার তুলনায় ক্রমশঃ কম। আর যে-কোন জায়গাতে দুপুরে উষ্ণতা যত বেশী, তাহার তুলনায় সেখানে ভোরে ও সন্ধ্যায় বায়ুর উষ্ণতা অনেক কম। আমরা আরও লক্ষ্য করি, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে তাহাদের অবস্থিতি, ভূপ্রকৃতি (উচ্চতা), ভূগঠন, সমুদ্র হইতে দূরত্ব, বায়ুপ্রবাহের দিক্ প্রভৃতি বিষয়েও বিস্তর পার্থক্য। তাহার প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্তন হয়। এসকল বিষয়ের মধ্যে অক্ষাংশ ও উচ্চতা, এই দুই বিষয়ের প্রভাব (সিলেবাস অনুসারে) নিম্নে আলোচনা করা গেল।

(ক) **ভূপৃষ্ঠে উষ্ণতার পরিবর্তন সম্বন্ধে অক্ষাংশের প্রভাব—পৃথিবীর মেরুরেখা** পৃথিবীর কক্ষের **সহিত** ৬৬½ **কৌণিকভাবে** অবস্থিত (১ পৃঃ চিত্র দ্রষ্টব্য)। এভাবে থাকিয়া পৃথিবী আপন মেরুরেখার চারিদিকে অনবরত পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে **আবর্তন** করিতেছে। ফলে, পৃথিবীর যেখানে যখন দুপুর, সেখানে তখন সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পতিত হয়। তখন হইতে কিছু সময় পর্যন্ত তথায় বায়ুর **উষ্ণতার পরিমাণ** থাকে দিনের মধ্যে **সবচেয়ে বেশী**। আর পৃথিবীর **পরিক্রমণ গতির** ফলে প্রতি বৎসর একবার **মার্চের শেষ** (চৈত্রের মধ্য) ভাগে ও একবার **সেপ্টেম্বরের শেষ** (আশ্বিনের মধ্য) ভাগে সূর্যরশ্মি বেশ কিছুদিন **নিরক্ষরেখার আশপাশে মধ্যাহ্নে**
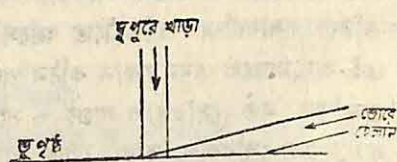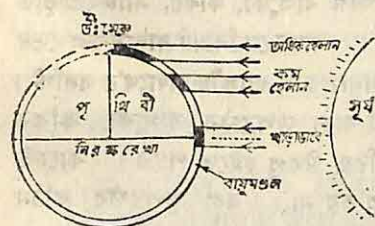
নিরক্ষরেখা হইতে অধিক উত্তরে ও দক্ষিণে সূর্যরশ্মি অধিক হেলানভাবে পতিত হইতেছে

সূর্যরশ্মি ভোরে হেলানভাবে ও দুপুরে খাড়াভাবে পতিত হইতেছে

লম্বভাবে পতিত হয়। এই দুই সময় সূর্যরশ্মি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে কম স্তর ভেদ করিয়া নিরক্ষীয় অঞ্চলে পৌঁছে। তাহাছাড়া তাহা তখন তথায় ভূপৃষ্ঠে সর্বাপেক্ষা কম আয়তন-বিশিষ্ট স্থানে খাড়া ভাবে পতিত হয়। কাজেই এই দুই সময় **নিরক্ষীয় অঞ্চলে উষ্ণতার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী**। নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে যে স্থানের দূরত্ব যত বেশী **সেখানকার অক্ষাংশ তত অধিক**। তথায় সূর্যরশ্মি তত বেশী হেলান ভাবে পতিত হয় ও বায়ুর উষ্ণতা তত **কম**।

একই মধ্যরেখাতে অবস্থিত সকল স্থানে একই সময়ে মধ্যাহ্ন হয়। তবু ঐ রেখার উপরিস্থিত যে স্থানের নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে দূরত্ব যত বেশী বা অক্ষাংশ যত অধিক, তথায় বায়ুর উষ্ণতা তত কম।

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে জুনের শেষভাগে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগ। তখন কর্কটক্রান্তির আশপাশে বায়ুর উষ্ণতার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। আর ডিসেম্বরের শেষভাগে দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকালের মধ্য ভাগ। তখন মকরক্রান্তির আশপাশে বায়ুর উষ্ণতা সবচেয়ে বেশী। তবে তখনও ঐ সকল স্থান হইতে যে স্থান উত্তর ও দক্ষিণে যত বেশী দূরে সেখানকার **উষ্ণতা তত কম**। এজন্যই মে-জুন মাসেও কেহ কলিকাতা বা দিল্লী হইতে **মস্কো বা লণ্ডন** গেলে অনুভব করিবেন তথাকার উষ্ণতা অনেক কম। আর ডিসেম্বর মাসে যখন দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তির আশপাশে বায়ুর উষ্ণতা অধিক ও গ্রীষ্মকাল, তখন উত্তর গোলার্ধে শীতকাল। তখন উত্তর ইওরোপের দেশসমূহ, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে শীত এত বেশী যে তথায় প্রচুর তুষারপাত হয় ও বরফ জমে।

(খ) **ভূপৃষ্ঠে উষ্ণতার পরিবর্তন সম্পর্কে উচ্চতার প্রভাব**—ভূপৃষ্ঠ সৌরতাপের প্রভাবে উত্তপ্ত হয়। সূর্য হইতে এই **রশ্মি আলোক-তরঙ্গরূপে** (Light waves) অনবরত চারিদিকে **ছড়াইয়া পড়িতেছে**। তাহা বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া সূর্য হইতে গড়ে ১৪.৯ কোটি কিঃ মিঃ দূরত্ব অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে পৌঁছে। তাহা ভূপৃষ্ঠে পৌঁছিবামাত্র এখানকার **বালুকা, কাঁকর, মাটি** প্রভৃতি **কঠিন উপাদান** ঐ তাপের সংস্পর্শে উত্তপ্ত হয়। অথচ যে বিরাট **বায়ুমণ্ডল** ভেদ করিয়া সৌররশ্মি পৃথিবীতে আসে তাহা নানাপ্রকার **গ্যাসীয় পদার্থের সমষ্টি**। এই বায়ুমণ্ডলে এমন কোন কঠিন পদার্থ নাই যাহা ভূপৃষ্ঠের বালুকা, কাঁকর প্রভৃতির মত সৌরতাপ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিয়া উত্তপ্ত হইতে পারে। কাজেই বায়ুমণ্ডল সৌররশ্মি দ্বারা সোজাসুজি উত্তপ্ত হয় না। বরং ভূপৃষ্ঠের কঠিন উপাদানসমূহ প্রচণ্ড উত্তপ্ত সৌররশ্মি লাভ করিয়া উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ তথাকার উত্তাপের কতক অংশ বিকিরণ করে। **বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর ঐ তাপের প্রভাবে উত্তপ্ত হয়।**

বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার সহিত বায়ুর ওজন বা চাপের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। বায়ুর উষ্ণতা যত বেশী, বায়ু তত হালকা হয়। অর্থাৎ, তাহার ওজন বা চাপ তত কমে। আর শীতল বায়ু ভারী, অর্থাৎ তাহার ওজন বা চাপ অধিক। **ভূপৃষ্ঠের উত্তপ্ত বায়ু হাল্কা** বলিয়া তাহা **উপরদিকে উঠিয়া যায়**। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বায়ুমণ্ডলের তুলনায় ভূপৃষ্ঠ অধিক উষ্ণ, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ হইতে উপর দিকে বায়ুর উষ্ণতা কম। তাহাছাড়া উত্তপ্ত বায়ু উপরে উঠিবার সময় কিছু তাপ

বিকিরণ করে। এভাবে ঐ বায়ু ক্রমশঃ কিছুটা **শীতল হয়**। তারপর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া উপরে উঠিবার কালে বা বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর মধ্যে ধূলি ও জলকণার পরিমাণ কমিয়া যায়। এজন্য বায়ুমণ্ডলের উপরদিকের অংশে বায়ুর তাপ গ্রহণের ক্ষমতাও কমিয়া যায়। ফলে, বায়ুমণ্ডলের ক্রমশঃ উপরদিকে বায়ুর উষ্ণতা আরও কমে। এজন্য বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম অংশে বায়ু অত্যন্ত শীতল। কাজেই ভূপৃষ্ঠ হইতে যে উষ্ণ বায়ু উপরদিকে প্রবাহিত হয় তাহা বায়ুমণ্ডলের উপরদিকের অংশের শীতল বায়ুর সংস্পর্শেও শীতল হয়।
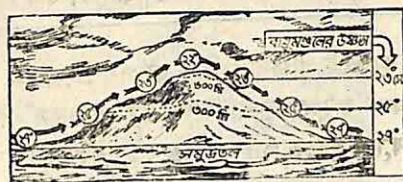
ভূপৃষ্ঠ ইহতে ক্রমশঃউপরে উষ্ণতা কম

এসকল কারণে **বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর হইতে ক্রমশঃ উপরদিকে উষ্ণতা কম**। এজন্য কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে যে কেহ হিমালয় অঞ্চলের **দার্জিলিং, সিমলা, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে** যাওয়ার সময় অনুভব করেন, যত উপরে উঠিতেছেন বায়ুর উষ্ণতা তত কম। ইওরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতিরও যে-কোন স্থান হইতে পাহাড়, পর্বতে ক্রমশঃ উপরদিকে উষ্ণতা কম—ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

উপরিলিখিত নানা কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলের আশপাশে **ভূপৃষ্ঠে সমুদ্র-সমতল হইতে ১৩-১৬ কিঃ মিঃ উঁচু পর্যন্ত গড়ে প্রতি ১৫৫ মিঃ উচ্চতায় ১° সেঃ** (সেলসিয়াস) হিসাবে উষ্ণতা কম। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্য অংশে **সমুদ্র-সমতল হইতে প্রায় ৭-৮ কিঃ মিঃ উঁচু পর্যন্ত বায়ুর উষ্ণতা ঐ হারে (প্রতি** ১৫৫ মিঃ উচ্চতায় ১° সেঃ) কম। উভয় মেরুর আশপাশে ভূপৃষ্ঠেই উষ্ণতা অনেক কম।

অনুশীলনী

১। কোন্ শক্তির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত ও আলোকিত হয়? তাহা দ্বারা বায়ুমন্ডল সোজাসুজি উত্তপ্ত হয় না কেন? ২। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে দিনের পৃথক্ পৃথক্ সময়ে উত্তাপের পার্থক্য হয় কেন? ৩। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বৎসরের পৃথক্ পৃথক্ সময়ে উত্তাপের পার্থক্য হয় কেন? ৪। পৃথিবীর কোন্ অংশে বায়ুর উষ্ণতার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী? তথায় উষ্ণতা এরূপ বেশী হওয়ার কারণ কি? ৫। নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে বায়ুর উষ্ণতা সম্বন্ধে কিরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য কর? ২/১টি উদাহরণ দাও। ৬। বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম স্তর কিভাবে উষ্ণতা লাভ করে? ঐ স্তরের নিম্নতম অংশ হইতে ক্রমশঃ উপর দিকে উষ্ণতার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে? শীত ও গ্রীষ্মকালে সমভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলের কিছু মানুষের সাময়িক ভাবে স্থান ত্যাগের কারণ কি? তাহারা কখন কোন্ দিকে যায়? তুমি কখন দার্জিলিং বা শ্রীনগর যাইতে চাইবে? ঐ সময় কেন পছন্দ কর?

মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ্ সকলেরই বাঁচিবার জন্য জলের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। এজন্য **জলের অন্য নাম জীবন**। জীবজগতের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় এই জলের কিছু অংশ আমরা **সরাসরি বৃষ্টি হইতে পাই**। তবে বেশীর ভাগ জল পাওয়া যায় পুকুর, দীঘি, খাল, বিল, হ্রদ, নদ, নদী, সাগর, মহাসাগর প্রভৃতি **জলাশয়** ও প্রস্রবণ বা ঝর্ণা, কূপ ও নলকূপ হইতে। বস্তুতঃ **এসকল সূত্রের জলও বৃষ্টির জল**। তাহা সঞ্চিত হইয়া আছে ঐরূপ বিভিন্ন জলাশয়ে। কাজেই প্রশ্ন—বৃষ্টি কি এবং কিভাবে বৃষ্টি হয় ?

আকাশ বা বায়ুমণ্ডল হইতে যে **স্বাভাবিক জলবিন্দু ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়** তাহাই **বৃষ্টিপাত**। আমরা জানি, **বায়ুমণ্ডল** নানারকম **গ্যাসীয় পদার্থের সমষ্টি**। ইহাদের মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সাধারণতঃ অতি সামান্য। কাজেই বৃষ্টিপাতের জন্য বায়ুমণ্ডলে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকা আবশ্যক। তাহা জলবিন্দুতে বা বৃষ্টিতে পরিণত হইতে পারিলেই বৃষ্টি হয়, নতুবা বৃষ্টি হয় না। শুষ্ক ও আর্দ্রকুণ্ড থার্মোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ মাপা হয়।

এখন প্রশ্ন, বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প কোথা হইতে আসে ? তাহা কি ভাবে আসে ও তাহাদ্বারা কি ভাবে বৃষ্টি হয় ? আমরা জানি ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭১% বারিমণ্ডল ও প্রায় ২৯% স্থলমণ্ডল। কাজেই **সূর্যরশ্মি দ্বারা ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত** হওয়ার সময় এখানকার জল ও স্থল দুইই উত্তপ্ত হয়। আর **জলরাশি** যত বেশী উত্তপ্ত হয়, তাহা হইতে তত অধিক **জলীয় বাষ্প উৎপন্ন** হয়। **অধিকাংশ জলীয় বাষ্প** আসে সাগর, মহাসাগর, নদ, নদী, খাল, বিল, হ্রদ প্রভৃতি **জলাশয়** হইতে। বৃষ্টিপাতের কতক অংশ সরাসরিও জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। উদ্ভিদ্, মৃত্তিকা ও অন্যান্য সূত্র হইতেও কিছু জলীয় বাষ্প পাওয়া যায়।

জলীয় বাষ্প অত্যন্ত হাল্কা। তাই বায়ুর অন্যান্য উপাদানের সহিত ইহাও সহজেই উপরদিকে উঠিয়া যায়। উত্তপ্ত জলের কেটলি বা ভাতের হাঁড়ি
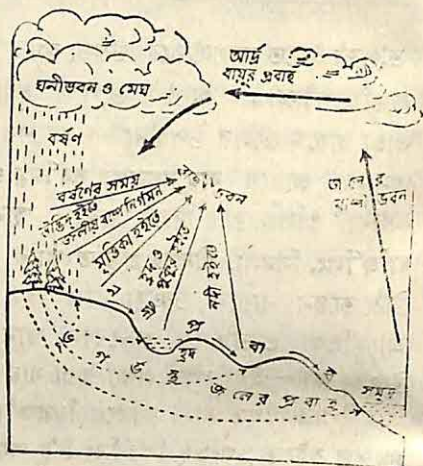
হইতে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প উপরদিকে উঠে—ইহা কাহার না চোখে পড়ে? উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প যত উপরে উঠে তত শীতল হয়। শীতল হওয়ার সময় এই বাষ্প অতি ক্ষুদ্র বা অণু পরিমাণ ধূলিকণাকে আশ্রয় করিয়া **বিন্দু বিন্দু জলকণাতে পরিণত হয়।** স্পষ্টই দেখা যায় একটি পাত্রের মধ্যে কিছু জল রাখিয়া তাহার মধ্যে এক টুকরা বরফ ফেলিয়া দিলে পাত্রের গায়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই সৃষ্টি হয় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু। কাজেই উত্তপ্ত বায়ুর সহিত যে জলীয় বাষ্প উপরদিকে প্রবাহিত হয় তাহা উচ্চ আকাশে শীতল ও ঘনীভূত হয়। ফলে,

বৃষ্টির কাল মেঘ

তথায় যে অসংখ্য অণু পরিমাণ জলকণার সৃষ্টি হয়, তাহাদের দ্বারাই সৃষ্টি হয় বিভিন্ন আকৃতির মেঘ। যে মেঘের মধ্যে **জলবিন্দুর** পরিমাণ অধিক ও যাহার (মেঘের) **রং কাল**, কেবল মাত্র সেরূপ মেঘ **দ্বারাই বৃষ্টি** হয়। আকাশের নিম্ন অংশেই দেখা যায় এরূপ মেঘ।

স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত **চারি** প্রকারের (Four types):

(ক) **পরিচলন বৃষ্টি**—ভূপৃষ্ঠের মধ্যভাগের **নিরক্ষীয় অঞ্চলে জলভাগের বিস্তার** খুব বেশী। এখানে **সারা বৎসর** বায়ুর **উষ্ণতাও** অধিক। তাই এখান হইতে প্রতিদিনই **জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু সোজাসুজি উপরদিকে** উঠিয়া থাকে। অর্থাৎ এখানে বায়ুর পরিচলন গতি। এই বায়ু উপর দিকে উঠিবার সময় তাহার মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্প ক্রমশঃ শীতল ও ঘনীভূত হয়। ফলে, এই অঞ্চলে আকাশে প্রচুর মেঘের সৃষ্টি হয়। এজন্য এই অঞ্চলে প্রতিদিনই দুপুরের পূর্ব হইতে **কাল মেঘে** আকাশ ছাইয়া যায়। আর সাধারণতঃ দুপুরের পর হইতে ঐ অঞ্চলে সোজাসুজি নীচের দিকে **বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি হয়।** ইহাই **পরিচলন বৃষ্টি** (Convectional rain)।

(খ) **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি**—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের নদ, নদী ও সাগরাদি হইতে প্রচুর **জলীয় বাষ্প** উপরদিকে ওঠে। তাহা **বায়ুপ্রবাহের সহিত** মিশিয়া যায়। কাজেই তাহা বায়ুর উপাদান হিসাবে বায়ুপ্রবাহের দিক ও গতি অনুসারে **প্রবাহিত হয়।** এরূপ জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ু তাহার প্রবাহের **পথে পাহাড়**

পর্বতের গায়ে বাধা পায়। তাহা পাহাড়ের যে ঢালে বাধা পায় সেই ঢাল অনুসারে উপরদিকে উঠিতে থাকে। ঐ ঢালকে বলে পাহাড়ের **প্রতিবাত পার্শ্ব** (Windward side)। বায়ুপ্রবাহ উপরে উঠিবার কালে তাহার মধ্যস্থিত ঐ জলীয় বাষ্প শীতল ও ঘনীভূত হয়। ফলে, তখন তথায় **মেঘের** সৃষ্টি হয়। এবং তাহাদ্বারা পাহাড়ের ঐ ঢালে ও আশপাশে বৃষ্টি হয়। তাহাই **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি** (Relief rain) [শৈল = পর্বত]। **পৃথিবীর বেশীর ভাগ বৃষ্টিই এই জাতীয়।** ইহার প্রধান ব্যতিক্রম নিরক্ষীয় অঞ্চল। এখানে সারা বৎসর পরিচলন বৃষ্টি হয়। ভারতে পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে ও হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে
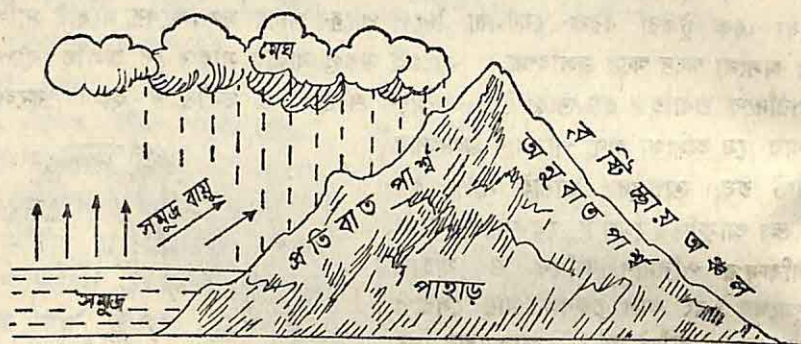
শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশী। যে বায়ুপ্রবাহ দ্বারা এরূপ বৃষ্টি হয় তাহা পাহাড়, পর্বত পার হইয়া বিপরীত দিকে নীচে নামে। তখন তাহার মধ্যে জলীয় বাষ্প থাকে খুব কম। তাহাছাড়া তথায় বায়ু উপর হইতে নীচের দিকে প্রবাহিত হয় বা নামিয়া আসে। কাজেই তখন ঐ বায়ুর উষ্ণতা বাড়ে। এজন্য ঐ বায়ুদ্বারা পাহাড়ের ঐ বিপরীত দিকে বৃষ্টি প্রায় হয় না। পাহাড়, পর্বতের বৃষ্টিহীন বিপরীত দিক্‌কে বলে **অনুবাত পার্শ্ব** (Leeward side) বা **বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল** (Rain shadow area)। যেমন, পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বদিকের ঢাল ও আশপাশ।

(গ) **ঘূর্ণিবৃষ্টি**—পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে মাঝে মাঝে **প্রবল ঘূর্ণবাত বা ঝড় হয়।** তখন যে বৃষ্টি হয়, তাহাই **ঘূর্ণিবৃষ্টি** (Cyclonic rain)। আমাদের দেশেও, বিশেষতঃ বঙ্গোপসাগরের আশপাশে, বর্ষা ও শরৎ কালে কখন কখন প্রবল ঘূর্ণিবৃষ্টি হয়।

(ঘ) **শিলাবৃষ্টি**—ঘূর্ণবাত যে পথে প্রবাহিত হয় কখন কখন সে পথে অন্য দিক্ হইতে **অধিকতর শীতল বায়ু** আসিয়া পৌঁছিতে পারে। তখন ঐ তীব্র শীতল বায়ুর সংস্পর্শে ঘূর্ণবাতের সহিত প্রবাহিত বা ঐ বায়ুপ্রবাহের

মধ্যস্থিত **জলীয় বাষ্প অত্যধিক শীতল ও ঘনীভূত** হয়। তাহার কতক অংশ **শিলার আকার** ধারণ করে। এরূপ অবস্থায় **শিলাবৃষ্টি** (Hail storm) হয়।

অনুশীলনী

১। আমরা সাধারণতঃ কিভাবে ও কোথা হইতে জল পাইয়া থাকি ? ২। বৃষ্টিপাত কি ? কিভাবে বৃষ্টিপাত হয় ? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬) জলীয় বাষ্প কোথা হইতে পাওয়া যায় ? তাহা কিভাবে ঘনীভূত হয় ? ৩। মেঘ কি ? কোন্ প্রকার মেঘ দ্বারা বৃষ্টি হয় ? ৪। বৃষ্টিপাত প্রধানতঃ কি কি প্রকারের ? বিভিন্ন প্রকার বৃষ্টিপাতের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা কর। কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাপ করা হয় ? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬ Ext.) ৫। পরিচলন বৃষ্টি কাহাকে বলে ? কোথায় এই প্রকার বৃষ্টি হয় ? ৬। পৃথিবীর বেশীর ভাগ বৃষ্টি কোন্ প্রকারের ? কিভাবে এই জাতীয় বৃষ্টি হয় ? পরিচলন বৃষ্টির সহিত ইহার পার্থক্য কি ? ৭। পাহাড়ের কোন্‌টি প্রতিবাত অংশ ও কোন্‌টি অনুবাত অংশ ? কোন্ অংশে বৃষ্টি বেশী ? ঐ অংশে বৃষ্টি বেশী হয় কেন ? ৮। পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে ঘূর্ণবৃষ্টি বেশী হয় ? ৯। শিলাবৃষ্টি কেন হয় ?

ষষ্ঠ অধ্যায় | জলবায়ু নির্ণয়—এ সম্বন্ধে বায়ুর উষ্ণতা ও প্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক

আমাদের সকলের জীবনেই প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে **আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব** সুস্পষ্ট। কোন স্থানের বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত প্রভৃতি সম্পর্কে **অল্প সময়ের** অবস্থাকে **আবহাওয়া** বলে। আর এসকল বিষয়ে তথাকার **দীর্ঘকালের** (গড়ে প্রায় ৩৫ বৎসর) অবস্থার সাহায্যে স্থির করা হয় তথাকার **জলবায়ু**। যে কোন স্থানের জলবায়ু নির্ণয় **সম্বন্ধে** বায়ুমন্ডলের **উষ্ণতা,** বায়ুর **চাপ, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক** খুব বেশী। এই **সম্পর্ক** সাধারণতঃ নিম্নরূপ।

(ক) **বায়ুর উষ্ণতা**—ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় সূর্যরশ্মির প্রভাবে। আর উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে উষ্ণতা লাভ করে বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম অংশ। ভূপৃষ্ঠের যে-কোন স্থানের বায়ুর উষ্ণতার সহিত তথাকার অক্ষাংশ, ভূমির উচ্চতা, ভূভাগের গঠন, সমুদ্র হইতে দূরত্ব প্রভৃতি বিষয়ের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। উদাহরণ হিসাবে আমাদের দেশের কয়েকটি জায়গার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি সমুদ্রের নিকট অবস্থিত। দিল্লী, নাগপুর প্রভৃতি ভারতের মধ্য অংশে অবস্থিত। কাজেই এসকল বিষয়ের প্রভাবে কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতির তুলনায় দিল্লী, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে **গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা** খুব বেশী, **শীতকালে শীত** প্রচুর। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতির তুলনায় রাজস্থানের মরু অঞ্চলের জয়পুর, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে শীত-কালে শীত ও গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা আরও বেশী। আর ইহাদের তুলনায় হিমালয় অঞ্চলের দার্জিলিং, সিমলা, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে গ্রীষ্মকালের উষ্ণতা কম অর্থাৎ এসকল স্থানে তখনকার অবস্থা **আরামদায়ক,** কিন্তু শীতকালে পার্বত্য অঞ্চলে শীত তীব্র।

(খ) **বায়ুর উষ্ণতার সহিত বায়ুপ্রবাহের সম্পর্ক** —উষ্ণ বায়ু হাল্কা অর্থাৎ তাহার চাপ বা ওজন কম। তাই এরূপ বায়ু উপরদিকে উঠিয়া যায়। আর শীতল বায়ু ভারী অর্থাৎ তাহার চাপ বা ওজন অধিক। এজন্য তাহা নীচের দিকে নামিয়া আসে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বায়ুর উষ্ণতার পার্থক্য অধিক। ফলে, বিভিন্ন স্থানে বায়ুর চাপ সম্পর্কে পার্থক্য প্রচুর। অবশ্য এক স্থানেও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বায়ুর উষ্ণতার পার্থক্য ঘটে, চাপেরও পার্থক্য হয়। তবে বিভিন্ন স্থানে বায়ুর চাপ সম্বন্ধে অসমতা বা **পার্থক্য দূর** হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে শীতল অঞ্চলের **ভারী** বা **উচ্চচাপযুক্ত বায়ু উষ্ণ**

অঞ্চলের দিকে আসে। কারণ, সেখানে বায়ুর চাপ কম। তবে পৃথিবীর আবর্তন গতিবশতঃ বায়ুপ্রবাহ **উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে** বাঁকিয়া যায়। ইহা **ফেরেল সূত্র** নামে পরিচিত। বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কে এপ্রকার অবস্থার ফলে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা নিম্নলিখিত **চারি** ভাগে বিভক্ত :—

(১) **নিয়ত বায়ু**—ভূপৃষ্ঠের কয়েকটি **নির্দিষ্ট অংশে** বায়ুর **চাপ প্রায় সর্বদাই অধিক**। অপর কয়েকটি নির্দিষ্ট অংশে বায়ুর **চাপ** প্রায় **সর্বদাই কম**। যেমন, নিরক্ষরেখার আশপাশে বায়ুর চাপ খুব কম। তাই এখানে আছে **নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়**। তারপর কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির আশপাশে বায়ুর চাপ অধিক। সেজন্য এই দুই অংশে আছে **ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়**। সুমেরু বৃত্ত ও কুমেরু বৃত্তের পাশে বায়ুর চাপ মেরু অঞ্চলের তুলনায় কম। সেজন্য এই দুই অংশে আছে **মেরুবৃত্ত অঞ্চলের নিম্নচাপ বলয়**। আর সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলে বায়ুর চাপ খুব বেশী। তাই এই দুই স্থানে আছে **মেরুর উচ্চচাপ বলয়**।

নির্দিষ্ট উচ্চ চাপের বা বেশী চাপের অঞ্চল হইতে বায়ু **নিয়মিতভাবে** নিকটবর্তী নিম্ন চাপের বা **কম চাপের অঞ্চলের দিকে** প্রবাহিত হয়। ইহাদিগকে বলা হয় **নিয়ত বায়ু** (Constant wind)। যেমন, **আয়ন বায়ু** (Trade wind), **পশ্চিমা বায়ু** (Westerlies) প্রভৃতি। কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী উচ্চচাপের অঞ্চল হইতে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে যে বায়ু প্রায় সারা বৎসর প্রবাহিত হয় তাহা উত্তরপূর্ব দিক্ হইতে আসে। তাহাকে বলা হয় **উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু**। আবার মকরক্রান্তির নিকটবর্তী উচ্চচাপের অঞ্চল হইতে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে যে বায়ু প্রায় সমস্ত বৎসর প্রবাহিত হয় তাহা দক্ষিণ-পূর্ব দিক্ হইতে আসে। তাহাকে বলা হয় **দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু**। তারপর কর্কটক্রান্তির নিকটবর্তী উচ্চচাপ বলয় হইতে সুমেরুবৃত্তের নিকটবর্তী নিম্নচাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু প্রায় সর্বদা প্রবাহিত হয় তাহা পশ্চিমদিক্ হইতে আসে। তাহাকে বলা হয় **পশ্চিমা বায়ু**। সেরূপ মকরক্রান্তির নিকটবর্তী উচ্চচাপ বলয় হইতে কুমেরুবৃত্তের নিকটবর্তী নিম্নচাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হয় তাহাও পশ্চিমদিক্ হইতে আসে। তাহাকেও বলা হয় **পশ্চিমা বায়ু**। তারপর সুমেরুর আশপাশের উচ্চচাপ বলয় হইতে সুমেরুবৃত্তের নিকটবর্তী নিম্নচাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা উত্তর-পূর্ব দিক্ হইতে আসে। তাহাকে বলা হয় **উত্তর-পূর্ব মেরু বায়ু**। আর কুমেরুর আশপাশের উচ্চচাপ বলয় হইতে কুমেরুবৃত্তের নিকটবর্তী নিম্নচাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহা দক্ষিণ-পূর্ব দিক্ হইতে আসে। তাহাকে বলা হয় **দক্ষিণ-পূর্ব মেরু বায়ু**।

(২) **সাময়িক বায়ু**—বৎসরের বা দিনের এক একটি **নির্দিষ্ট সময়েও** বিভিন্ন স্থানে বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্তন হয়। ফলে, সে সকল স্থানে ঐরূপ সময়ে বায়ুর চাপেরও পার্থক্য ঘটে। তাহার ফলেও যেখানে যখন বায়ুর উচ্চচাপ, সেখান হইতে তখন বায়ু আশপাশের নিম্নচাপের অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। তাহাকে
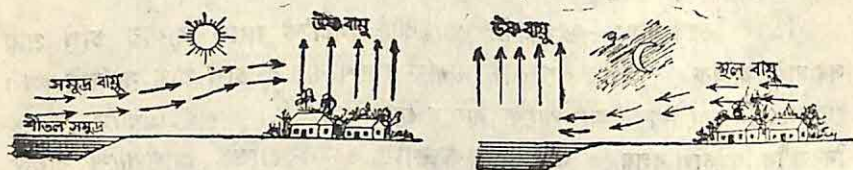
বলে **সাময়িক বায়ু** (Seasonal or Periodical wind)। যেমন, **সমুদ্র বায়ু, স্থল বায়ু ও মৌসুমী বায়ু**। সাধারণতঃ অপরাহ্নে সমুদ্রের উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে শীতল বায়ু উষ্ণতর স্থলভাগের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে আসে। ইহা খুব আরামদায়ক। ইহাকে বলা হয় **সমুদ্র বায়ু**। আর শেষরাত্রে শীতলতর স্থলভাগের উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে শীতল বায়ু সমুদ্রের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহাকে বলা হয় **স্থল বায়ু**। গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত স্থলভাগের বিস্তীর্ণ অংশে নিম্নচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। তাই তখন সমুদ্রের উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে এই নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু। ইহাকে বলা হয় **আর্দ্র মৌসুমী বায়ু**। আমাদের দেশে ইহা প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হইতে আসে। তাই ইহা **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু** নামে সুপরিচিত। ইহার প্রভাবেই তখন এদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। আর শীতকালে শীতলতর স্থলভাগের উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে সমুদ্রের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় **শুষ্ক মৌসুমী বায়ু**। এই বায়ু শুষ্ক বলিয়া তখন বৃষ্টি হয় না। আমাদের দেশে ইহাই **উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু** নামে পরিচিত।

(৩) **স্থানীয় বায়ু**—কখন কখন কতক স্থানে আশপাশের তুলনায় বায়ুর উষ্ণতা ও চাপ সম্পর্কে বিস্তর পার্থক্য ঘটে। এরূপ অবস্থায়ও উচ্চচাপের অঞ্চল হইতে নিম্নচাপের কেন্দ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। এপ্রকার বায়ুকে **স্থানীয় বায়ু** (Local wind) বলে। যেমন, দিল্লীর আশপাশে গ্রীষ্মকালে দুপুরের পর অত্যধিক উষ্ণতার জন্য নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তখন সেদিকে প্রবাহিত হয় উত্তপ্ত '**লু**' বায়ু। বৈকালে বা সন্ধ্যার দিকে কখন কখন এই বায়ুর সহিত এত ধূলা উড়ে যে চারিদিক অন্ধকার হইয়া যায়। তাই এই বায়ুকে '**আঁধি**' বলে। এরূপ অবস্থায় বায়ুর দূষণ হয়। কাজেই ইহা অনিষ্টকরও বটে। সাহারা, আরব প্রভৃতি মরু অঞ্চলে স্থানীয় বায়ুর প্রভাব বা গুরুত্ব খুব বেশী।

(৪) **আকস্মিক বায়ু**—কোথাও কোথাও হঠাৎ বা খুব অল্প সময়ের মধ্যে

বায়ুর উষ্ণতার ও চাপের অধিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। অধিক উষ্ণতার ফলে এসকল ক্ষেত্রেও নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। আর কোথাও অধিক শীত বৃদ্ধির ফলে উচ্চচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থায় উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাকে বলে **আকস্মিক বায়ু** (Sudden or Irregular wind)। হঠাৎ কোথাও উষ্ণতা অধিক বৃদ্ধি হইলে তথায় নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। তখন ঐ দিকে **ঘূর্ণবাত** প্রবাহিত হয়। আর ইহার বিপরীত অবস্থাতে, অর্থাৎ হঠাৎ কোথাও শীত অধিক বৃদ্ধি হইলে তথায় উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। তখন তথা হইতে বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বহিয়া যায়। তাহাকে বলে **প্রতীপ ঘূর্ণবাত**। কাজেই ঘূর্ণবাতের বিপরীতমুখী বায়ু হইল **প্রতীপ ঘূর্ণবাত**।

(গ) **বায়ুপ্রবাহের সহিত বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক—নিরক্ষীয় অঞ্চলের** অধিক জলীয় বাষ্পপূর্ণ বা আর্দ্র বায়ু তথাকার অধিক উষ্ণতা ও নিম্নচাপের জন্য সোজাসুজি উপর দিকে প্রবাহিত হয়। উপরদিকে প্রবাহের অবস্থাতেই তাহা ঘনীভূত হয় ও সেখানে মেঘের সৃষ্টি হয়। তখন তথায় বৃষ্টি হয় সোজাসুজি নীচে। ইহাই **পরিচলন বৃষ্টি**। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু তথাকার বায়ুপ্রবাহের দিক্‌ ও গতি অনুসারে এক স্থান হইতে অন্য দিকে প্রবাহিত হয়। পথিমধ্যে পাহাড়, পর্বতের গায়ে তাহা বাধা পায়। তাহাদের যে ঢালে তাহা বাধা পায় সেই ঢাল অনুসারেই বায়ু উপরদিকে উঠিতে থাকে। কাজেই পাহাড়ের সেই ঢালেই বায়ুর মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্পের ঘনীভূত হওয়ার সুযোগ ঘটে। সেখানেই মেঘের সৃষ্টি হয় ও বৃষ্টি হয়। ইহাই **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি**। পৃথিবীর বেশীর ভাগ বৃষ্টি এই জাতীয়।

পৃথিবীর **অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টিপাতের** সহিত **নিয়ত বায়ুর সম্পর্ক** সুস্পষ্ট। আর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর উষ্ণতা ও চাপের পরিবর্তন হয় খুব বেশী। ফলে, নিয়ত (আয়ন) বায়ুর পরিবর্তন হয়। এবং এখানে প্রবাহিত হয় মৌসুমী বায়ু। তাই এখানে প্রধানতঃ **মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে** বৃষ্টি হয়। তাহাছাড়া পৃথিবীর অনেক অংশেই প্রচুর **ঘূর্ণি বৃষ্টি** হয়।

অনুশীলনী

১। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির সহিত ভূপৃষ্ঠের বায়ুর উষ্ণতার সম্পর্ক কিরূপ? ২। বায়ুমণ্ডল কিরূপে উত্তপ্ত হয়? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৭)। ৩। পৃথিবীর কোন্‌ অংশে উষ্ণতা সবচেয়ে বেশী? তথায় ভূপৃষ্ঠ হইতে ক্রমশঃ উপর দিকে উষ্ণতার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে? ৪। ভূপৃষ্ঠে বায়ুর পরিবর্তন

সম্পর্কে অক্ষাংশের প্রভাব কিরূপ ? ৫। ভারতের উপকূল অঞ্চলে ও মধ্যভাগে অবস্থিত স্থানের উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য কিরূপ ? ৬। নিয়ত বায়ু কাহাকে বলে ? তিনটি নিয়ত বায়ুর নাম লিখ। ৭। সাময়িক বায়ু কাহাকে বলে ? দুইটি সাময়িক বায়ুর নাম লিখ। ৮। স্থানীয় বায়ু কাহাকে বলে ? দুইটি সাময়িক বায়ুর নাম লিখ। ৯। বায়ুপ্রবাহের সহিত বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক কিরূপ ? দুইটি উদাহরণ দাও। ১০। কোন্ বায়ু দ্বারা ভারতে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয় ?

দ্বিতীয় ভাগ

আঞ্চলিক ভূগোল

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

সপ্তম অধ্যায় | অবস্থিতি—এশিয়ার মধ্যে ভারত

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ভারত **দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যভাগে** অবস্থিত। এদেশের মূল ভূভাগের দক্ষিণ সীমা প্রায় ৮° উত্তর অক্ষাংশ ও উত্তর সীমা প্রায় ৩৭° উত্তর অক্ষাংশ। দেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়া কাল্পনিক কর্কট ক্রান্তিরেখা (২৩½° উঃ অঃ) পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এদেশের পশ্চিম সীমা প্রায় ৬৮° পূর্ব দেশান্তর ও পূর্ব সীমা প্রায় ৯৭° পূর্ব দেশান্তর। ভারতের উত্তরে চীন, নেপাল ও ভুটান। এদেশের পশ্চিমে পাকিস্তান, আফগানিস্থানের সামান্য অংশ ও আরব সাগর। ভারতের পূর্বদিকে বাংলাদেশ ও ব্রহ্মদেশ। এদেশের দক্ষিণে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর এবং তাহাদের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর।

আমাদের দেশের এরূপ **ভৌগোলিক অবস্থিতির** ফলে আমাদের **যোগাযোগের** বিশেষ **সুযোগ দক্ষিণদিকের উন্মুক্ত সমুদ্রপথে**। এই জন্যই সুদূর অতীতে আমাদের দেশের মানুষ নৌপথে গিয়াছে দক্ষিণে সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা), দক্ষিণপূর্বদিকে শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), কম্বোজ (ক্যাম্বোডিয়া), যবদ্বীপ (জাভা), বলিদ্বীপ (বালি) প্রভৃতি স্থানে। আর দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়াছে ইরান, ইরাক, আরবে, এমন কি ইহাদিগকে ছাড়াইয়া আফ্রিকা ও ইওরোপে। ইহাদের সকলের সহিতই আমাদের **ব্যবসা বাণিজ্য** এবং **শিক্ষা ও সংস্কৃতির** ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ **সম্পর্ক**। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার **বরবুদর, এংকোরবাট** প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন মন্দির ও অন্যান্য শিল্পকার্য **ভারতীয় সংস্কৃতির** নিদর্শন। ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছে ভারতের বহু সন্তান সন্ততি। এখন তাহারা সেখানকার মানুষ হিসাবেই পরিচিত।

বাণিজ্য উপলক্ষ্যে দক্ষিণের সমুদ্রপথেই ইওরোপের **ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ** প্রভৃতি জাতির লোক এবং আরব ও আফ্রিকার কিছু মানুষ এদেশে আসিয়াছে। ১৭৫৭ হইতে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় ১৯০ বৎসর আমাদিগকে থাকিতে

এশিয়াতে ভারত

সুমেরু
৬০° উঃ
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র
৪০° উঃ
চীন
পাকিস্তান
নেপাল
ভারত
বাংলা দেশ
২০° উঃ
জাপান
প্রশান্ত মহাসাগর
ইন্দোনেশিয়া
ভারত মহাসাগর
২০° দঃ
এশিয়া
ভারত
৬০° পূঃ
৯০° পূঃ
১২০° পূঃ
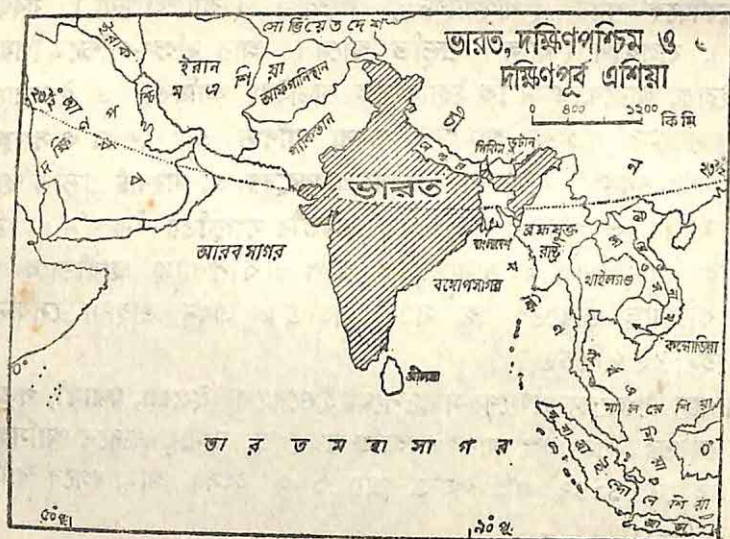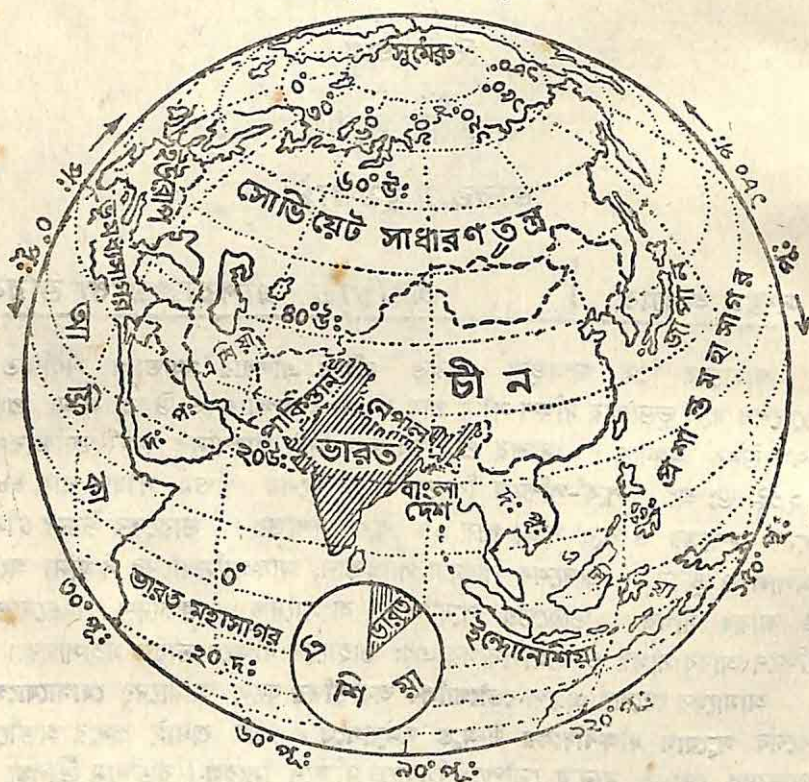
হইয়াছিল মুখ্যতঃ ইংরেজগণের সম্পূর্ণ অধীনে। এখনও সমুদ্রপথেই **যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র** ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার **ইরান, ইরাক, সৌদি আরব** প্রভৃতি দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশী।

অনুশীলনী

১। ভারত এশিয়ার কোন্ অংশে অবস্থিত? ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির নাম লিখ। ভারতের উত্তর সীমাতে কোন্ কোন্ দেশ? ২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত প্রাচীন কালে ভারতের কোন্ কোন্ বিষয়ে গভীর সম্পর্ক ছিল? ৩। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সহিত ভারতের সম্পর্ক কিরূপ? ৪। বিদেশের সহিত যোগাযোগ সম্পর্কে ভারতের অবস্থিতির সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ কর।

অষ্টম অধ্যায় | **ভারতীয় উপমহাদেশ**

ভারতের উত্তরদিকে **অত্যুচ্চ ও অতিদীর্ঘ পর্বতমালা ও উচ্চ মালভূমি পূর্ব-পশ্চিমে** বিস্তৃত। ইহাদের দক্ষিণে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ। তাহাদের মাঝখানে আমাদের **ভারত** অবস্থিত। এসকল দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক ও মানবিক বিভিন্ন বিষয়ে মিল যেমন বেশী, তেমনই বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যও অধিক। ফলে, এই অঞ্চলকে, অর্থাৎ আশপাশ সহ ভারতকে বলা যায় **পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ** বা **ক্ষুদ্র পৃথিবী** (Epitome of the world)। আশপাশের ও দূরের বহু দেশের মানুষ ভারতে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছে। তাই এদেশ **মহামানবের মিলনস্থল**। ইহা **অতীত মহিমায় সমুজ্জ্বল**। আবার **আধুনিক** কালের **প্রথম সারির দেশগুলির** মধ্যেও ইহা অন্যতম। প্রাকৃতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক,
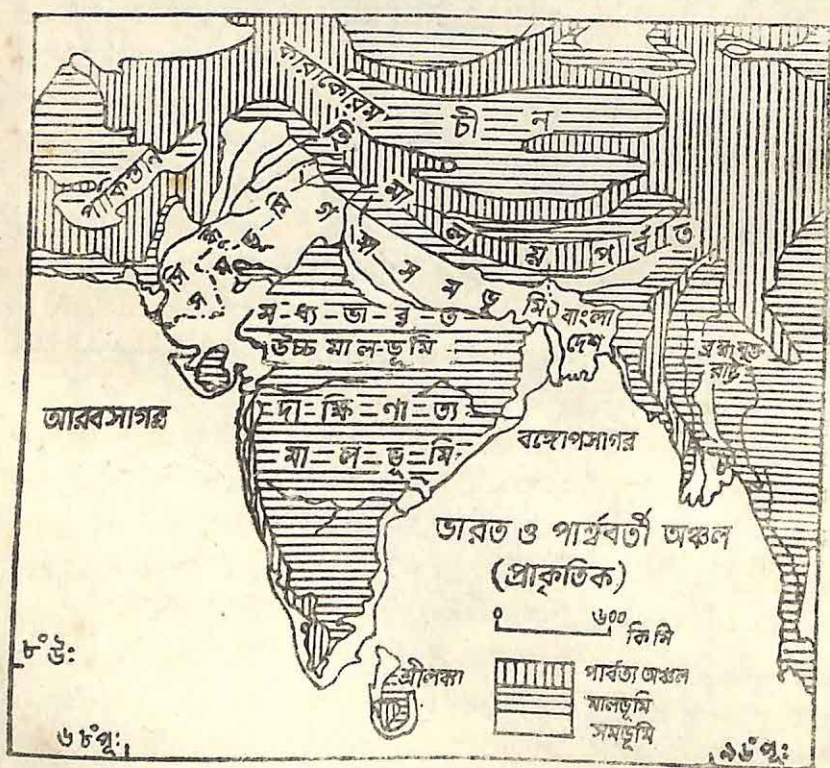
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নানা বিষয়েই এদেশের গুরুত্ব খুব বেশী। তাহা-ছাড়া এদেশের সহিত পূর্বদিকের **বাংলাদেশ,** উত্তরের **নেপাল, ভুটান** ও পশ্চিমের

পাকিস্তানের মধ্যে প্রাকৃতিক ও মানবিক নানা বিষয়ে মিল প্রচুর। ইহাদের বেশীর ভাগই পূর্বে ভারতবর্ষেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে, এই অঞ্চল **ভারতীয় উপমহাদেশ** (Indian subcontinent) রূপে গণ্য। এই উপমহাদেশের কয়েকটি **প্রধান বৈশিষ্ট্য** নিয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল।

(ক) **উপমহাদেশের প্রাকৃতিক বিষয়সমূহ**—(i) **এই অঞ্চলের উত্তরদিকে উচ্চ পার্বত্য ভূভাগ**—ভারতের উত্তর সীমার কতক অংশ এবং নেপাল ও ভুটান দেশ উচ্চ **হিমালয়** অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চল ঘন বনে সুশোভিত। পাকিস্তানের অধিকাংশ পর্বতবেষ্টিত উচ্চ মালভূমি। (ii) **এই অঞ্চলের মধ্য ভাগের বিস্তীর্ণ অংশে আছে নদীগঠিত উর্বর সমভূমি**। পৃথিবীর অন্যতম তিন প্রধান নদী **ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা** ও **সিন্ধু** এই অঞ্চলের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। এই অঞ্চলের জলবায়ু সম্বন্ধে গ্রীষ্মকালের আর্দ্র **মৌসুমী বায়ুর** প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে
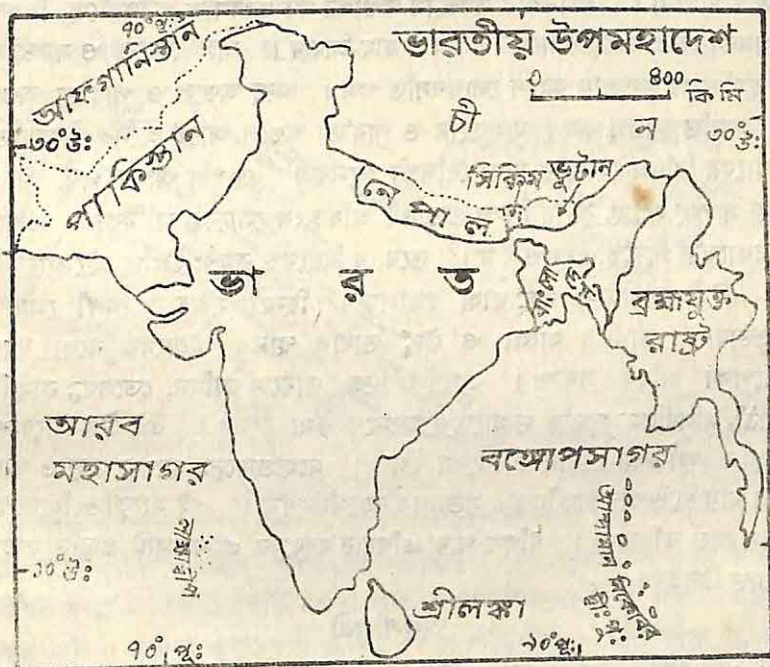
বেশী। ইহার প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয় ও **পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধান, পাট, আখ** জন্মে। তাহাছাড়া এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে গম, কার্পাস প্রভৃতি ফসল। এখানে পালন করা হয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী **গরু, মহিষ**। তবে এখানকার পশ্চিম অংশে আছে **মরুভূমি** ও মরুপ্রায় ভূমি এবং নিকৃষ্ট তৃণভূমি। এসকল অংশে পালন করা হয় অসংখ্য মেষ, ছাগ ও বহু

উট। (iii) এই উপমহাদেশের অন্তর্গত ভারতের দক্ষিণ অংশ এক অতি প্রাচীন **মালভূমি** ; তাহার নাম **দাক্ষিণাত্য**। এখানকার উচ্চ অংশ বনপূর্ণ। আর পাহাড়, পর্বতের ঢালে ও বিভিন্ন নদী উপত্যকাতে চাষ-আবাদ হয় প্রচুর।

(খ) **মানবিক বা সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ**—এই উপমহাদেশের উত্তর ও মধ্য অংশের অধিকাংশ লোক **ককেশীয়, মোঙ্গল** প্রভৃতি **জাতির** বংশধর। আর দক্ষিণ অংশে **দ্রাবিড় জাতির** বংশধর অনেক। এই উপমহাদেশ **হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখ** প্রভৃতি ধর্মের লোকের বাসভূমি। তবে এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে **ভৌগোলিক পরিবেশের** পার্থক্য এত বেশী যে বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের মধ্যে ঘরবাড়ি, পোশাক, জীবন ধারণ ও জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি সম্বন্ধে পার্থক্য প্রচুর। আবার প্রত্যেক অংশে এসকল বিষয়ের প্রভাব এত বেশী যে এক একটি অংশের অধিকাংশ অধিবাসীর মধ্যে জীবনধারা ও জীবিকা প্রভৃতি সম্পর্কে মিল অসামান্য। এখানকার **সমভূমি অঞ্চলের মত ঘনবসতি** পৃথিবীতে বিরল। এখানকার ৭৫-৮৫% লোকের জীবিকা **চাষ-আবাদ**। মালভূমিতে ও **সমভূমির** পশ্চিমদিকের মরুপ্রায় অংশে লোকবসতি কম। মরু অঞ্চলে ও **পার্বত্য** অঞ্চলে লোকবসতি আরও কম। মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলে আছে অনেক **উপজাতি**। তাহাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য অনেক। **এসকল** অংশে পশু পালন, বনজ সম্পদ সংগ্রহ, কুটীর শিল্প প্রভৃতিই অধিকাংশ লোকের জীবিকা। এখানে কৃষিকার্যের গুরুত্ব এখনও কম। তবে এ বিষয়েও ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে।

এই উপমহাদেশে **বহু ভাষা** প্রচলিত। **হিন্দী** সবচেয়ে বেশী লোকের মাতৃভাষা। তারপর **বাংলা** ও **উর্দু** ভাষার স্থান। ইহাদের মধ্যে বাংলা সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ। এগুলি ভিন্ন ভারতে **তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, মারাঠী, মালয়ালম্** প্রভৃতি ভাষাতেও অনেকে কথা বলেন। এই উপমহাদেশের সংস্কৃতি অতিশয় প্রাচীন ও বিশেষ উন্নত। **মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা** প্রভৃতি স্থানে দেখা যায় পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার বহু নিদর্শন। এই সংস্কৃতি বিদেশেও প্রসার লাভ করিয়াছে। **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বরবুদর, এঙ্কোরবাট** প্রভৃতি তাহার বিখ্যাত উদাহরণ।

অনুশীলনী

১। এশিয়ার কোন্ অংশে ভারতীয় উপমহাদেশ ? এশিয়ার এই অংশকে ভারতীয় উপমহাদেশ বলে কেন ? ২। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণনা কর। ৩। এই অঞ্চলের মানবিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থা কিরূপ ? এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের মধ্যে লোকবসতি ও তাহাদের জীবন ধারণের পদ্ধতি সম্বন্ধে পার্থক্য কিরূপ ? ৪। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি কোথায় অধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে ?

ভারতের আয়তন প্রায় ৩২.৮ লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ। তাই আয়তন হিসাবে ভারতের স্থান **এশিয়ার** দেশগুলির মধ্যে **দ্বিতীয়*** [চীনের পরে] ও **পৃথিবীতে সপ্তম**। এদেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে পার্থক্য প্রচুর। এই পার্থক্য অনুসারে এদেশের ভূপ্রকৃতির বিষয় **সাত** ভাগে নিম্নে আলোচিত হইল :—[১] হিমালয়, [২] উত্তর-পূর্বদিকের পাহাড় ও মেঘালয় মালভূমি, [৩] সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, [৪] ভারতীয় মরু, [৫] মধ্যভারত ও পূর্বদিকের উচ্চভূমি, [৬] দাক্ষিণাত্য মালভূমি, [৭] উপকূলের সমভূমি ও দ্বীপ অঞ্চল।

(১) হিমালয় অঞ্চল

ভারতের **উত্তর সীমা** জুড়িয়া **হিমালয়** পর্বত অঞ্চল **পূর্ব-পশ্চিমে** বিস্তৃত।
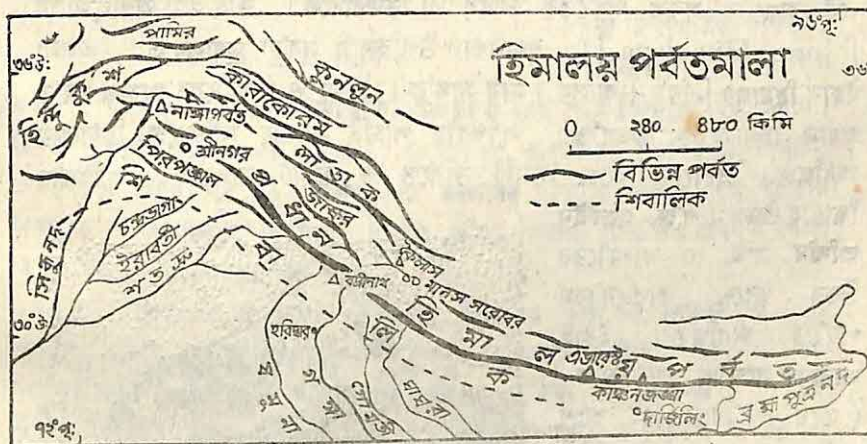
বহু পূর্বে এখানে ছিল অতিবৃহৎ মহীখাত (Geosyncline) বা অগভীর **টেথিস সমুদ্র**। কোটি কোটি বৎসর যাবৎ এখানে অসংখ্য স্তরে সঞ্চিত হইয়াছে পলি মাটি। এভাবে এখানকার ভূমির উচ্চতা বাড়িয়াছে। তাহাছাড়া পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রবল ভূ-আন্দোলন এবং পাশের ভূখণ্ডের অধিক পার্শ্বচাপের ফলে এখানকার উচ্চতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এভাবে এখানে সৃষ্টি হইয়াছে বিরাট **ভাঁজল** জাতীয় পর্বত। ইহারই নাম **হিমালয়**। উচ্চতা হিসাবে ইহা

* সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের আয়তন চীনের চেয়ে বেশী, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে এশিয়ার অন্তর্গত দেশ নহে।

পৃথিবীতে সর্বোচ্চ পর্বত, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ইহার স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয় (দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজের পরে)। হিমালয় পর্বত অঞ্চলের পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ কিঃমিঃ। তাহার পশ্চিম অংশ **পঞ্জাব হিমালয়**। ইহা পশ্চিমে সিন্ধু নদ হইতে পূর্বদিকে শতদ্রু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। তাহার পূর্বদিকে **কুমায়ুন হিমালয়**। ইহা পূর্বদিকে কালী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দুই অংশকে এক সঙ্গে **পশ্চিম হিমালয়** বলে। তাহার পূর্বদিকে **মধ্য হিমালয় বা নেপাল হিমালয়**। তাহার পূর্বদিকে দার্জিলিং হইতে অরুণাচল প্রদেশের পূর্ব সীমা পর্যন্ত **পূর্ব হিমালয়** বা **আসাম হিমালয়**। হিমালয় অঞ্চলের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ক্রমশঃ কম। ইহা পশ্চিম সীমাতে প্রায় ৪০০ কিঃমিঃ বিস্তৃত ও পূর্ব সীমাতে প্রায় ১৫০ কিঃমিঃ বিস্তৃত। হিমালয় অঞ্চলের যে সকল **পর্বতশ্রেণী** পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত তাহাদের মধ্যে তিনটি প্রধান।

[i] **হিমাদ্রি বা হিমাগিরি বা প্রধান হিমালয়**—ইহা হিমালয় অঞ্চলের **দীর্ঘতম, প্রাচীনতম ও উচ্চতম** পর্বত। এখানকার উচ্চতা গড়ে প্রায় ৬০০০ মিঃ। ইহা এই অঞ্চলের সকল পর্বতের উত্তরে বা **ভিতরদিকে**। তাই ইহা **অন্তর্হিমালয়** [Inner Himalaya]। এখানকার উপরিভাগ **সর্বদা তুষারাবৃত**। এজন্য ইহার **হিমালয়** [হিম + আলয়] নাম সার্থক। জম্মু ও কাশ্মীরের **জাস্কর পর্বত** প্রধান হিমালয়ের অন্তর্গত। পৃথিবীর পাঁচটি সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ হিমালয়ে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে তিনটি ভারতে ও দুইটি নেপালে। পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ **গডউইন অস্টিন** জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তর অংশে কারাকোরম পর্বতে অবস্থিত। ইহাই **ভারতের সর্বোচ্চ** পর্বতশৃঙ্গ। (তবে বর্তমানে এই অংশ পাকিস্তানের অধিকারে)। ইহার পরে পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ **কাঞ্চনজঙ্ঘার** স্থান (৮৫৯৮ মিঃ)। ইহা **ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম** গিরিশৃঙ্গ (গডউইন অস্টিনের পরে)। তবে এখন ইহাই ভারতের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ। ইহা সিকিমে। উচ্চতা হিসাবে পৃথিবীর পঞ্চম **শৃঙ্গ নন্দাদেবী** [৭৮১৭ মিঃ], ইহা উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কুমায়ুন হিমালয়ে অবস্থিত। আর **পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট** [৮৮৪৮ মিঃ] ও চতুর্থ **শৃঙ্গ ধবলাগিরি** [৮১৭২ মিঃ]
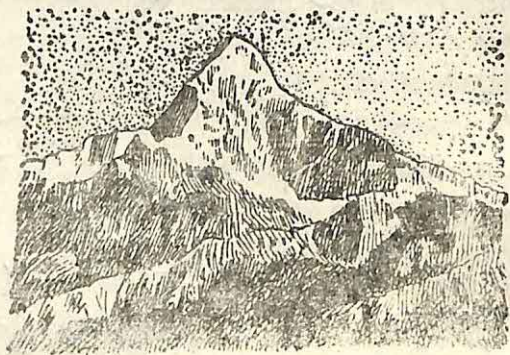
এভারেস্ট

মধ্য হিমালয়ে নেপালে অবস্থিত। দার্জিলিং-এর টাইগার হিল হইতে ভোরবেলা দেখা যায় এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘার অতুলনীয় সৌন্দর্য।

[ii] **লাডাক ও কারাকোরম**—প্রধান হিমালয়ের উত্তরে লাডাক উচ্চ মালভূমি। তাহার উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর অংশে **কারাকোরম** পর্বত। ইহা সম্ভবতঃ হিমালয়ের চেয়ে প্রাচীন। ইহার **গডউইন অস্টিন** বা K_2 [৮৭১৩ মিঃ] **পৃথিবীর দ্বিতীয়** উচ্চতম শৃঙ্গ।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ও আশপাশ

[iii] **হিমাচল বা মধ্য হিমালয়**—এই পর্বত প্রধান হিমালয়ের বা হিমগিরির দক্ষিণে। হিমালয় অঞ্চলের তিন প্রধান পর্বতশ্রেণীর মধ্যে **অবস্থিতি, উচ্চতা ও বয়স** তিন হিসাবেই ইহা **মধ্যম**। ইহার উচ্চতা গড়ে ৫০০০ মিঃ। জম্মু ও কাশ্মীরের **পিরপঞ্জাল,** হিমাচল প্রদেশের ও উত্তর প্রদেশের **ধৌলধর** বা **ধবলাধর** প্রভৃতি পর্বত এই শ্রেণীর অন্তর্গত। **কেদারনাথ, বদরীনাথ** প্রভৃতি তীর্থ, **সিমলা, দার্জিলিং** প্রভৃতি শৈল-নিবাস মধ্য হিমালয়ে অবস্থিত।

[iv] **শিবালিক বা অবহিমালয়**—ইহা হিমালয় অঞ্চলের **নিম্নতম** ও বয়স হিসাবে সবচেয়ে পরের বা **আধুনিকতম** পর্বত। অবস্থিতি হিসাবে ইহা হিমালয় অঞ্চলের সকলের দক্ষিণে বা **বাহিরদিকে**। সেজন্য ইহা **বহির্হিমালয়** [Outer Himalaya]। ইহার পূর্বদিকের অংশ অধিক **ক্ষয়প্রাপ্ত** ও **বিচ্ছিন্ন** বা ভগ্ন।

উপত্যকা—পিরপঞ্জালের উত্তরে আছে **বিতস্তা** নদীর উপত্যকা বা **কাশ্মীর উপত্যকা** [Vale of Kashmir]। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জলবায়ু এত মনোরম যে ইহা **ভূস্বর্গ** নামে পরিচিত। শিবালিক পর্বতের উত্তরে উত্তর প্রদেশের **দেরাদুন উপত্যকা ও কুমায়ুন হ্রদ**। এগুলিও চমৎকার জলবায়ু ও সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

হিমালয় অঞ্চলের প্রভাব—গ্রীষ্মকালে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর হইতে আর্দ্র **মৌসুমী বায়ু** উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রবল নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে আসে। তাহা হিমালয় অঞ্চলের দক্ষিণদিকের ঢালে বাধা পায়। তাই এখানে **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি** খুব বেশী। এই বৃষ্টির জল ও হিমালয়ের **তুষারগলা জল**

দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয় এবং উত্তর ভারতের **নদীগুলিকে পুষ্ট** করে। পার্বত্য অঞ্চলের গায়ে আছে **বহুতল অরণ্য**। এখানকার কতক অংশে এবং বহু উপত্যকাতে আছে **ফুল, ফল ও বিভিন্ন ফসলের চাষ-আবাদ**। হিমালয় অঞ্চলে **লোকবসতি কম, বৃহৎ শিল্পও কম**। কারণ, এখানে বৃষ্টি অধিক, জলবায়ু শীতল, যাতায়াত অসুবিধাজনক, জীবিকা অর্জনের সুযোগও কম। তবে এখানে নানারকম ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প উন্নত। এখানে **শৈলনিবাসও** আছে অনেক।

(২) উত্তর-পূর্ব অংশের পাহাড় ও মেঘালয় মালভূমি

ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশ **পাহাড়ময়**। এখানকার অধিকাংশ পাহাড় **ভঙ্গিল জাতীয়** ও আয়তনে ক্ষুদ্র। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। যেমন, অরুণাচলের উত্তরপূর্ব অংশের **মিসমি** পাহাড়, তাহার দক্ষিণে **আবর, মিরি ও ডাফলা** পাহাড়। এগুলি প্রায় পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ইহাদের দক্ষিণে **পাটকই বা পাটকই বুম** পাহাড়,
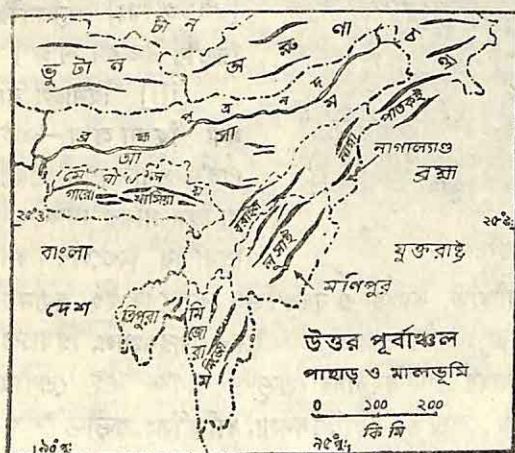
নাগা পাহাড়, **মীকির ও বরাইল** পাহাড়, এবং **মিজো ও লুসাই** পাহাড় প্রায় উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহাদের মাঝে মাঝে আছে বহু উপত্যকা।

নাগাল্যাণ্ডের পশ্চিমে এবং ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণে **মেঘালয় মালভূমি**। ইহা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ইহা দাক্ষিণাত্য মালভূমির মত একটি প্রাচীন **ক্ষয়প্রাপ্ত** মালভূমি। মেঘালয়ে **গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়** পরপর পূর্বদিকে অবস্থিত। এগুলিও প্রাচীন ও ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়। মেঘালয় মালভূমির দক্ষিণ-দিকের ঢাল খুব খাড়া। এখানকার মাঝে মাঝে কতক অংশ ভগ্ন।

উত্তর-পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চলের প্রভাব—গ্রীষ্মকালে দক্ষিণদিকের বঙ্গোপসাগর হইতে **আর্দ্র মৌসুমী বায়ু** উত্তর-পশ্চিম ভারতের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে আসে। তাহা এই অঞ্চলের পাহাড়গুলির ও মালভূমির দক্ষিণ ঢালে প্রবল বাধা পায়। সেজন্য এখানকার ঐ সময়ের **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি খুব বেশী** (৪০০ সেঃমিঃর অধিক)। মেঘালয় মালভূমির গারো, খাসিয়া প্রভৃতি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে বৃষ্টি সবচেয়ে বেশী। তথাকার **চেরাপুঞ্জি ও মৌসিনরাম**

বা **মৌসমাইয়ের বৃষ্টি** সমগ্র পৃথিবীতে **সর্বাপেক্ষা অধিক**। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এত অধিক বৃষ্টি হয় বলিয়া এখানে **নদী অনেক**। আর এক দিকে পার্বত্য ভূপ্রকৃতি, অন্য দিকে এপ্রকার বৃষ্টির জন্য এই অঞ্চল অরণ্যময়। অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর ও মিজোরামের মোট আয়তনের ৫০-৮০% **ঘন** বন দ্বারা আবৃত। এই পার্বত্য অঞ্চলের আর এক উৎপাত **ভূমিকম্প**। এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থাও খুব **অসুবিধাজনক**। এসকল কারণে এদেশের উত্তর-পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চলে **লোকবসতি** নিতান্ত **কম**। এখানে **আবর, মিসমি, মিকির, নাগা, লুসাই** প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ **গোষ্ঠীর** কতক লোক আছেন। ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করেন। এখানে বৃহৎ শিল্পের অভাব। তবে বাঁশ, বেত, কাঠ, কার্পাস প্রভৃতির তৈরী কুটির শিল্প এখানে উন্নত।

(৩) সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা

হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে মধ্যভারত উচ্চভূমির উত্তর সীমা পর্যন্ত **উত্তর ভারতের সমভূমি**। ইহা দেশের পশ্চিম হইতে পূর্ব সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই এখানকার পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ কিঃমি। এখানকার আয়তন প্রায় ৭½ লক্ষ বর্গ কিঃমিঃ অর্থাৎ সমগ্র ভারতের সিকি ভাগের চেয়ে সামান্য কম। এই সমুদয় অঞ্চল বহু কাল পূর্বে ছিল অতিগভীর মহীখাত বা অগভীর **টেথিস সমুদ্রের অংশ**। কোটি কোটি বৎসর যাবৎ **অতিগভীর** (১০০০-১৫০০ মিঃ গভীর) পলি এখানে সঞ্চিত হইয়াছে। ফলে, এখন **ইহা পৃথিবীর বিখ্যাত উর্বর সমভূমি**। এই অঞ্চলের উপর দিয়া বহু নদ, নদী প্রবাহিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে গঙ্গা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র এত **গুরুত্বপূর্ণ** যে ইহাদের নাম অনুসারে এই সমভূমির বিভিন্ন অংশের নিম্নরূপ **নামকরণ** হইয়াছে।

[i] **সিন্ধুর উপনদীসমূহের সমভূমি**—উত্তর ভারতের সমভূমির **পশ্চিম** ও **উত্তর-পশ্চিম** অংশ এই সমভূমি। এই সমভূমির উত্তর সীমা উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে ইহার উচ্চতা ৩০০ মিঃর অধিক। তথা হইতে এই সমভূমি **দক্ষিণ-পশ্চিমে ঢালু**। ভূমির এপ্রকার ঢালের জন্য সিন্ধুর উপনদী **শতদ্রু ও বিপাসার** কিছু অংশ এই সমভূমির ভারতের অন্তর্গত অংশের উপর দিয়া **দক্ষিণ-পশ্চিমে** বহিয়া গিয়াছে। বিপাসা সম্পূর্ণরূপে ভারতের অন্তর্গত। আর শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার নিম্ন অংশ ও মূল সিন্ধু নদ পাকিস্তানের সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই সমভূমি অঞ্চলের সেচব্যবস্থা প্রসিদ্ধ।

[ii] **গঙ্গা-সমভূমি**—উত্তর ভারতের **সমভূমির** বিস্তীর্ণ **মধ্যভাগ** বিখ্যাত **গঙ্গা-সমভূমি**। বস্তুতঃ উত্তর ভারতের সমভূমির অধিকাংশই গঙ্গা-সমভূমি। এই সমভূমি অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তে দিল্লীর পাশে আছে কিছু উঁচু জায়গা বা

দিল্লীর শৈলশিরা (Delhi Ridge)। তাই এখান হইতে এই সমভূমির পূর্বদিকে ঢাল বেশী। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সমগ্র গঙ্গা-সমভূমি **দক্ষিণ-দিকে ঢালু**। তবে এখানে ভূমির ঢাল খুব কম। কাজেই গঙ্গা-সমভূমির উপর দিয়া মূল নদী গঙ্গা ও ইহার উপনদী **গণ্ডক, ঘাঘরা, কোশী** প্রভৃতি **দক্ষিণ-পূর্ব-দিকে প্রবাহিত হইতেছে**। ইহাই ভারতের বৃহত্তম নদী-অববাহিকা।
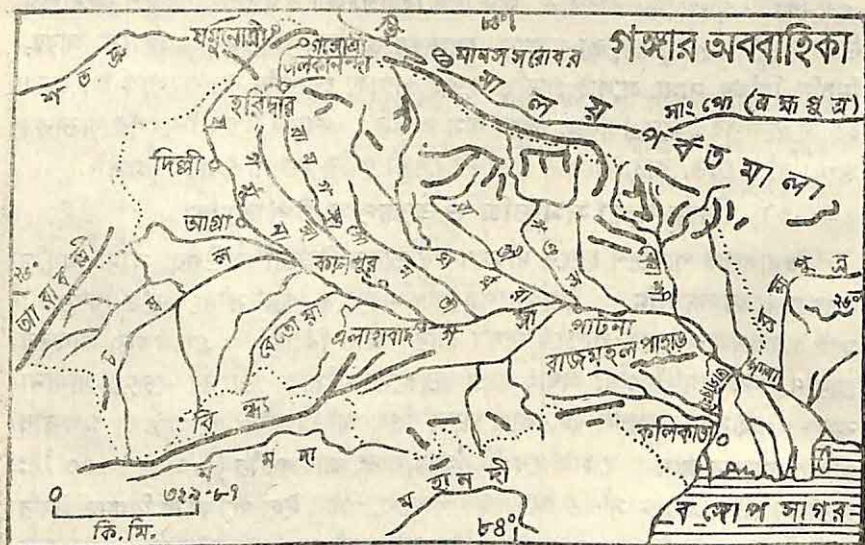
ভারতের অন্তর্গত গঙ্গা-সমভূমি অঞ্চলে বা **গঙ্গার অববাহিকাতে তিনটি বিভাগ** সুস্পষ্ট। দিল্লীর নিকট হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত এই সমভূমির পশ্চিম অংশ। ইহাকে বলে **উচ্চগঙ্গা সমভূমি**। এখানে বৃষ্টি কম, তবে জলসেচের সাহায্যে এখানে প্রচুর গম, আখ, কার্পাস জন্মে। এলাহাবাদ হইতে প্রায় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত গঙ্গা সমভূমির মধ্য ভাগ। ইহা **মধ্যগঙ্গা সমভূমি**। এখানে বৃষ্টি মধ্যম রকম। এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ভুট্টা, ধান, আখ। গঙ্গা-সমভূমির ভারতের অন্তর্গত অঞ্চলের পূর্ব অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। ইহাকে বলে **নিম্নগঙ্গা সমভূমি**। এখানে বৃষ্টি অধিক। এখানে ধান, পাট, ভুট্টা প্রভৃতি ফসল জন্মে। নিম্নগঙ্গা সমভূমির বাকী অংশ বাংলাদেশের অন্তর্গত।

[iii] **ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা**—উত্তর ভারতের সমভূমির **পূর্বদিকের অংশ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা**। এই সমভূমি অংশের পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৭০০ কিঃমিঃর অধিক, কিন্তু এখানকার উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার মাত্র ৫০-১০০ কিঃমিঃ। আসাম রাজ্যের অধিকাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকা অঞ্চলের ভূমি

উত্তর-পূর্ব হইতে **দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমে ঢালু**। তাহার উপর দিয়া **ব্রহ্মপুত্র নদ** পশ্চিমদিকে প্রবাহিত। এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকা অঞ্চলের সমভূমির **উত্তর ও দক্ষিণ সীমাতে ভূপ্রকৃতি খাড়া**। কারণ, এখানকার উত্তরদিকে আছে হিমালয়ের কতক শাখা প্রশাখা, আর দক্ষিণে আছে মেঘালয় মালভূমি। **বর্ষাকালে** আশপাশের পার্বত্য ভূমিতে খুব বেশী বৃষ্টি হয়। ঐ বৃষ্টির জল এই উপত্যকা অঞ্চলের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়। ফলে, তখন এই সমভূমি অঞ্চলে **প্রবল বন্যা হয়**। তখন এই উপত্যকার দুই পাশে **ভূমিক্ষয়** হয় খুব বেশী।
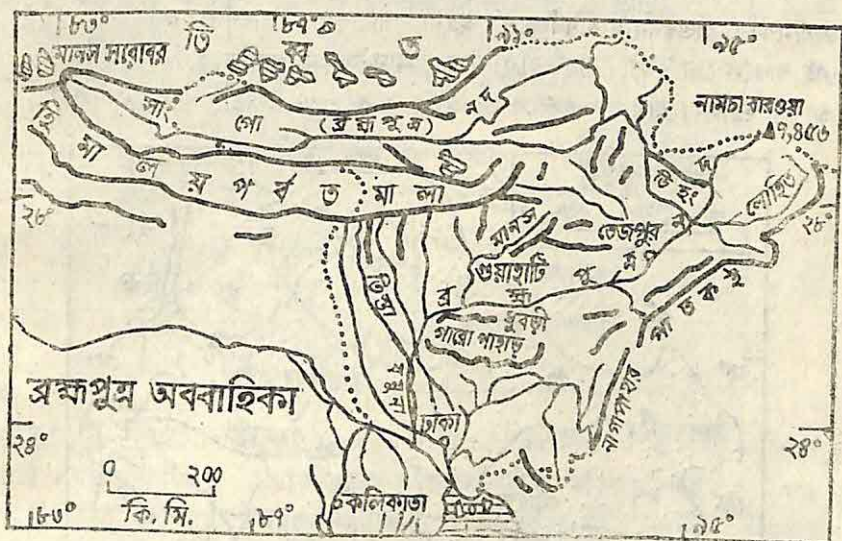
সমভূমি অঞ্চলের প্রভাব—উত্তর ভারতের নদী অববাহিকার সমভূমি অতি-গভীর পলিদ্বারা গঠিত। এখানকার পলির গভীরতা গড়ে ১০০০ মিঃ। সেজন্য এখানকার উপরিভাগ যেমন সমতল, এখানকার মৃত্তিকা তেমনই **উর্বর**। এখানকার ৭০-৭৫% লোকের জীবিকা **কৃষিকার্য**। সমগ্র সমভূমি অঞ্চলে বসবাস ও যাতায়াতের সুবিধা যেমন বেশী, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা অর্জনের সুযোগও তেমনই অধিক। ফলে, এখানকার **লোকবসতির ঘনত্ব** অতুলনীয়। এখানে গ্রাম, নগর, শহরের সংখ্যাও ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় অধিক।

(৪) ভারতীয় মরু অঞ্চল

উত্তর ভারতের সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে **রাজস্থানের** অধিকাংশ মরুভূমি। তাহাকে বলে ভারতীয় **মরু অঞ্চল** বা **মরুস্থলী**। ইহার পশ্চিমে পাকিস্তানের থর মরু, আর দক্ষিণ-পশ্চিমে অতি প্রাচীন ও ক্ষয়প্রাপ্ত **আরাবল্লী পর্বত**।

ভারতীয় মরু অঞ্চল সিন্ধুর উপনদীসমূহের সমভূমির মত দক্ষিণ-পশ্চিমে

ঢালু। ভূপ্রকৃতি হিসাবে ইহাও সমভূমি। এই অঞ্চলের ভূমির উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে গড়ে ১৫০-৩০০ মিঃর মধ্যে। মাঝে মাঝে আছে **পাথরের টুকরার স্তূপ**, বালুকার **ঢিবি, বালিয়াড়ি ও নীচু পাহাড়**। ইহাদের কয়েকটি ৪৫০ মিঃ পর্যন্ত উচ্চ। আরব সাগরের জলের সহিত প্রবাহিত বালুকারাশি বারে বারে এই অঞ্চলে সঞ্চিত হইয়াছে। ফলে, এখানকার মৃত্তিকা **বালুকাময়**। তাহাছাড়া এখানে শীত-গ্রীষ্মের উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এখানে দিবা ও রাত্রির উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্যও খুব বেশী। তাহার ফলে এখানকার **প্রস্তরসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ** হইয়া বালুকাতে পরিণত হয়। বায়ুবেগে এই অঞ্চলে ছোট-বড়, সোজা-বাঁকা নানা আকৃতির **বালিয়াড়ি** অনবরত সৃষ্টি হয়, আবার ভাঙ্গিয়া যায়। এভাবে তাহাদের আকৃতি ও উচ্চতার পরিবর্তন ঘটে।
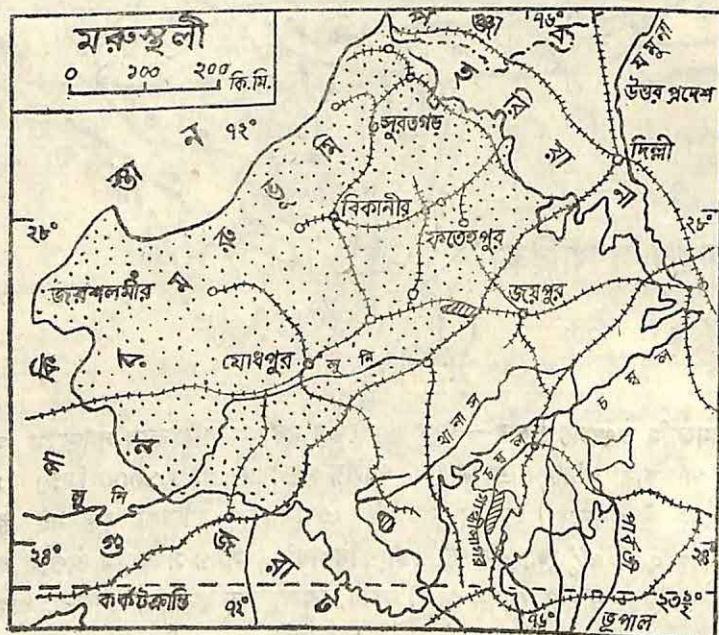
মরু অঞ্চলের প্রভাব—এই অঞ্চলে **বৃষ্টিপাতের অভাব**। তাই এখানে নদী নালা কম। এখানকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য নদী **লুনি**। একদিকে এখানকার ভূমি বালুকাময়, অন্যদিকে এখানে বৃষ্টির অভাব। সেজন্য এখানে আছে নিকৃষ্ট তৃণ, গুল্ম, কাঁটা গাছ। এই তৃণভূমি স্টেপ জাতীয় এবং **বাগার** নামে পরিচিত। সম্প্রতি বড় বড় **খালের** সাহায্যে এখানে **সেচের ব্যবস্থা** করা হইতেছে। এখানকার **রাজস্থান ক্যানেল পৃথিবীর দীর্ঘতম সেচখাল**। সেচের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এখানে কৃষির উন্নতি হইতেছে। এখানে শিল্প, যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতিরও

উন্নতি হইতেছে। এসকল কারণে এখানে লোকবসতিও বাড়িতেছে। এখানকার কতক প্রাসাদ, দুর্গ, কেল্লা, মন্দির প্রভৃতি পাথরের তৈরী এবং সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত।

(৫) মধ্যভারত ও পূর্বদিকের উচ্চভূমি

গঙ্গা-সমভূমির দক্ষিণ হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত **মধ্যভারত উচ্চভূমি** অঞ্চল। বস্তুতঃ গঙ্গা-সমভূমির দক্ষিণ হইতে ভারতের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত যে মালভূমি অঞ্চল বিস্তৃত, ইহা তাহার উত্তর অংশ (নর্মদার উত্তরে)। সমুদ্রতল

হইতে এই অঞ্চলের উচ্চতা ২০০-৪৫০ মিঃ। এখানকার পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭৫০ কিঃমিঃ। তাহার পশ্চিম সীমাতে আছে **আরাবল্লী পর্বত**। আর পূর্ব সীমাতে আছে **রাজমহল পাহাড়**। মধ্যভারতের এই উচ্চভূমি অঞ্চলের দক্ষিণে আছে **বিন্ধ্য, কাইমুর, মহাকাল** প্রভৃতি ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বত। এজন্য এখানকার ভূমি **দক্ষিণ হইতে উত্তরে ঢালু**। এখানকার উপর দিয়া উত্তরদিকে বহিয়া গিয়াছে গঙ্গার ডান তটের উপনদী **শোণ** এবং যমুনার উপনদী **চম্বল** ও অন্য কয়েকটি নদী।

মধ্যভারতের মালভূমির পশ্চিম অংশ মালব মালভূমি। তাহার দক্ষিণে আছে **বিন্ধ্য পর্বত**। ইহা ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বত। এখানকার উচ্চতা গড়ে ৩০০ মিঃ। তবে এখানকার কতক শৃঙ্গ ৮০০ মিটারের অধিক উঁচু। এই পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশ দিয়া **নর্মদা নদী** পশ্চিমদিকে প্রবাহিত। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর-পূর্ব সীমার নিকট **কাইমুর পাহাড়** দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্বদিকে বিস্তৃত। এই পাহাড়ের পশ্চিমে **বুন্দেলখণ্ড** ও পূর্বদিকে **বাগেলখণ্ড** মালভূমি। দুইটিই আয়তনে ক্ষুদ্র। ইহাদের দক্ষিণে **মহাকাল** বা **মাইকাল** বা **মাকালা পাহাড়**। ইহা ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়।

বাগেলখণ্ডের দক্ষিণ-পূর্বদিকে ক্ষয়প্রাপ্ত **ছোটনাগপুর** মালভূমি। এখানকার

উত্তর-পূর্ব অংশে আছে **পরেশনাথ পাহাড়**। ইহার উচ্চতা ১৩৭৩ মিঃ। ইহার উত্তর-পূর্বে **রাজমহল পাহাড়**। এই দুইটিও ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়।

মধ্যভারত ও পূর্বদিকের উচ্চভূমি অঞ্চলের প্রভাব—মালব মালভূমির মৃত্তিকা **লাভা** হইতে উৎপন্ন। সেজন্য ইহার **রং কাল**। তবে ইহা উর্বর। এখানে বৃষ্টি কম। তাই এখানে জোয়ার জন্মে। এখন সেচের সাহায্যে **গম, কার্পাস, ভুট্টা** প্রভৃতির চাষ হয় প্রচুর। বাগেলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড ও ছোটনাগপুরে **বন** বহু দূর বিস্তৃত। সেজন্য এসকল স্থানে চাষ-আবাদের সুযোগ কম। তবে ছোটনাগপুর মালভূমি এদেশের **খনিজ সম্পদের কেন্দ্র**। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে **কয়লা প্রধান**। এখানে প্রচুর লৌহ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতিও পাওয়া যায়। ফলে, ছোটনাগপুর ও তাহার আশপাশ এদেশের **লৌহ ও ইস্পাত** এবং **পূর্ত শিল্পের** সর্বপ্রধান কেন্দ্র। অবশ্য, এ বিষয়ে জল সরবরাহ, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতির সুযোগও আছে। মধ্যভারত ও ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল বহু উপজাতির বাসভূমি। তাহাদের মধ্যে সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ওঁরাও, বীরহুর, ভিল, অসুর প্রভৃতি প্রধান।

(৬) দাক্ষিণাত্য মালভূমি

নর্মদা নদীর দক্ষিণে দক্ষিণ ভারত। ইহার বৃহৎ অংশ **দাক্ষিণাত্য** মালভূমি। বস্তুতঃ পক্ষে গঙ্গা সমভূমির দক্ষিণ হইতে ভারতের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত যে বৃহৎ মালভূমি অঞ্চল অবস্থিত, ইহা তাহার দক্ষিণ অংশ। এই মালভূমি **প্রাচীন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের** অংশ। এখানকার আকৃতি প্রায় ত্রিকোণ। ইহা অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত। সেজন্য এখানকার উচ্চতা ৩০০-৯০০ মিটারের মধ্যে। এই মালভূমির তিন দিকেই পর্বত। সেগুলিও ক্ষয়প্রাপ্ত। এই মালভূমি পশ্চিম হইতে **পূর্বদিকে ঢালু**। এজন্য এখানকার নদীগুলি সাধারণতঃ পূর্ববাহিনী। কেবল এখানকার উত্তর সীমাতে নর্মদা নদী ও তাহার সামান্য দক্ষিণে তাপী নদী পশ্চিম-বাহিনী। এই মালভূমির পূর্ব ও পশ্চিমদিকে উপকূলে আছে সমভূমি।

দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর সীমাতে **সাতপুরা পর্বত**। তাহা নর্মদা নদীর দক্ষিণদিক দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। সাতপুরার দক্ষিণে আছে **মহাদেব পর্বত**। উহার সর্বোচ্চ **শৃঙ্গ পাচমারি** (১৩৫০ মিঃ উচ্চ)। মহাদেব পর্বতের দক্ষিণে আছে **অজন্তা পাহাড়**। এখানকার গুহাচিত্র বিখ্যাত। দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিম সীমাতে আছে **পশ্চিমঘাট** বা **সহ্যাদ্রি পর্বত**। ইহা প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০০ কিঃমিঃ। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **কলসুবাই**। এই পর্বতের গায়ে অনেক **ঘাট** বা **ধাপ** আছে। দাক্ষিণাত্য মালভূমির পূর্বসীমাতে আছে **পূর্বঘাট** বা **মলয়াদ্রি পর্বত**। ইহা

উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত। ইহার মাঝে মাঝে আছে চারিটি বৃহৎ ফাঁক। তাহাদের মধ্য দিয়া মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদী পূর্বদিকে বহিয়া গিয়াছে। সবগুলিই বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পূর্বঘাটের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মহেন্দ্রগিরি।

দাক্ষিণাত্য মালভূমির দক্ষিণ অংশে **নীলগিরি পর্বত**। এখানে পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট মিলিত হইয়াছে। নীলগিরি পর্বতের সর্বোচ্চ **শৃঙ্গ দোদাবেতা**। ইহার উচ্চতা ২৬৩৭ মিঃ। ইহার দক্ষিণে আছে বিখ্যাত **পালঘাট গিরিপথ** (Palghat gap)। ইহা প্রায় ২৪ কিঃ মিঃ চওড়া। ইহার মধ্য দিয়া **স্থলপথ** ও রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। এসকল পথে **মালভূমির** মধ্যভাগের সহিত পশ্চিম উপকূলের **সমভূমির যোগাযোগ** ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। পালঘাটের দক্ষিণে **আনাইমুদি** শৃঙ্গ। ইহা **দাক্ষিণাত্যের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ**। ইহার উচ্চতা ২৬৯৫ মিঃ। এই **আনাইমুদি** শৃঙ্গ **আন্নামালাই, পালনি ও কার্ডামম** পাহাড়ের মিলনস্থল।

দাক্ষিণাত্য মালভূমির প্রভাব—দাক্ষিণাত্য মালভূমির **উত্তর-পশ্চিম** অংশের মৃত্তিকা লাভা হইতে উৎপন্ন। এজন্য ইহার রং কাল। ইহা খুব উর্বর। এখানে প্রচুর কার্পাস জন্মে। তাই এই মৃত্তিকাকে বলে **কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা** (Regur)। এখানে গমও জন্মে প্রচুর। দাক্ষিণাত্য মালভূমির **মধ্যভাগে** মৃত্তিকা অনুর্বর, বৃষ্টিও কম। তথায় **রাগি, বাজরা** ও **জোয়ার** জন্মে। বিভিন্ন নদীর উপত্যকাতে **ধান** জন্মে। দাক্ষিণাত্যের পাহাড়, পর্বত **বনপূর্ণ**।

ঐ সকল অঞ্চলে অনেক উপজাতি বাস করে। দক্ষিণদিকে **নীলগিরি** ও অন্যান্য পাহাড়ের ঢালে **চা, কফি** ও নানারকম **মসলার** আবাদ আছে।

(৭) উপকূলের সমভূমি ও দ্বীপ অঞ্চল

দাক্ষিণাত্য মালভূমির পূর্বদিকে **পূর্বঘাট পর্বত**। তাহার পূর্বদিকের পাদদেশ হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পূর্ব উপকূলের সমভূমি বিস্তৃত। আর দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিমে **পশ্চিমঘাট পর্বত**। তাহার পশ্চিমদিকের পাদদেশ হইতে আরব সাগর পর্যন্ত পশ্চিম উপকূলের সমভূমি অঞ্চল।

(ক) **পূর্ব উপকূলের সমভূমি—ভারতের পূর্ব উপকূল** প্রকৃত পক্ষে **বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূল**। ইহা প্রায় **অভগ্ন**। এখানকার সমভূমি উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে অধিক বিস্তৃত। এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত। সকলের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গে আছে **দীঘার সৈকত-ভূমি** বা **কাঁথি উপকূল**। তাহার দক্ষিণে উড়িষ্যাতে আছে **উৎকল উপকূল**। তাহার দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশে আছে **অন্ধ্র উপকূল**। সকলের দক্ষিণে তা মি ল না ড়ু তে আছে **করমণ্ডল উপকূল**। এদেশের এই পূর্ব উপকূলে উত্তর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে আছে **মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী** নদীর **বদ্বীপ**। গোদাবরী ও কৃষ্ণার বদ্বীপ পরস্পর প্রায় যুক্ত। পূর্বদিকের এই বদ্বীপ অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর। সমগ্র পূর্ব উপকূলভাগে সমুদ্রের

নিকটতম অংশ **বালুকাময় সৈকতভূমি**। এখানে কতক বালিয়াড়ি আছে। কোথাও কোথাও আছে **লেগুন** বা **উপহ্রদ**। তাহাদের মধ্যে উড়িষ্যার **চিল্কা** প্রধান। এসকল উপহ্রদে ও পাশে সমুদ্রে প্রচুর মাছ ধরা হয়। পূর্ব উপকূলের মাদ্রাজ বন্দরের পাশের বালুকাময় অঞ্চল ম্যারিনা বীচ নামে পরিচিত। পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন অংশে আছে আরও কয়েকটি **বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র**। তাহাদের মধ্যে বিশাখাপটনম্, শ্রীহরিকোটা প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

(খ) **পশ্চিম উপকূলের সমভূমি—ভারতের পশ্চিম উপকূল** প্রকৃত পক্ষে

আরব সাগরের পূর্ব উপকূল। ইহা প্রায় সোজাসুজি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এখানকার সমভূমি উত্তর হইতে দক্ষিণে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ। এই উপকূলের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম। যেমন, এখানকার উত্তর অংশ যাহা গোয়ার উত্তরে, তাহা **কঙ্কন উপকূল** নামে পরিচিত। পশ্চিম উপকূলের মধ্য অংশ কর্ণাটক রাজ্যে। তাহার নাম **কানাড়া উপকূল**। পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণ অংশ কেরালা রাজ্যে। তাহার নাম **মালাবার উপকূল**। পূর্ব উপকূলের তুলনায় পশ্চিম উপকূলের সমভূমি অনেক সঙ্কীর্ণ। তাহাছাড়া পশ্চিম উপকূলের এই সমভূমির পূর্ব সীমাতে পশ্চিমঘাটের পশ্চিম ঢাল ও পাদদেশের ভূপ্রকৃতি খাড়া। আবার এই সমভূমির পশ্চিম সীমাতে আরব সাগরের উপকূলও খাড়া। তারপর **পশ্চিম উপকূলের** দুই অংশ খুব বেশী **ভগ্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত**। এখানকার উত্তর অংশে গোয়ার আশপাশে **খাড়ি** অনেক। আর দক্ষিণে মালাবার উপকূলে আছে আরও বেশী সংখ্যক অগভীর **উপহ্রদ** (লেগুন) ও **হ্রদ** (ব্যাক ওয়াটার)। দক্ষিণ অংশের হ্রদ ও উপহ্রদগুলি **খাল দ্বারা** পরস্পরের সহিত যুক্ত। এখানে প্রচুর মাছ ধরা হয়। দাক্ষিণাত্যের **পশ্চিম উপকূলের** প্রায় উত্তর সীমাতে

আছে **নর্মদার** মোহনা। তাহার সামান্য দক্ষিণে আছে **তাপীর** (তাপ্তীর) মোহনা। এই দুই নদীর কোনটিরই **বদ্বীপ** নাই। পশ্চিম উপকূলেও সমুদ্রের নিকটতম অংশ **বালুকাময় সৈকতভূমি**। পশ্চিম উপকূলের বোম্বাই, গোয়া প্রভৃতি নগর, বন্দরের পাশের সৈকতভূমির দৃশ্য চমৎকার। এই উপকূলে ভারতের নৌ-বাহিনীর সব চাইতে বড় ঘাটি অবস্থিত।

উপকূলের সমভূমির প্রভাব—পূর্ব ও পশ্চিম, উভয় উপকূলে **সমভূমি উর্বর**। দুই উপকূলেই **বৃষ্টিপাতও** প্রচুর। ইহাদের **দক্ষিণ অংশে বৎসরে দুই বার অধিক বৃষ্টি হয়**। উভয় উপকূলের প্রধান ফসল **ধান**। দুই উপকূলেই **নারিকেল ও মসলার আবাদ**, শিল্পকেন্দ্র, বন্দর এবং মাছ ধরিবার কেন্দ্র অনেক। জীবিকা অর্জন, যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ে উভয় উপকূলেই সুযোগ প্রচুর। ফলে, উভয় উপকূলের **লোকবসতির ঘনত্ব** উত্তর ভারতের সমভূমির মত।

(গ) **দ্বীপ অঞ্চল**—বঙ্গোপসাগরের **আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ** ভারতের অন্তর্গত বৃহত্তম **দ্বীপপুঞ্জ**। তাহাছাড়া সুন্দরবনের দক্ষিণ অংশে আছে **সাগর দ্বীপ**। ভারতের পূর্ব উপকূলের দক্ষিণ অংশের পাশে আছে **রামেশ্বরম্‌-ও মান্নার দ্বীপ**। আর পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণ অংশের পাশে আছে **লক্ষ দ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদীভ দ্বীপপুঞ্জ**।

দ্বীপ অঞ্চলের প্রভাব—দ্বীপ অঞ্চলের বহু স্থান **ঘন বনপূর্ণ**। এখানে যাতায়াতের অসুবিধাও খুব বেশী। তাই **লোকবসতি** কম। তবে এখানে নারিকেলের আবাদ ও মাছ ধরিবার কেন্দ্র আছে অনেক। ধান চাষও বাড়িতেছে। সম্প্রতি এখানে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে।

অনুশীলনী

১। গঠন হিসাবে হিমালয় কোন্‌ জাতীয় পর্বত? হিমালয় পর্বত সৃষ্টির আগে এজায়গাতে কি ছিল? হিমালয় পর্বতের নামকরণের সার্থকতা কি? এখানে কতগুলি প্রধান পর্বতশ্রেণী আছে? তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি সর্বপ্রধান? হিমালয়ের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কি? তাহা কোথায় অবস্থিত? হিমালয়ের উচ্চতম ৫টি শৃঙ্গের মধ্যে কয়টি ভারতে অবস্থিত? তাহাদের নাম কি? হিমালয়ের কোন্‌ পর্বতশ্রেণীকে মধ্যহিমালয় বলে? হিমালয়ের কোন্‌ অংশকে নিম্ন হিমালয় বা অবহিমালয় বলে? ২। হিমালয় পর্বতের জন্য ভারতের কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে সুবিধা হইতেছে? হিমালয় অঞ্চলের দুইটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাসের নাম লিখ। হিমালয়ের কোন্‌ অংশ গঙ্গার উৎস? তাহার নাম কি? ৩। ভারতের উত্তরপূর্ব অংশের দুইটি পাহাড়ের নাম লিখ। এই অংশে কোন্‌ মালভূমি অবস্থিত? এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী কেন? এখানকার কোন্‌ স্থান বৃষ্টিপাতের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত? ৪। উত্তর ভারতের সমভূমি কিভাবে সৃষ্টি হইয়াছে? এই সমভূমি অত্যন্ত উর্বর কেন? এখানে লোকবসতি অত্যন্ত বেশী কেন? ভারতের বৃহত্তম নদী-অববাহিকা কোন্‌টি? (মাধ্যমিক পরীক্ষা ১৯৮৬ Ext) ৫। রাজস্থানের ভূপ্রকৃতি কিরূপ? এখানে লোকবসতি কম কেন? এই অঞ্চলের উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা হইতেছে? ৬। আরাবল্লী পর্বত কোথায়? ইহা কোন্‌ জাতীয় পর্বত? বিন্ধ্য পর্বত কোথায়? ৭। ছোটনাগপুর মালভূমি কোথায়? ইহা কেন বিখ্যাত? ৮। দাক্ষিণাত্য মালভূমি কোথায়? এখানকার ভূপ্রকৃতি কিরূপ? এই মালভূমির আকৃতি কিরূপ? এখানকার কোন্‌ পর্বত দীর্ঘতম? এখানকার উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ কি? তাহা কোথায় অবস্থিত? পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য কি? এই দুই পর্বত কোথায় মিলিত হইয়াছে? দাক্ষিণাত্য মালভূমির কোন্‌ গিরিপথ যোগাযোগের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ? ৯। ভারতের পূর্ব উপকূলের কোন্‌ অংশের কি নাম? পশ্চিম উপকূলের কোন্‌ অংশের কি নাম? কঙ্কন উপকূল কোথায়? মালাবার উপকূল কোথায়? করমণ্ডল উপকূল কোথায়? ভারতের পূর্ব

ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য খুব বেশী ? ১০। পূর্ব উপকূলের সমভূমিতে কোন্ কোন্ নদীর বদ্বীপ অবস্থিত ? ১১। উপকূল অঞ্চলে লোকবসতি কিরূপ ? এরূপ হওয়ার কারণ কি ? ১২। এদেশের বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জের নাম কি ? তাহা কোথায় ? ১৩। ভারতের প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগগুলি কি কি ? যে কোন একটি বিভাগের ভূপ্রকৃতির বিবরণ দাও। ভারতের প্রাচীনতম পর্বতটির নাম লিখ। (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৭)

ভারত **নদীমাতৃক দেশ**। **এদেশে** ছোট-বড় নদ, নদী অসংখ্য। এদেশের উন্নতি এসকল নদীর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। এদেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভূপ্রকৃতি, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি সম্পর্কে পার্থক্য খুব বেশী। ফলে, বিভিন্ন অংশের নদ-নদীর মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। উত্তর ভারতের নদীগুলি দক্ষিণবাহিনী এবং দৈর্ঘ্যে বড়। তাহাদের উপনদী, শাখানদী অনেক। এই নদীগুলি বহুদূর সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত। তাহাদের অববাহিকা ও বদ্বীপ অঞ্চল বিস্তীর্ণ। এসকল স্থান কৃষি ও শিল্পে উন্নত। এরূপ নানা কারণে এখানে লোকসংখ্যা অনেক এবং লোকবসতি ঘন। অপরদিকে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি দৈর্ঘ্যে ছোট ও পূর্ববাহিনী। এই অংশের কেবল নর্মদা ও তাপী (তাপ্তী) নদী পশ্চিমবাহিনী। দক্ষিণ ভারতের সকল নদীই প্রধানতঃ মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত। ইহাদের সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত অংশের দৈর্ঘ্য কম। উত্তর ভারতের নদীগুলির তুলনায় ইহাদের গুরুত্বও কম।

(ক) উত্তর ভারতের নদী (হিমালয় হইতে উৎপন্ন নদী)

(১) **গঙ্গা** (দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ কিঃমিঃ)—ইহা **ভারতের সর্বপ্রধান** নদী। **পৃথিবীর প্রধান** নদীগুলির মধ্যেও ইহা **অন্যতম**। তাহাছাড়া ভারতীয় নদী-সমূহের মধ্যে ইহার দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী। কারণ, ইহার মোট দৈর্ঘ্যের মধ্যে প্রায় ২০৭০ কিঃমিঃ ভারতের উপর দিয়া প্রবাহিত। এদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত অন্য কোন নদীর এতটা অংশ এদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহের পশ্চিমে **গোমুখ** বা **গোমুখী** এই নদীর উৎস। ইহা প্রকৃত পক্ষে গঙ্গার পার্বত্য অংশের উপনদী **ভাগীরথীর উৎস**। এখানকার পার্বত্য অঞ্চলের উপনদী ভাগীরথী, অলকানন্দা প্রভৃতির মিলনের ফলে **গঙ্গার উৎপত্তি** বা **সৃষ্টি** হইয়াছে। গঙ্গা পার্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়া কিছুদূর দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। তারপর শিবালিক পর্বতের দক্ষিণে **হরিদ্বারের নিকট** ইহা **সমভূমিতে** পৌঁছিয়াছে। সেখান হইতে উত্তর ভারতের সমভূমির উপর দিয়া ইহা দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বদিকে আসিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকট ইহা **দুই শাখায়** বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা **ভাগীরথী-হুগলি** ও অন্য শাখা **পদ্মা**। এই দুইটিই **বঙ্গোপসাগরে** পতিত হইয়াছে। ভাগীরথী-হুগলি পশ্চিমবঙ্গের নদী। আর পদ্মার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের এবং বেশীর ভাগ বাংলাদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত। এখানে পদ্মার সহিত **যমুনা** মিশিয়াছে। তারপর এই মিলিত নদী ও **মেঘনা** পরস্পরের সহিত মিশিয়াছে। এবং মেঘনা নামেই

এই নদী বঙ্গোপসাগরে গিয়া মিশিয়াছে। ভারতের সবচেয়ে বেশী জায়গার বৃষ্টির জল গঙ্গার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ ভারতের সবচেয়ে বেশী জায়গা এই নদীর অববাহিকা।

উপনদী, শাখানদী ও বদ্বীপ—গঙ্গার **সর্বপ্রধান উপনদী যমুনা**। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহের পশ্চিমে যমুনোত্রী হিমবাহ অবস্থিত। ইহাই যমুনার উৎস। সেখান হইতে গঙ্গার ডান দিক দিয়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে আসিয়া ইহা গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। কাজেই ইহা গঙ্গার ডান তটের উপনদী। গঙ্গা ও যমুনার মিলনস্থল এলাহাবাদের পাশে প্রয়াগ। **চম্বল, শোণ** প্রভৃতিও গঙ্গার ডান তটের উপনদী। আর **গোমতী, ঘাঘরা, গণ্ডক, কোশী** প্রভৃতি গঙ্গার বাম
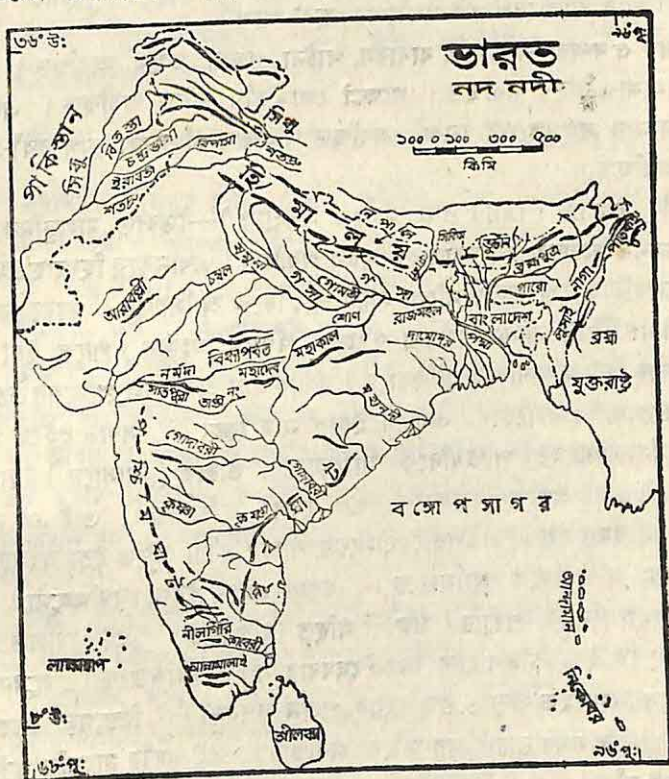
তটের উপনদী। মূল গঙ্গা নদী ও ইহার অনেক উপনদীর সাহায্যে প্রচুর **সেচকার্য** হয়। গঙ্গানদীর উপর মুর্শিদাবাদ জেলার **ফরাক্কাতে পৃথিবীর দীর্ঘতম ব্যারেজ** তৈরী হইয়াছে। এই ব্যারেজের উপর দিয়া স্থলপথ ও রেলপথ তৈরী হইয়াছে। ফলে, যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যারেজ তৈরীর ফলে গঙ্গার শাখা **ভাগীরথী-হুগলি** নদীর মধ্য দিয়া নৌপথে যাতায়াতের

পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় নাই। এই ব্যারেজ তৈরী হওয়া সত্ত্বেও ভাগীরথীর মধ্য দিয়া আশা অনুযায়ী বেশী জল প্রবাহিত হইতেছে না। কাজেই এই নদীর দুই তীরে বিভিন্ন শিল্পেরও আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। অপরদিকে এই নদীর তীরে অধিক শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে গঙ্গার জলের দূষণ এক বিরাট সমস্যা। এই অঞ্চলের বায়ুরও দূষণ হইতেছে অসামান্য পরিমাণে। গঙ্গার শাখানদীর মধ্যে **পদ্মা** সর্বপ্রধান। তবে ভারতের অংশে **ভাগীরথী-হুগলি** শাখানদী প্রধান। **জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, ইছামতী** প্রভৃতিও গঙ্গার কয়েকটি শাখানদী। **গঙ্গা (পদ্মা)-ব্রহ্মপুত্র (যমুনা)-মেঘনার বদ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ**। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অধিকাংশ এই বদ্বীপের অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গ এই বদ্বীপের পশ্চিম অংশ। আর বাংলাদেশ এই বদ্বীপের পূর্ব অংশ।

নগর ও বন্দর—কানপুর, বানারস, পাটনা গঙ্গার তীরে অবস্থিত। **দিল্লী, আগ্রা** যমুনার তীরে অবস্থিত। **লক্ষ্নৌ** গোমতীর তীরে অবস্থিত। **এলাহাবাদ** গঙ্গা-যমুনার **সঙ্গমস্থলের** নিকট অবস্থিত। আর **কলিকাতা** ভাগীরথী-হুগলির তীরে অবস্থিত।

(২) **ব্রহ্মপুত্র** (দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭২০ কিঃমিঃ)—তিব্বত মালভূমির দক্ষিণে প্রসিদ্ধ **মানস সরোবর-রাক্ষসতাল হ্রদ** অঞ্চল অবস্থিত। এখানকার **হিমবাহ** ব্রহ্মপুত্রের **উৎস**। সেখান হইতে নদীটি **সাঁপো** নামে পূর্বদিকে আসিয়াছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমার উত্তরে নামচা বারোয়া শৃঙ্গের (৭৭৭৪ মিঃ উচ্চ) পাশে ইহা **গভীর খাতের** মধ্য দিয়া দক্ষিণদিকে বাঁকিয়াছে। তথায় ইহা অরুণাচল প্রদেশের উত্তরপূর্ব অংশে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে ইহার নাম **ডিহং**। সেখান হইতে আসাম রাজ্যের মধ্য দিয়া ইহা পশ্চিমদিকে আসিয়াছে। **ভারতে** (আসামে) ইহার নাম **ব্রহ্মপুত্র**। এই অঞ্চলে বর্ষাকালে খুব বেশী বৃষ্টি হয়। তাই এই নদীতে তখন প্রায়ই বন্যা হয়। তারপর মেঘালয়ের পশ্চিম সীমা হইতে ইহা বাংলাদেশের উপর দিয়া দক্ষিণদিকে আসিয়াছে। এখান হইতে ইহার নাম **যমুনা**। ইহা গোয়ালনন্দের নিকট **পদ্মার** (গঙ্গা) **সহিত** মিশিয়াছে। এই মিলিত নদীর নাম পদ্মা। ইহা চাঁদপুরের নিকট **মেঘনার** সহিত মিশিয়াছে। **সুবনসিরি, তিস্তা, তোর্সা, লোহিত** প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উপনদী। **ডিব্রুগড়, তেজপুর, গুয়াহাটি** প্রভৃতি **নগর** ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। এই নদীর **মাজুলি পৃথিবীর বৃহত্তম নদী-দ্বীপ**।

(৩) **সিন্ধু** (দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮৮০ কিঃমিঃ)—তিব্বত মালভূমির দক্ষিণে মানস সরোবর-রাক্ষসতাল হ্রদ অঞ্চল অবস্থিত। ইহার নিকটবর্তী হিমবাহ **সিন্ধুর উৎস**। সেখান হইতে নদীটি তিব্বতের দক্ষিণ অংশ দিয়া পশ্চিমে আসিয়াছে। ইহা পরে জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তর অংশ দিয়া উত্তর-পশ্চিমে

গিয়াছে। কাশ্মীরের পশ্চিম সীমার নিকট নাঙ্গা পর্বতের পাশে গভীর খাতের মধ্য দিয়া ইহা দক্ষিণে আসিয়াছে। পরে পশ্চিমে বাঁকিয়া গিয়াছে। তারপর **পাকিস্তানের** উপর দিয়া ইহা দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে গিয়া **আরব সাগরে** পড়িয়াছে। এই নদীর প্রবাহের অঞ্চলে খুব কম বৃষ্টি হয়। সেজন্য ইহার মধ্য দিয়া খুব কমই বৃষ্টির জল প্রবাহিত হয়। পার্বত্য অঞ্চলের বরফগলা জল অবশ্য যথেষ্টই পাওয়া যায়। হিমালয় হইতে উৎপন্ন **বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাসা ও শতদ্রু** সিন্ধুর বামতটের **উপনদী**। এই পাঁচটি নদীর জন্যই **পঞ্জাবের** ঐরূপ (পঞ্চ+অপ) **নাম**। ইহাদের সাহায্যে প্রচুর সেচকার্য হয়। শতদ্রুর **ভাকরা-নাঙ্গল** সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রসিদ্ধ। ভাকরা পৃথিবীর উচ্চতম নদীবাঁধ। **শ্রীনগর** বিতস্তার তীরে অবস্থিত। আর **জম্মু** চন্দ্রভাগার একটি উপনদীর (তাবি) তীরে অবস্থিত।

(খ) দক্ষিণ ভারতের নদী (বঙ্গোপসাগরে পতিত নদী)

(৪) **মহানদী** (দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ কিঃমিঃ)—ইহা **মহাকাল** বা **মাকালা** পর্বতের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তারপর দক্ষিণপূর্ব-দিকে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার প্রধান উপনদী ব্রাহ্মণী। **সম্বলপুর ও কটক** মহানদীর তীরে। এই নদীর **হীরাকুঁদ বাঁধ** পৃথিবীর **দীর্ঘতম নদীবাঁধ**।

(৫) **গোদাবরী** (দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪৪০ কিঃমিঃ)—ইহা পশ্চিমঘাটে **নাসিকের নিকট** হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তারপর দক্ষিণ-পূর্বদিকে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **প্রাণহিতা, ইন্দ্রাবতী** প্রভৃতি ইহার উপনদী। দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ অংশের জল ইহার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হয়। নানা কারণে গোদাবরী **দক্ষিণ ভারতের সর্বপ্রধান** নদী। সেজন্য ইহাকে বলা হয় **দাক্ষিণাত্যের গঙ্গা**। ইহার বদ্বীপ প্রশস্ত।

(৬) **কৃষ্ণা** (দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫০ কিঃমিঃ)—ইহা পশ্চিমঘাটে **মহাবালেশ্বরের** নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তারপর দক্ষিণ-পূর্বদিকে গিয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **তুঙ্গভদ্রা, মুসী, ভীমা** প্রভৃতি ইহার উপনদী। কৃষ্ণা নদীর তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প, নাগার্জুন সাগর প্রকল্প, শ্রীশৈলম্ প্রকল্প, সঙ্গমেশ্বরম্ প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্প অনুসারে প্রচুর সেচকার্য হয়। **হায়দরাবাদ** মুসীর তীরে।

(৭) **কাবেরী** (দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ কিঃমিঃ)—পশ্চিমঘাটের **ব্রহ্মগিরি** এই নদীর উৎস। তথা হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে আসিয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **ভবানী, অমরাবতী, শিমসা, হিমাবতী** প্রভৃতি ইহার উপনদী। কাবেরীর মেটুর বাঁধ, শিবসমুদ্রম্ প্রপাত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। **তিরুচিরাপল্লী ও থাঞ্জাভুর** কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। কেহ কেহ কাবেরীকেও দক্ষিণের গঙ্গা বলেন।

(আরব সাগরে পতিত নদী)

(৮) **নর্মদা** বা **রেবা** (দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮০০ কিঃমিঃ)—মহাকাল পর্বতের **অমরকণ্টক শৃঙ্গ** ইহার উৎপত্তিস্থল বা উৎস। তারপর বিন্ধ্য ও সাতপুরা **পর্বতের** মাঝখানে **সঙ্কীর্ণ গ্রস্ত উপত্যকার** মধ্য দিয়া **পশ্চিমদিকে** গিয়া ইহা আরব সাগরে পড়িয়াছে। **জব্বলপুর** এই নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার নিকট মার্বেল পাথর অঞ্চলে এই নদীর **ধুয়ানধারা জলপ্রপাত** অবস্থিত। ইহা সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত।

(৯) **তাপ্তী** বা **তাপী** (দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৬০ কিঃমিঃ)—**মহাদেব পর্বত** এই নদীর উৎস। তথা হইতে মহাদেব ও সাতপুরা পর্বতের দক্ষিণদিকের ও অজন্তা পর্বতের উত্তরদিকের **সংকীর্ণ গ্রস্ত** উপত্যকার মধ্য দিয়া **পশ্চিমদিকে** গিয়া ইহা আরব সাগরে পড়িয়াছে। এই নদী ও নর্মদার মোহনাতে **বদ্বীপ নাই**।

(১০) **সরাবতী**—ইহা পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া আরব সাগরে পড়িয়াছে। এই নদীর **গারসোপা** এদেশের **উচ্চতম জলপ্রপাত**।

অনুশীলনী

১। ভারতের সর্বপ্রধান নদী কোন্‌টি? ইহা কেন সর্বপ্রধান? ইহার উৎস কোথায়? ইহার সর্বপ্রধান উপনদী কি? ইহার সর্বপ্রধান শাখানদী কি? ভারতে ইহার সর্বপ্রধান শাখানদী কি? গঙ্গার বদ্বীপ কতদূর বিস্তৃত? ২। ব্রহ্মপুত্রের উৎস কোথায়? ইহা কোথায় ভারতে প্রবেশ করিয়াছে? এই নদীর কোন্‌ অংশের নাম ব্রহ্মপুত্র? ইহার অন্য কোন্‌ অংশের কি নাম? ৩। সিন্ধুর উৎস কোথায়? ইহার ভারতের অন্তর্গত পাঁচটি উপনদীর নাম লিখ। ইহার কোন্‌ সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প অধিক প্রসিদ্ধ? ৪। দাক্ষিণাত্যের সর্বপ্রধান নদী কোন্‌টি? ইহাকে উত্তর ভারতের কোন্‌ নদীর সহিত তুলনা করা হয়? ৫। দাক্ষিণাত্যের নদীগুলি প্রধানতঃ পূর্ববাহিনী কেন? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬ Ext.)। ৬। দাক্ষিণাত্যের দুইটি পশ্চিমবাহিনী নদীর নাম লিখ। ৭। ভারতের সর্বোচ্চ জলপ্রপাত কোথায়? ৮। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির তুলনা কর। (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬ Ext.)

এদেশের নানা স্থানে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে **জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন অবস্থা**-র বিস্তর হেরফের বা পার্থক্য হয়। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা, বায়ুর চাপ ও প্রবাহ, মেঘ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি বিষয়ে (Elements of climate) বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবার এসকল বিষয়ে পার্থক্য **বিশেষভাবে** নির্ভর করে জলবায়ু সংক্রান্ত নিম্নলিখিত **বিষয়গুলির** (Factors of climate) উপর। যেমন, বিভিন্ন স্থানের অবস্থিতি (প্রধানতঃ অক্ষাংশ), **আকৃতি**, আয়তন, ভূগঠন ও মৃত্তিকা, ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা, পর্বতের অবস্থান (**বিস্তৃতি** ও উচ্চতা) এবং সমুদ্র হইতে দূরত্ব প্রভৃতি বিষয়ের উপর। ইহাদের **সম্পর্কে** নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

(ক) জলবায়ুর অবস্থা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ (Factors)

(১) **অবস্থিতি (প্রধানতঃ অক্ষাংশ)**—আমাদের ভারত দক্ষিণে প্রায় ৮° উঃ অঃ হইতে উত্তরে প্রায় ৩৭° উঃ অঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। এজন্য দেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়া কাল্পনিক **কর্কটক্রান্তি রেখা** পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ফলে, **জুন মাসের মধ্য** (জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ) **ভাগ** এদেশে **গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগ**। **দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে** তখন উষ্ণতা থাকে অত্যন্ত **বেশী**। রাজস্থানের কোথাও কোথাও তখনকার উষ্ণতা প্রায় ৫০° সেঃ।

(২) **আকৃতি ও আয়তন**—এদেশের দক্ষিণ অংশের **আকৃতি** ত্রিভুজের মত। ফলে, এপ্রিলের শেষভাগে মধ্যাহ্নে দেশের দক্ষিণ অংশে যে জায়গাতে **সূর্যরশ্মি লম্বভাবে** পতিত হয়, তাহার আয়তন কম। কিন্তু **জুন মাসে** মধ্যাহ্নে দেশের মধ্যভাগে যে **জায়গাতে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে** পতিত হয়, তাহা দেশের দক্ষিণ অংশের তুলনায় অনেক বিস্তীর্ণ।

(৩) **ভূগঠন, শিলা ও মৃত্তিকা**—এদেশের দক্ষিণ অংশে উপকূল অঞ্চলে আছে বালুকা, কর্দম, পলি প্রভৃতি কোমল মৃত্তিকা। আর দেশের মধ্যভাগে অর্থাৎ **রাজস্থানে** আছে **কাঁকর, প্রস্তর ও বালুকাময় অঞ্চল**। মধ্যভাগের এসকল শিলা ও মৃত্তিকা অঞ্চলে সৌরতাপের প্রভাবে **গ্রীষ্মকালের উষ্ণতা অধিক**, আর **শীতকালের উষ্ণতা কম**। বস্তুতঃ অবস্থিতি, ভূগঠন, শিলা প্রভৃতির সমষ্টিগত প্রভাবে দেশের বিভিন্ন অংশে গ্রীষ্ম ও শীতকালের উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য বেশী।

(৪) **ভূপ্রকৃতি বা পাহাড় পর্বতের উচ্চতা ও বিস্তৃতি**—সর্বত্রই পর্বতে উচ্চ ভূপ্রকৃতির জন্য উষ্ণতা কম। কাজেই ভারতের উত্তরদিকের বিস্তীর্ণ ও অতি

উচ্চ **হিমালয় অঞ্চলে** স্বভাবতঃই উষ্ণতা খুব কম। তারপর **পশ্চিমঘাট পর্বত** উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বলিয়া তাহার **পশ্চিম ঢালে** গ্রীষ্মকালে আদ্র' মৌসুমী বায়ু প্রবল বাধা পায়। **হিমালয় পর্বত** পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বলিয়া তাহার **দক্ষিণ ঢালেও** গ্রীষ্মকালে আদ্র' মৌসুমী বায়ু প্রবল বাধা পায়। তাহার প্রভাবে এসকল স্থানে তখন অধিক **বৃষ্টি** হয়। অথচ ইহাদের বিপরীতদিকে বৃষ্টি অতি তুচ্ছ।

(৫) **সমুদ্র হইতে দূরত্ব**—উপকূলের তুলনায় দেশের মধ্য ভাগে বৃষ্টি কম। তাছাড়া মধ্যভাগের এসকল স্থানে শীত-গ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য অধিক।

(খ) ভারতে জলবায়ুর অবস্থা

জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে আমাদের দেশে প্রত্যেক বৎসর ছয়টি ঋতু পর পর ঘুরিয়া আসে। ইহাদের মধ্যে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত—এই তিনটি ঋতু দীর্ঘ ; ইহাদের গুরুত্বও অধিক।

(i) **গ্রীষ্মকাল—এপ্রিল** (চৈত্র-বৈশাখ) মাস হইতে ভারতে **গ্রীষ্মকাল আরম্ভ** হয়। ক্রমশঃ দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ও উষ্ণতা বাড়িতে থাকে। ফলে, **জুন** (জ্যৈষ্ঠ) মাসের **উষ্ণতা বৎসরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী**। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখনকার উষ্ণতা ৩২-৩৫° সেঃ। রাজস্থানের কোথাও কোথাও সেই সময়ের উষ্ণতা প্রায় ৫০° সেঃ। অথচ দেশের **দক্ষিণ উপকূলে** তখনও উষ্ণতা থাকে অনেক কম অর্থাৎ ২৭-২৮° সেঃ। আর উচ্চ ভূপ্রকৃতির জন্য **হিমালয়ের** তখনকার অবস্থা **আরামদায়ক**। পার্বত্য অঞ্চলের **অধিক উচ্চ অংশে** উষ্ণতা **সবচেয়ে কম**। যেমন, দার্জিলিং, সিমলা, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে উষ্ণতা তখন ১৫-১৬° সেঃ।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীষ্মকালের অধিক উষ্ণতার জন্য বায়ুর চাপ থাকে কম। ঐ নিম্নচাপ অঞ্চলের উত্তপ্ত ও হাল্কা বায়ু সহজেই উপরদিকে উঠিয়া যায়। এজন্য তখন তথায় **বায়ুমণ্ডলে আংশিক শূন্যতার** সৃষ্টি হয়। ঐ আংশিক শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে বায়ু সেদিকে আসে। বিশেষতঃ দক্ষিণের সমুদ্র হইতে প্রচুর শীতল ও ভারী বায়ু ঐদিকে **প্রবাহিত হয়**। তাহাও ঐ অঞ্চলে পৌঁছিয়া উষ্ণ হয়। এজন্য **দিল্লীর আশপাশে গ্রীষ্মকালে** দুপুরের পর প্রবাহিত হয় উত্তপ্ত **'লু'** বায়ু, আর সন্ধ্যার দিকে সেখানে প্রবাহিত হয় **'আঁধি'** ঝড়। এরূপ বায়ু অস্বস্তিকর ও অস্বাস্থ্যকর। দক্ষিণের সাগরাদি হইতে তখন জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর প্রভাবে তখন এদেশের বহু স্থানে **ঘূর্ণবাত ও ঝড়বৃষ্টি** হয়। পশ্চিমবঙ্গের **কালবৈশাখীর** তাণ্ডব উল্লেখযোগ্য।

(ii) **বর্ষাকাল**—গ্রীষ্মকালের শেষভাগ হইতে এদেশের বায়ুপ্রবাহ সম্বন্ধে বিশেষত্ব দেখা যায়। তখন দক্ষিণের সাগরাদি হইতে **আদ্র' বায়ু নিয়মিতভাবে ও প্রবলবেগে** এদেশের উত্তপ্ত মধ্যভাগের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে আসিতে থাকে।

ইহাই **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু**। ইহা অধিক **জলীয় বাষ্পপূর্ণ**। এই **বায়ুর প্রভাবে জুন** হইতে **সেপ্টেম্বর** মাস (আষাঢ় হইতে আশ্বিন) পর্যন্ত **এদেশের অধিকাংশ** (৭৫-৯০%) **বৃষ্টি** হয়। এ সময়ই এদেশে **বর্ষাকাল**। ঐ আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী **বায়ুর আরব সাগরীয় শাখা** দ্বারা অধিক (২০০-৩০০ সেঃমিঃ) **বৃষ্টি** হয় **পশ্চিমঘাটের পশ্চিম** ঢালে। আর ঐ বায়ুর **বঙ্গোপসাগরীয় শাখা** দ্বারা **বৃষ্টি** হয় **দেশের অধিকাংশ স্থানে**। এই বৃষ্টির ফলে এক দিকে যাবতীয় গাছপালা, এমন কি তৃণগুল্মের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়। অন্য দিকে এই সময়েই নানারকম ফসলের চাষ হয় সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ এই আর্দ্র মৌসুমী
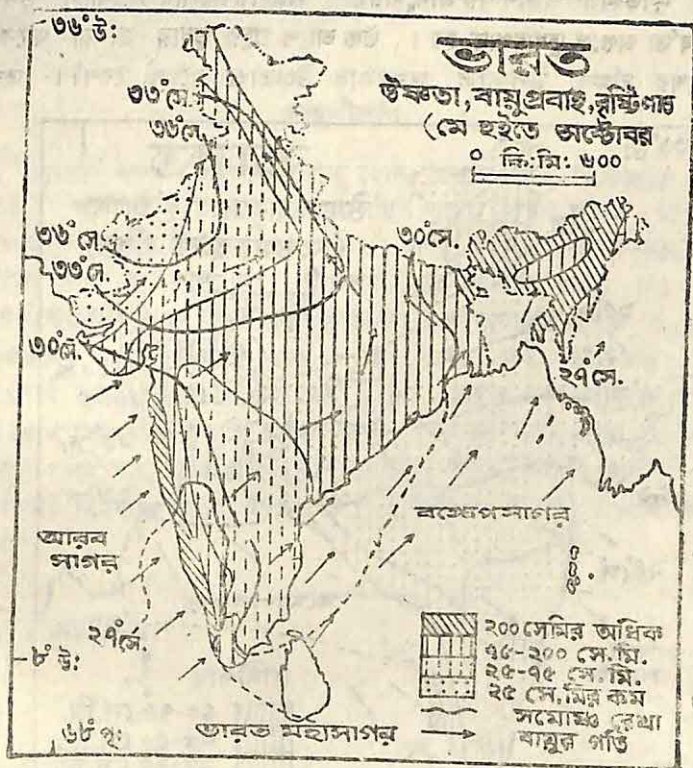
বায়ুই দেশকে শস্যশ্যামল করে। গঙ্গার **বদ্বীপ অঞ্চলে** তখনকার বৃষ্টির পরিমাণ **দেশের পশ্চিম উপকূলের মত** (২০০-৩০০ সেঃমিঃ)। তথা হইতে ক্রমশঃ উত্তরে বৃষ্টি কম। আবার বৃষ্টি বাড়ে **হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে** (৩০০-৪০০ সেঃমিঃ)। তবে **পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী** (১২০০-১৫০০ সেঃমিঃ) বৃষ্টি হয় মেঘালয় মালভূমির **চেরাপুঞ্জি** (উচ্চতা ১৩৫৮ মিঃ) ও **মৌসিনরাম বা মৌসমাইতে**। তথা

হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমে বৃষ্টি কম। যেমন, এলাহাবাদের আশপাশে বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ ১০০ সেঃমিঃ। দিল্লীর আশপাশে বৃষ্টির পরিমাণ ৫০ সেঃমিঃ। আরও পশ্চিমে পঞ্জাবে মাত্র ২০ সেঃমিঃ বৃষ্টি হয়। এজন্য পঞ্জাব, হরিয়ানা অঞ্চলে তখনও চাষ-আবাদের জন্য সেচের প্রয়োজন।

(iii) **শরৎ ও হেমন্তকাল**—বর্ষাকালের পর **অক্টোবর-নবেম্বর** (আশ্বিন-কার্তিক) মাসে ভারতে **বৃষ্টি কমে, উষ্ণতাও কমে।** তখনকার অবস্থা **আরামদায়ক।** এসময় এদেশের উপর দিয়া বায়ু সাধারণতঃ উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়। কেহ কেহ এই অবস্থাকে বলেন, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তন।

(iv) **শীতকাল—ডিসেম্বর-জানুয়ারী** (অগ্রহায়ণ-পৌষ) মাসে উত্তর-দিকের **পার্বত্য অঞ্চলে তুষারপাত** হয়। **উচ্চ অংশে** প্রচুর তুষার জমিয়া থাকে। অথচ দেশের দক্ষিণ উপকূলে তখনকার উষ্ণতাও যথেষ্ট বেশী। তখন
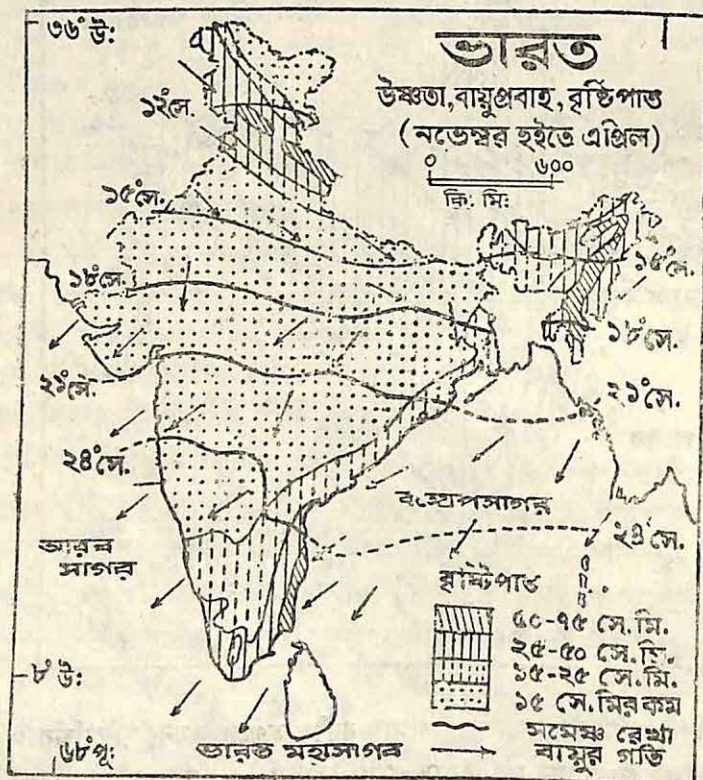
শুষ্ক উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু এদেশের উপর দিয়া দক্ষিণদিকে আসে। এজন্য তখন এদেশে **বৃষ্টিপাত অতি সামান্য।** কাজেই তখন দেশের বিস্তীর্ণ অংশে প্রয়োজন মত **সেচের ব্যবস্থা** করিয়া গম, কার্পাস, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি **রবিশস্যের**

চাষ করা হয়। তবে ঐ বায়ু যখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয় তখন তাহা জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে। এজন্য এই বায়ুদ্বারা তামিলনাড়ুর **করমণ্ডল উপকূলে** প্রচুর বৃষ্টি হয়। ফলে, দক্ষিণ ভারতে বৎসরে **দুই বার অধিক বৃষ্টি হয়**। এক বার এসময়ে ও এক বার **জুলাই-আগস্ট** মাসে। তাহাছাড়া এখানে বৃষ্টি হয় বৎসরে প্রায় ৭-৮ মাস ; মাঝে মাঝে ফাঁক যায়।

(v) **বসন্তকাল**—শীতকালের শেষে **জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী** (মাঘ-ফাল্গুন) মাসে এদেশের অবস্থা **আরামদায়ক**। তখন শীত নাই, উষ্ণতাও বেশী নয়। বৃষ্টিও হয় না। ইহাই বসন্ত ঋতুর বৈশিষ্ট্য। তবে এই ঋতু খুব অল্প দিনস্থায়ী।

অনুশীলনী

১। ভারতের জলবায়ু এদেশের কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে? ২। অক্ষাংশের ও ভূমির উচ্চতার সহিত বায়ুর উষ্ণতার সম্পর্ক আলোচনা কর। এদেশের ২।১টি উদাহরণ দাও। ৩। পর্বতের অবস্থান ও বিস্তৃতির সহিত বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক আলোচনা কর। এদেশের ২।১টি উদাহরণ দাও। ৪। সমুদ্র হইতে কোন স্থানের দূরত্বের সহিত তথাকার উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক আলোচনা কর। এদেশের ২।১টি উদাহরণ দাও। ৫। ভারতে কখন গ্রীষ্মকাল? তখন এদেশের কোন্ অংশের উষ্ণতা সবচেয়ে বেশী? ৮। এদেশে কখন বর্ষাকাল? তখন এদেশের কোন্ কোন্ অংশে বৃষ্টি অত্যন্ত বেশী? এসকল স্থানে এরূপ বৃষ্টিপাতের কারণ কি? কোন্ বায়ুপ্রবাহ দ্বারা এদেশে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়? এদেশের কোন্ অংশে বৎসরে দুইবার অধিক বৃষ্টি হয়? রাজস্থানে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত কম কেন?

ভারতের বিভিন্ন অংশের বন ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ফলে, বর্তমানে এদেশের **মোট আয়তনের মাত্র প্রায় ২২·৭% বনভূমি**। এই বন উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে এবং দক্ষিণে পাহাড়, পর্বত, মালভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এদেশের **উত্তর-পূর্ব অংশের** অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্যের মোট আয়তনের ৫০-৮০% বনভূমি। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এদেশের বন হইতে যে পরিমাণ জ্বালানি কাঠ, **শক্ত** ও মূল্যবান কাঠ, মোম, মধু প্রভৃতি **বনজ সম্পদ** পাওয়া গিয়াছিল তাহার মূল্য ছিল ৩৫০ কোটি টাকার বেশী। এখন (১৯৮৪-৮৫) ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণ কম, তবে মূল্য বেশী। বনভূমি কেবলমাত্র এসকল সম্পদের জন্যই মূল্যবান নয়। বনের গাছপালা বায়ুর দূষণ হইতে মানবসমাজকে রক্ষা করে, বায়ুর মধ্যাস্থিত দূষিত গ্যাসীয় পদার্থ শোষণ করে এবং জীবজন্তুর পক্ষে হিতকর গ্যাসীয় পদার্থ সরবরাহ করে।

অরণ্য অঞ্চল—এদেশের বিভিন্ন অংশে মোট প্রায় ৪৫,০০০ ধরনের গাছপালা আছে। তাহাদের মধ্যে ৯০%-এর বেশী **প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী** গাছ। বাকী ১০%-এর কম **সরলবর্গীয়** গাছ। এরূপ নানাজাতীয় গাছ নিম্নলিখিত অঞ্চলে অধিক দেখা যায়। এরূপ পার্থক্য অনুসারে এদেশকে কয়েকটি **উদ্ভিদ অঞ্চলে** বিভক্ত করা যায়। এরূপ প্রত্যেক অঞ্চলের **জলবায়ুর সহিত উদ্ভিদের সম্পর্ক** খুব ঘনিষ্ঠ। ভারত সরকারের অরণ্য গবেষণাগার দেরাদুনে অবস্থিত।

(১) **ক্রান্তীয় প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চল**—হিমালয় পর্বতের পূর্বদিকের অংশের পাদদেশে, পশ্চিমঘাটের পশ্চিম ঢালে এবং বিভিন্ন দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জে **উষ্ণতা ও বৃষ্টি** দুইই অধিক। অর্থাৎ এই অঞ্চলের অন্তর্গত স্থানসমূহের **জলবায়ু উষ্ণ আর্দ্র** প্রকৃতির। এজন্য এসকল স্থানে **চিরহরিৎ** (ever green) **বৃক্ষের** ঘন বন বহু দূর বিস্তৃত। পাহাড়ের গায়ে পাদদেশ হইতে ক্রমশঃ উপরদিকে উষ্ণতার পরিবর্তন সুস্পষ্ট। সেজন্য পার্বত্য অঞ্চলের গায়ে আছে বিভিন্ন ধরনের গাছের বন। ইহাকে বলা যায় **বহুতল অরণ্য**। এখানকার গাছের মধ্যে **আবলুস, মেহগিনি,** গর্জন, শিশু, চাপলাস প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের কাঠ শক্ত ও মূল্যবান।

(২) **প্রশস্ত পত্রযুক্ত মিশ্র বৃক্ষের অরণ্য বা মৌসুমী অরণ্য অঞ্চল**—এদেশের সবচেয়ে বেশী দূর বিস্তীর্ণ অংশের জলবায়ু **মৌসুমী** প্রকৃতির। এসকল স্থানে

গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা অধিক এবং তখন কিছু বৃষ্টি হয়। তাহার পরে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। কিন্তু এখানে বৎসরে একটিমাত্র বর্ষা কাল। এখানে শীতকালে বৃষ্টি প্রায় হয় না। এজন্য এদেশের **অধিকাংশ** গাছ **পর্ণমোচী** (deciduous) জাতীয়। ইহাদের পাতা শীতকালে ঝরিয়া পড়ে। এখানকার **কতক গাছ** প্রায় সারা বৎসর কিছু কিছু জল পায়। সেজন্য এগুলি **চিরহরিৎ** (ever green) গাছ। ইহাদের পাতা এক সঙ্গে ঝরিয়া পড়ে না। এসকল

কারণে এদেশের অনেক জায়গাতেই দেখা যায় এরূপ মিশ্র বৃক্ষের বন। তাহা **মৌসুমী অরণ্য** নামে পরিচিত। হিমালয় পর্বত অঞ্চলের নিম্ন অংশে ওক, ম্যাপল, লরেল প্রভৃতি গাছ বেশী। আর দাক্ষিণাত্য ও ছোটনাগপুর মালভূমি প্রভৃতি স্থানে শাল, সেগুন, হলদু, গামর, শিরীষ, কুল, পলাশ প্রভৃতি গাছ অধিক। **শাল, সেগুন, ওক** প্রভৃতি গাছের কাঠ অধিক মূল্যবান্।

(৩) **উপকূলের অরণ্য অঞ্চল**—এদেশের উপকূলে আছে লোনা ও কাদা

মাটি। এরূপ মৃত্তিকাতে জন্মে সোঁদরী বা সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া, কেয়া বা কেওড়া প্রভৃতি গাছ। এখানকার অনেক গাছের কাঠ বেশ শক্ত।

(৪) **সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চল**—হিমালয়ের উচ্চ অংশে (৩৫০০ মিঃর উপরে) উষ্ণতা ক্রমশঃ কম এবং প্রচুর তুষারপাত হয়। সেজন্য এখানে আছে **প্যাইন, ফার, দেবদারু** প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছের **বন** (coniferous forest)। এখানকার গাছের ডালপালা কম ও পাতা খুব সরু। এসকল গাছের **আকৃতি মোচার মত**। ইহাদের কাঠ দ্বারা নানারকম আসবাবপত্র তৈরী হয়। আর কাঠের কোমল অংশের মণ্ডদ্বারা কাগজ, বোর্ড, প্লাইউড ও অন্যান্য বহু জিনিস তৈরী হয়।

(৫) **তৃণ ও গুল্ম অঞ্চল**—এদেশের উত্তরে পঞ্জাব হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত এবং পশ্চিমে গুজরাট হইতে দেশের মধ্য ভাগে মধ্য প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অংশে উষ্ণতা প্রচুর, অথচ বৃষ্টিপাত সামান্য। তাই এখানে আছে বিস্তীর্ণ তৃণ ও গুল্ম অঞ্চল। তন্মধ্যে রাজস্থানের যে অংশ তৃণভূমি, তথাকার তৃণ নিকৃষ্ট ও গুল্ম অধিক কাঁটাযুক্ত। ঐ তৃণভূমিকে বলে **বাগার**।

(৬) **মরুপ্রায় অঞ্চল**—রাজস্থানের বিস্তীর্ণ অংশ বৃষ্টিহীন উত্তপ্ত মরুভূমি ও মরুপ্রায়। এই অঞ্চলে সামান্য কাঁটা গাছ, শক্ত ঘাস, গুল্ম প্রভৃতি মাত্র দেখা যায়।

অনুশীলনী

১। ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জকে জলবায়ু কিভাবে প্রভাবিত করে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। ভারতে বনভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজন কেন? ২। ভারত সরকারের অরণ্য গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬)। ভারতের কোন্ কোন্ অংশে এখন বন অধিক বিস্তৃত? এদেশের বনে কোন্ জাতীয় গাছের সংখ্যা বেশী? এরূপ কয়েক প্রকার গাছের নাম লিখ। ৩। এদেশের কোন্ অংশে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ গাছের বন দেখা যায়? এই জাতীয় কয়েক প্রকার গাছের নাম লিখ। ৪। ভারতের বনকে প্রধানতঃ মৌসুমী অরণ্য বলে কেন? এই জাতীয় কয়েক প্রকার গাছের নাম লিখ। ৫। এদেশে সরলবর্গীয় গাছের বন কোথায় দেখা যায়? এই জাতীয় কয়েকটি গাছের নাম লিখ। ৬। এদেশের উপকূলে কোন্ জাতীয় গাছ দেখা যায়?

ত্রয়োদশ অধ্যায় | ভূমির ব্যবহার—সেচ ব্যবস্থা ও কৃষিজ সম্পদ

কৃষি কার্যের গুরুত্ব—পৃথিবীর কয়েকটি মাত্র দেশে **প্রাচীনতম কালে** কৃষিকার্য হইত। ইহাদের কোন কোন অংশে কৃষির উন্নতির জন্য সেচ ব্যবস্থাও ছিল। আমাদের **ভারত** তাহাদের অন্যতম। বহু কাল যাবৎ এদেশে কৃষি কার্য দ্বারা ধান, গম প্রভৃতি খাদ্য শস্য এবং ডাল, নানারকম ফল, সবজি প্রভৃতি অন্য নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। তাহাছাড়া কৃষি কার্য দ্বারা কার্পাস, পাট, আখ, চা, কফি প্রভৃতি এদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এগুলি নানারকম শিল্পের উপাদান। ফলে, আজও এদেশের ৭০% **লোক কৃষি কার্য** করে। কিন্তু নানা কারণে এদেশের কৃষি ব্যবস্থা উন্নত নহে। মাত্র কিছু কাল যাবৎ এদেশের কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা হইতেছে। ইহা **কৃষি বিপ্লব** বা **সবুজ বিপ্লব, গম বিপ্লব** প্রভৃতি নামে পরিচিত।

সেচ ব্যবস্থা

সেচের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি—ভারতে বর্তমানে চাষের জমির পরিমাণ ১৭ কোটি হেক্টরের (এক হেক্টর = $২\frac{১}{২}$ একর) অধিক। অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে চাষের জমির মোট পরিমাণ হিসাবে ভারতের স্থান **তৃতীয়**। কিন্তু এদেশের বর্ষাকালের **মৌসুমী বৃষ্টি অনিশ্চিত ও অনিয়মিত**। তাহা প্রতি বৎসর সকল স্থানে কৃষির সাফল্যের পক্ষে উপযুক্ত নহে। এরূপ অবস্থাতে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সেচ ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। তাই **প্রাচীন কাল** হইতেই এদেশে কিছু কিছু জমিতে **সেচ কার্য** হইতেছে। তবে বহু কাল এবিষয়ে তেমন উন্নতি হয় নাই। সম্প্রতি এবিষয়ে উন্নতি হইতেছে। তবু এখনও দেশের মাত্র ৩০% চাষের জমিতে সেচ কার্য হয়। এখন নিম্নলিখিত **পদ্ধতিতে** এদেশে সেচ কার্য হইতেছে :—

(i) **জলাশয়ের সাহায্যে সেচ**—এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে জলাশয়ের সাহায্যে সেচ কার্য চলিতেছে। বর্তমানে এদেশে যত জমিতে সেচ কার্য হয় তাহার প্রায় ১০% জমিতে সেচ হয় বিভিন্ন জলাশয়ের (tanks) সাহায্যে। কতক জলাশয় হইতে জমিতে জল সরবরাহের জন্য পাম্পের সাহায্যও গ্রহণ করা হয়। **দাক্ষিণাত্যে** অনেক বড় স্বাভাবিক জলাশয় আছে। ইহাদের তলদেশের মৃত্তিকা এঁটেল জাতীয়। তাহার মধ্য দিয়া জল সহজে চুয়াইয়া যায় না। তাই এসকল জলাশয়ে প্রচুর জল সঞ্চিত থাকে। তাহার সাহায্যে আশপাশে **সেচের**

সুযোগ অধিক। এ সম্পর্কে অন্ধ্র প্রদেশের নাগার্জুন সাগর, কর্ণাটকের কৃষ্ণরাজা সাগর প্রভৃতি বৃহৎ জলাধার সুপরিচিত।

(ii) **কূপের সাহায্যে সেচ**—ইঁদারা, কাঁচা কুয়ো, বাঁধান কুয়ো, নলকূপ প্রভৃতির সাহায্যে এদেশের বহু সেচজমিতে সেচ কার্য হয়। এজন্য কপিকল ও বালতি, পার্সিয়ান হুইল বা চাকা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কখন কখন গরু, উট প্রভৃতির সাহায্যে **অগভীর** কূপ হইতে জল তোলা হয়। আর অধিক **গভীর কূপ ও নলকূপ** হইতে জল তুলিবার জন্য **বৈদ্যুতিক পাম্প** ব্যবহৃত হয়। **উত্তর প্রদেশে** এরূপ ব্যবস্থা অধিক প্রচলিত।
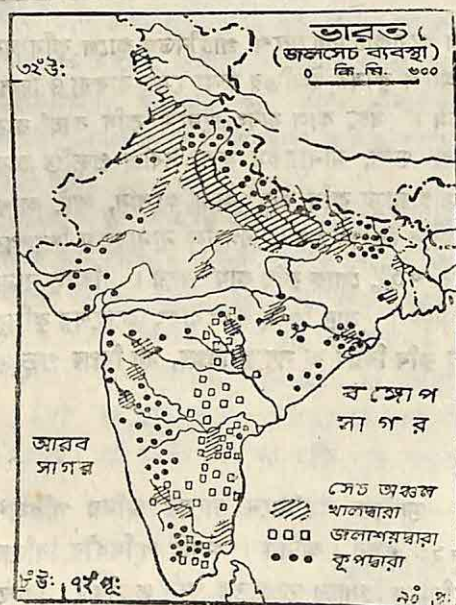
(iii) **নদীর সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে সেচ**—এদেশে দাক্ষিণাত্যে **কাবেরী নদীর বদ্বীপ খালের** সাহায্যে সেচ কার্য আরম্ভ হয় ১০০ খ্রীষ্টাব্দের (100 A.D.) পর হইতে। তাহাই **ভারতের প্রাচীনতম** সেচ খাল। ক্রমশঃ অন্য বহু নদীর সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা হয়। সিন্ধু ও গঙ্গা নদী এবং ইহাদের উপনদীগুলির সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু দিন যাবৎ সেচ কার্য চলিতেছে। এরূপ কয়েকটি সেচ ব্যবস্থা বিখ্যাত।

(iv) **বহুমুখী নদী উপত্যকা প্রকল্পের সাহায্যে সেচ**—বর্তমানে অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর হইতে **বহুমুখী নদী উপত্যকা প্রকল্পের** (Multi-purpose River Valley Project) সাহায্যে এদেশে **সবচেয়ে বেশী** জমিতে **সেচ কার্য হয়**। এরূপ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** নিম্নরূপ—(১) নদীতে খুব উঁচু ও মজবুত বড় বড় **বাঁধ** (dam) তৈরী করিয়া পাশে বৃহৎ **জলাশয়** (reservoir) তৈরী করা হয়। তাহার মধ্যে জল সঞ্চয় করা হইতেছে। ফলে, নদীতে হঠাৎ খুব বেশী জল আসিয়া পড়িলেও আশপাশে বন্যা হইতে পারে না। তাই এই ব্যবস্থা দ্বারা **বন্যা নিয়ন্ত্রণ** হয়। (২) জলাশয়ে সঞ্চিত ঐ জল পরে নির্দিষ্ট পথে প্রবল বেগে নিম্ন দিকে প্রবাহিত করান হয়। তখন ঐ জলের প্রবল স্রোতের

সাহায্যে **জলজ বিদ্যুৎশক্তি** উৎপন্ন করা হয়। (৩) তারপর ঐ জলকে নির্দিষ্ট খালের মধ্য দিয়া নিয়া বিভিন্ন জমিতে **সেচের ব্যবস্থা** করা হয়। (৪) জল সঞ্চয় করার জন্য তৈরী বিভিন্ন জলাশয়ে ও সেচের জন্য তৈরী খালগুলিতে **মাছের চাষ** হয়। (৫) বড় খালগুলির মধ্য দিয়া নৌপথে **যাতায়াত ও পরিবহনের** ব্যবস্থা হয়।

এদেশে প্রায় ২০০ বৃহৎ প্রকল্প, প্রায় ১০০০ মধ্যম প্রকল্প ও বহু ক্ষুদ্র প্রকল্প অনুসারে সেচ কার্যের ব্যবস্থা হইতেছে। তাহাদের মধ্যে বৃহৎ ও মধ্যম প্রকল্প মিলিয়া মোট ৬০০-এর অধিক প্রকল্প অনুসারে নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, সেচেরও ব্যবস্থা হইতেছে। বাকী অনেক প্রকল্প অনুসারে নির্মাণ কার্য চলিতেছে। এখন এসকল **প্রকল্পের** সাহায্যে এ দেশের ৪০% সেচজমিতে সেচ কার্য হইতেছে। শতদ্রু নদীর ভাকরা-নাঙ্গল প্রকল্পের **ভাকরা বাঁধ পৃথিবীর সর্বোচ্চ নদীবাঁধ**। ঐ প্রকল্পের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত **রাজস্থান ক্যানেল পৃথিবীর দীর্ঘতম সেচখাল**। আর মহানদীর **হীরাকুঁদ বাঁধ** (dam) পৃথিবীর **দীর্ঘতম নদীবাঁধ**। আমাদের এই রাজ্যে দামোদর উপত্যকা প্রকল্প (D.V.C.), ময়ূরাক্ষী প্রকল্প, কংসাবতী প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্প অনুসারে সেচকার্য হয়।

ভূমির ব্যবহার ও প্রধান কৃষিজ সম্পদ্

এদেশে নানাপ্রকার কৃষিজ সম্পদ জন্মে। এগুলি কোন কাজে অধিক ব্যবহৃত হয় সেই ব্যবহার অনুসারে **দুই ভাগে** বিভক্ত :— (ক) খাদ্য দ্রব্য ও খাদ্যের উপাদান এবং (খ) শিল্পের উপাদান। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান ফসলের বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(ক) খাদ্য দ্রব্য

(১) **ধান**—ইহা ভারতের **সর্বপ্রধান কৃষিজ সম্পদ ও প্রধান খাদ্য শস্য**।

চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা—ধান চাষের জন্য দরকার **উর্বর দোআঁশ** বা **এঁটেল পলি মাটি**। তাই এদেশের ৯৯% **ধান** জন্মে বিভিন্ন **নদী-উপত্যকার নিম্নভূমিতে**। ধান চাষের জন্য **অধিক** (২৪-২৭° সেঃ) **উষ্ণতা ও প্রচুর** (১০০-২০০ সেঃমিঃ) **বৃষ্টি** দরকার। বৃষ্টি কম হইলে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। এদেশে **তিন প্রকার** ধানের চাষ হয়।

চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা—কার্পাস চাষের জন্য প্রয়োজন **উর্বর দো-আঁশ** বা লাভা হইতে উৎপন্ন **উর্বর কৃষ্ণ মৃত্তিকা**। ইহার চাষের জন্য ধান চাষের মত **প্রচুর** (২৪-২৭° সেঃ) **উষ্ণতা** প্রয়োজন। কিন্তু গম চাষের মত **মধ্যম রকম** (৫০-১০০ সেঃ মিঃ) **বৃষ্টিপাত** হইলেই ইহার চাষ সম্ভবপর। তবে ইহার জন্য **জলসেচ** বিশেষ প্রয়োজন।

চাষের অঞ্চল ও উৎপাদন—১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ এদেশে ১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় কার্পাস চাষের জমি বাড়িয়াছে প্রায় ৩০%। অথচ এখন এদেশে **কৃষি বিপ্লব** চলিতেছে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ হইতেছে। তার উপর এদেশের আগেকার ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত কার্পাসের পরিবর্তে এখন এদেশের ৯০% কার্পাসই **দীর্ঘ ও মধ্যম আঁশযুক্ত**। ফলে, এখন এদেশে কার্পাস **উৎপাদনের পরিমাণ** ১৯৫০ খ্রীঃ উৎপাদনের তুলনায় প্রায় ৩ গুণ। ১৯৫০ খ্রীঃ এদেশে উৎপন্ন হইয়াছে ৩০ লক্ষ বেল তুলা, আর এখন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) উৎপন্ন হয় প্রায় ৮৫ লক্ষ বেল বা গাঁট তুলা। এখন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) কার্পাস উৎপাদন সম্পর্কে ভারতের স্থান **পৃথিবীতে চতুর্থ** (যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ও চীনের পরে)। এদেশের মধ্যে **গুজরাটের স্থান** প্রথম, **মহারাষ্ট্রের** স্থান দ্বিতীয়। এগুলি ছাড়া পঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যেও প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হয়।

(৫) **পাট ও মেস্তা—পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমগ্র ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য** সম্পর্কে পাটের গুরুত্ব খুব বেশী। বস্তুতঃ বহু কাল পর্যন্ত ভারতের সর্বপ্রধান রপ্তানিদ্রব্য ছিল পাটের তৈরী জিনিস, অর্থাৎ চট, থলে, দড়ি প্রভৃতি।

চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা—যে সকল জমিতে **প্রতি বৎসর বন্যার সময় পলি মাটি জমে এমন জমি** পাট ও মেস্তা চাষের পক্ষে সর্বোত্তম। ইহাদের জন্য ধান চাষের প্রায় সমান (২৫-২৮° সেঃ) **উষ্ণতা** আবশ্যক। তবে ইহাদের জন্য ধান চাষের তুলনায় কিছু অধিক (২০০-২৫০ সেঃ মিঃ) **বৃষ্টি** প্রয়োজন। যখনই পাটের বাজার মন্দা হয় বা পাটের দাম কমে তখনই কিছু পাট চাষের জমিতে **পাটের পরিবর্তে আউস ধানের চাষ** হয়। এক সময়েই এই দুই ফসল জন্মে।

চাষের অঞ্চল ও উৎপাদন—গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল পাট ও মেস্তা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে ভারতের স্থান **পৃথিবীতে দ্বিতীয়**; বাংলাদেশের পরে। এখন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) এদেশে ১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় প্রায় ১½ গুণ জমিতে ইহাদের চাষ হয়। কিন্তু এখন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) এদেশে ঐ সময়ের দ্বিগুণের বেশী (প্রায় ৬৭ লক্ষ) বেল বা গাঁট পাট ও মেস্তা উৎপন্ন হয়। এদেশের পাটকলগুলির অবস্থা ভাল হইলে ও পাটের তৈরী জিনিসের দাম বাড়িলে এদেশে পাট ও মেস্তার উৎপাদন সহজেই বাড়িতে পারে। এদেশের **অর্ধেক** পাট ও মেস্তা জন্মে **পশ্চিমবঙ্গে**। বাকী অংশ জন্মে উত্তর ভারতে আসাম হইতে পশ্চিমে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত অঞ্চলে এবং দক্ষিণে উড়িষ্যা হইতে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত অঞ্চলে।

(৬) **আখ**—এদেশের ৯৫% আখ দ্বারা **গুড়, চিনি, মিছরি** প্রভৃতি তৈরী হয়। আখের **ছিবড়া ও পাতা** দ্বারা তৈরী হয় **কাগজ,** নানারকম **বোর্ড** প্রভৃতি।

চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা—আখ চাষের জন্য প্রয়োজন উর্বর **দোআঁশ মৃত্তিকা**। উত্তর প্রদেশের **ভাট মৃত্তিকা** ইহার চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। সমুদ্রের ধারে ও অন্যত্র **লোনা মাটিতে** প্রচুর আখ জন্মে। এরূপ আখের রসের মধ্যে সামান্য পরিমাণ লবণ থাকে। তাহা চিনি, গুড় প্রভৃতি তৈরীর পক্ষে খুব ভাল। আখ চাষের জন্য দরকার **মধ্যম** রকম (২১-২৭° সেঃ) **উষ্ণতা** ও **মধ্যম** রকম (১০০-২০০ সেঃমিঃ) **বৃষ্টি**। আখ চাষের জন্য **জলসেচের** ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজন। প্রতি দুই বৎসর অন্তর আগেকার আখের গোড়া তুলিয়া ফেলিয়া

নূতন **চারা** বা **পাব** লাগাইলে ফসল ভাল হয়। অর্থাৎ এই ব্যবস্থার ফলে বেশী পরিমাণ আখ পাওয়া যায়।

চাষের অঞ্চল ও উৎপাদন—এখন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) এদেশে ১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় আখ চাষের জমি হইয়াছে প্রায় দেড় গুণ। আর **সবুজ বিপ্লবের** ফলে এখন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) এদেশে আখ উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫০ খ্রীঃ আখ উৎপাদনের তুলনায় প্রায় ৩½ গুণ (প্রায় ১৭½ কোটি টন)। ১৯৮২-৮৩ খ্রীঃ এদেশে উৎপন্ন হইয়াছে প্রায় ১৯ কোটি টন আখ। ইহার পরিমাণ **পৃথিবীতে প্রথম**। এদেশের ৭০% আখ জন্মে পঞ্জাব হইতে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে। তন্মধ্যে এদেশের প্রায় **অর্ধেক** (৪২% এর বেশী) আখ জন্মে **উত্তর প্রদেশে**। **মহারাষ্ট্রে** আখ উৎপাদনের হার উত্তর প্রদেশের চেয়ে বেশী। কিন্তু এই রাজ্যে আখ চাষের উপযুক্ত জমি কম। তাই এই রাজ্যে মোট আখ উৎপাদনের পরিমাণ এদেশের মধ্যে দ্বিতীয়। এ বিষয়ে **কর্ণাটকের** স্থান তৃতীয়।

(৭) **চা**—ভারতের **বৈদেশিক বাণিজ্য** সম্পর্কে চায়ের গুরুত্ব খুব বেশী। বহু দিন পর্যন্ত এদেশের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ইহার স্থান ছিল **প্রথম** বা **দ্বিতীয়**।

চায়ের কুঁড়ি সংগ্রহ

১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ এদেশ হইতে ৭০০ কোটি টাকার বেশী মূল্যের চা রপ্তানি হইয়াছে।

আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা—**পাহাড়ের ঢালের জঙ্গল** কাটিয়া চায়ের আবাদ (tea plantation) করা হয়। লতাপাতা পচান **হিউমাস সার** চায়ের আবাদের পক্ষে খুব উপকারী। ইহার চাষের জন্য **প্রচুর** (২৪-২৭° সেঃ) **উষ্ণতা** ও **অধিক** (২০০-২৫০ সেঃমিঃ) **বৃষ্টি** প্রয়োজন। বৎসরের অধিকাংশ সময় মাঝে মাঝে কিছু বৃষ্টি হইলে চা গাছ হইতে **বেশী কুঁড়ি ও কচিপাতা সংগ্রহ** করা যায়। দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি অঞ্চলে এই সুবিধা আছে। সেজন্য

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আসামের তুলনায় **নীলগিরি অঞ্চলে** চায়ের **উৎপাদনের হার বেশী**। **মেয়েরা** চায়ের কুঁড়ি সংগ্রহের কাজে দক্ষ।

আবাদের অঞ্চল ও উৎপাদন—এদেশে ১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় এখন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) দ্বিগুণের বেশী চা উৎপন্ন হয়। ১৯৫০-৫১ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ২৮ কোটি কেজি চা তৈরী হইয়াছে। আর এখন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) এদেশে চা উৎপাদনের পরিমাণ ৬৫ কোটি কেজির বেশী। **চা উৎপাদন সম্পর্কে** ভারতের স্থান **পৃথিবীতে প্রথম**। **আসামে** জন্মে দেশের প্রায় অর্ধেক চা। এদেশের প্রায় সিকি ভাগ চা জন্মে **নীলগিরি** অঞ্চলে। এদেশের বাকী প্রায় সিকি ভাগ চা জন্মে **দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে**।

অনুশীলনী

১। এদেশে কৃষিকার্যের সফলতার জন্য সেচের বিশেষ প্রয়োজন কেন? এদেশে কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে সেচকার্য হয়? ২। বহুমুখী নদী উপত্যকা প্রকল্প বলিলে কি বুঝ? এদেশের এই জাতীয় কয়েকটি প্রধান প্রকল্পের নাম লিখ। ৩। পশ্চিমবঙ্গে কোন্ প্রকল্প সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ? তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৪। ভারতের সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য কি? ইহার চাষের জন্য কিরূপ জলবায়ু ও মৃত্তিকা প্রয়োজন? অথবা ধান উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ কি কি? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬ Ext, ১৯৮৭)। এদেশে ইহা কোন্ রাজ্যে অধিক জন্মে? ৫। এদেশের দ্বিতীয় খাদ্যশস্য কি? ইহার চাষের অনুকূল পরিবেশগুলি আলোচনা কর। ভারতের দুইটি প্রধান গম উৎপাদক রাজ্যের নাম লিখ। ভারত সরকারের গম গবেষণা কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬) ৬। কার্পাস চাষের জন্য অনুকূল জলবায়ু ও মৃত্তিকা আলোচনা কর। এদেশে কোথায় কোথায় ইহা অধিক জন্মে? এখন এদেশে কোন্ জাতীয় কার্পাস অধিক জন্মে? ৭। পাট চাষের জন্য অনুকূল পরিবেশ আলোচনা কর। ইহা এদেশের কোন্ অঞ্চলে অধিক জন্মে? ৮। আখ চাষের জন্য অনুকূল পরিবেশ আলোচনা কর। এদেশে কোথায় ইহা অধিক জন্মে? ৯। চায়ের আবাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ আলোচনা কর। এদেশে কোথায় ইহা অধিক জন্মে?

চতুর্দশ অধ্যায় | খনিজ সম্পদ ও শক্তির উৎস

(ক) **খনিজ সম্পদ**—আমাদের দেশে নানা প্রকার খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত **তিনটি** প্রধান।

(১) **কয়লা**—ইহা ভারতের **সর্বপ্রধান** খনিজ সম্পদ। এদেশের প্রায় ৯৫% কয়লা **উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস** জাতীয়। এই কয়লা সাধারণতঃ রেলওয়ে ইঞ্জিন ও স্টিমার চালানো, কলকারখানা চালানো, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, বাড়িতে রান্না, গৃহস্থালির কাজ ও অন্যান্য বহু কাজে ব্যবহৃত হয়। লৌহ ও ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতব শিল্পে ব্যবহারের জন্য কতক কয়লাকে **দুর্গাপুরের কোক চুল্লীতে** (Coke oven) **শক্ত কোকে** (hard coke) পরিণত করা হয়। ঐ সময় প্রচুর **উপজাত দ্রব্য** উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে **কোল গ্যাস** (coal gas) বাড়িতে রান্না ও রাস্তার আলো জ্বালিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। **পীচ বা কোল টার** ব্যবহৃত হয় রাস্তা পাকা করার জন্য। তারপর ন্যাফথালিন কীট ও পোকা মারিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর স্যাকারিন চিনির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। কয়লার বিভিন্ন উপজাত দ্রব্যের সাহায্যে নানারকম ঔষধ, সুগন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি তৈরী হয়। ইহাদের উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। অন্য দিকে কয়লা খনির ধূলি, ধোঁয়া দ্বারা এবং কয়লা নানা কাজে ব্যবহারের ফলে যে ধোঁয়া বাহির হয় তাহা দ্বারা খুব বেশী বায়ুর দূষণ হয়। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর।

ভারতে ৮০০-এর বেশী **কয়লা খনি** আছে। তাহাদের অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গ হইতে পশ্চিমে মধ্য প্রদেশ পর্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃত। এখানে প্রধানতঃ দামোদর, মহানদী ও গোদাবরী নদীর উপত্যকাতে কয়লা পাওয়া যায়। এদেশে ২০% কয়লা খনিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। **বিহারে** পাওয়া যায় এদেশের প্রায় অর্ধেক কয়লা। তাহার পূর্বদিকে আমাদের **পশ্চিমবঙ্গে** পাওয়া যায়

দেশের প্রায় সিকি ভাগ কয়লা। ১৯৮৫-৮৬ খ্রীঃ এদেশে লিগনাইট সহ মোট প্রায় ১৫ কোটি টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রীঃ এদেশে যে পরিমাণ কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ কয়লা **উৎপাদনের পরিমাণ** তাহার চার গুণের অধিক। বিহারের **ঝরিয়া** এদেশের সর্বপ্রধান কয়লা খনি। তারপরই পশ্চিমবঙ্গের **রাণীগঞ্জের** স্থান। ইহা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কেন্দ্র। এই দুই কেন্দ্র প্রায় পাশাপাশি। এদেশের অন্যান্য বিখ্যাত কয়লা খনি হইল বিহারের গিরিডি, রাজমহল, বোকারো। তাহার দক্ষিণে উড়িষ্যার তালচের, করণপুরা। একটু পশ্চিমে মধ্য প্রদেশের উমারিয়া, পেঞ্চ উপত্যকা, সিঙ্গরাউলি, কোরবা। তাহার পশ্চিমে মহারাষ্ট্রের ওয়ারোরা, বল্লারপুর। মধ্য প্রদেশের পূর্বদিকে অন্ধ্র প্রদেশের সিঙ্গারেনী, তেন্দুর প্রভৃতি কয়লা খনিও প্রসিদ্ধ।

এদেশে **লিগ্‌নাইট** বা নিকৃষ্ট বাদামী কয়লা বেশী পাওয়া যায় তামিলনাড়ুর নেভেলিতে। ১৯৮১-৮২ খ্রীঃ তথায় প্রায় ৫৯ লক্ষ টন লিগনাইট উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার সাহায্যে তাপবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়।

(২) **খনিজ তৈল**—আধুনিক কালে এই খনিজ পদার্থ প্রায় স্বর্ণের মতই **গুরুত্বপূর্ণ**। তবে ইহার রং কাল। এজন্য ইহাকে 'Black gold' বলা হয়।
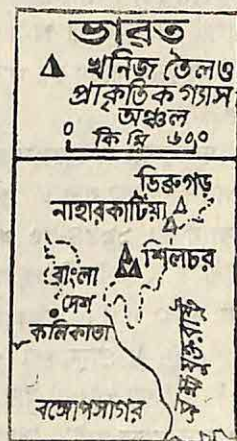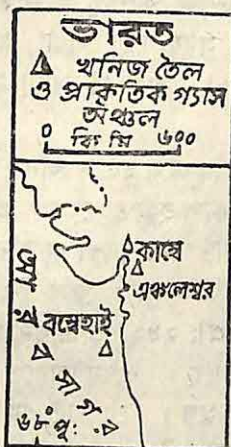
বস্তুতঃ গভীর কূপ খনন করিয়া পাঁকের মত যে **আকরিক পদার্থ** (crude oil) পাওয়া যায় তাহার রং **কাল** বা **ধূসর**। গভীর তৈলকূপ হইতে তুলিয়া তাহাকে সাধারণতঃ মোটা পাইপের মধ্য দিয়া বিভিন্ন শোধনাগারে পাঠান হয়। পূর্ব ভারতে তৈল পাওয়া যায় আসামের বিভিন্ন তৈলকূপ হইতে। তথা হইতে আকরিক তৈল পাইপযোগে আসামের **ডিগবয়, নুনমাটি** (গুয়াহাটি) ও বিহারের **বারাউনিতে** পাঠান হয়। আর জাহাজযোগে পশ্চিমবঙ্গের **হলদিয়াতে** পাঠান হয়।

পশ্চিম ভারতে আকরিক তৈল পাওয়া যায় কাম্বে বা খামভাট উপসাগর ও বম্বে হাই অঞ্চলের তৈলকূপগুলিতে। তথা হইতে আকরিক তৈল পাইপযোগে মহারাষ্ট্রের **ট্রম্বে** ও অন্যান্য তৈল **শোধনাগারে** (oil refinery) পাঠান হয়। বিভিন্ন শোধনাগারে আকরিক তৈল শোধনের ফলে পাওয়া যায় বহু মূল্যবান উপজাত দ্রব্য। তাহাদের মধ্যে **গ্যাসোলিন, পেট্রোল** ও **ডিজেল সর্বপ্রধান**। গ্যাসোলিন বিমানপোত চালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর পেট্রোল ও ডিজেল তৈল মোটর গাড়ি, বাস, রেলওয়ে ইঞ্জিন, যুদ্ধ জাহাজ প্রভৃতি চালানো ও তাপ-বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। **কেরোসিন** ব্যবহৃত হয় আলো জ্বালানো, বাড়িতে রান্না ও গৃহস্থালির নানা কাজে এবং ট্র্যাক্টর চালানোর জন্য। আর লুব্রিকেটিং অয়েল কলকব্জা চালু রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। মোম, বার্নিশ, কালি, ঔষধ, সুগন্ধদ্রব্য প্রভৃতি খনিজ তৈলের অন্যান্য **উপজাত দ্রব্য**। ইহাদের উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

আকরিক তৈল উৎপাদনের জন্য গভীর কূপ খননের সময় ও পরে ঐ আকরিক পদার্থ শোধনের সময় প্রচুর **প্রাকৃতিক গ্যাস** (natural gas) পাওয়া যায়। কতক কূপ হইতে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাসই পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কোল গ্যাসের মত। পেট্রোল, ডিজেল অয়েল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি জ্বালাইবার ফলে বা অন্য ভাবে ব্যবহারের সময় যে ধোঁয়া বাহির হয় তাহা দ্বারা বায়ুর দূষণ হয় খুব বেশী পরিমাণে। তাই এই ধোঁয়া মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর।

এখন ভারতের নানাস্থানে প্রায় ৫০০ টি গভীর কূপ হইতে খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। আর প্রায় ৮০ টি কূপ হইতে কেবল প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ এদেশে ৩ কোটি টনের বেশী আকরিক তৈল উৎপন্ন হইয়াছে। এই উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫০ খ্রীঃ তৈল উৎপাদনের তুলনায় প্রায় ১৫০ গুণ। তাহাছাড়া ১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ ২৮২ কোটি ঘন মিটারের অধিক (cu. m) প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গিয়াছে। এখন ভারতে সবচেয়ে বেশী আকরিক তৈল পাওয়া যায় দেশের পশ্চিম অংশে। বোম্বাই-এর অদূরে অগভীর সমুদ্রে '**বম্বে হাই**'র 'সাগর সম্রাট' এবং খাম্বাট উপসাগরের ধারে **খাম্বাট, এঙ্কলেশ্বর, কোসাম্বা, কলোল** প্রভৃতি এদেশে আকরিক তৈল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। এসকল কেন্দ্রের আশপাশে আরও নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। দেশের উত্তরপূর্ব অংশে আসামের **ডিগবয়** তৈল উৎপাদনের প্রাচীন কেন্দ্র। এখন এখানে তৈল উৎপন্ন হয় না। তাহার আশপাশের **নাহরকাটিয়া, মোরান, রুদ্রসাগর, হুগরীজান, লাকুয়া** প্রভৃতি কেন্দ্র এখন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর শুধু প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপন্ন হয় আসামের **বোগপানি**, হিমাচল প্রদেশের

জ্বালামুখী; গুজরাটের **লুনেজ** প্রভৃতি কেন্দ্রে। এখন বিদেশ হইতেও তৈল-জাতীয় আকরিক পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিয়া এদেশের বিভিন্ন শোধনাগারে শোধন করা হয়। ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ প্রায় ১·৮ কোটি টন আকরিক তৈল ও প্রায় ৫০ লক্ষ টন তৈলজাত দ্রব্য এদেশে আমদানি করা হইয়াছে।

(৩) **লৌহ আকরিক ও ইহার ব্যবহার—লৌহ ভারতের দ্বিতীয় খনিজ সম্পদ্‌**। এদেশে খনি হইতে যে **আকরিক লৌহ** পাওয়া যায় তাহার মধ্যে (ক) **ম্যাগ্‌নেটাইট সর্বোৎকৃষ্ট**। ইহার রং কাল এবং ইহার মধ্যে লৌহের পরিমাণ ৭২% পর্যন্ত। তবে এরূপ লৌহ আকরিকের পরিমাণ খুব কম। (খ) এদেশের ইস্পাত শিল্পে **সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় হেমাটাইট** লৌহ আকরিক। ইহার রং লাল বা কাল এবং ইহার মধ্যে লৌহের ভাগ ৭০% পর্যন্ত। (গ) এদেশের **লিমোনাইট** লৌহ আকরিকের রং বাদামী বা ধূসর। ইহার মধ্যে লৌহের পরিমাণ ৬০% পর্যন্ত। তাই ইস্পাত শিল্পে ইহার ব্যবহার কম। (ঘ) এদেশের **সিডেরাইট** আরও নিকৃষ্ট লৌহ আকরিক। ইহার মধ্যে লৌহের ভাগ ৫০%-এর কম। তাই ইস্পাত শিল্পে ইহার ব্যবহার আরও কম।

ইস্পাত শিল্পে লোহা ও ইস্পাতের তৈরী **পুরানো ও ভাঙ্গা জিনিসের** (scrap) **ব্যবহার** ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এজন্য ভাঙ্গা জাহাজ, রেলওয়ে ইঞ্জিন হইতে আরম্ভ করিয়া পেরেকের টুকরারও চাহিদা প্রচুর। লৌহ আকরিক ও লোহার ভাঙ্গা জিনিসের টুকরার সহিত প্রচুর **চুনাপাথর মিশাইয়া** প্রচণ্ড তাপে তাহা **গলান** হয়। এবং বারে বারে ময়লা পরিষ্কার করা হয়। তারপর ঐ গলন্ত পদার্থকে ছাঁচে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে বলে লৌহ পিণ্ড (Pig iron)। ইহার সহিত ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য জিনিস মিশাইয়া বড় বড় কারখানাতে ইস্পাত তৈরী হয়। আর ছোট-বড় বহু কারখানাতে ঐ ইস্পাতের সাহায্যে অসংখ্য জিনিস তৈরী হয়।

উৎপাদনের অঞ্চল ও পরিমাণ—এদেশের প্রায় সমুদয় লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয় **ছোটনাগপুর ও দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে**। এদেশের বিভিন্ন লৌহ খনির মধ্যে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মিলনস্থলে অবস্থিত **গোয়া** সর্বপ্রধান। তারপর **বিহারের**

নোয়ামুণ্ডি, গুয়া, চিরিয়া, বুদাবুরু, পানসিরাবুর, **কিরিবুরু** (এই খনি উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত) প্রভৃতি খনি। তাহার দক্ষিণেই **উড়িষ্যার** গুরুমহিষাণী, বোনাই, সোলাইপত, বাদাম-পাহাড়, বাগিয়াবুরু প্রভৃতি খনি। আর একটু পশ্চিমে **মধ্য প্রদেশের** দুগ, বাস্তার, ডালি, রাজহারা, বৈলাদিলা প্রভৃতি খনি। এগুলি ভিন্ন **অন্ধ্রপ্রদেশের** নেলোর, গুণ্টুর, কুর্নুল ও তাহার দক্ষিণে **তামিলনাড়ুর** সালেম, তিরুচিরাপল্লী প্রভৃতি খনি প্রসিদ্ধ। মধ্য প্রদেশের পশ্চিমে **মহারাষ্ট্রের** রত্নাগিরি ও পাশে **কর্ণাটকের** বাবাবুদান, বেলারি প্রভৃতি খনি প্রসিদ্ধ। এসকল খনি হইতে ১৯৮৫-৮৬ খ্রীঃ এদেশে লৌহ আকরিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪·৪৫ **কোটি টন**, অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রীঃ এদেশে উৎপন্ন লৌহ আকরিকের তুলনায় প্রায় ১৪½ গুণ।

বোকারো তাপবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকেন্দ্র
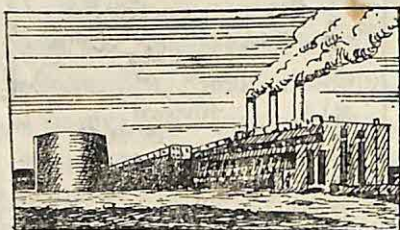
(খ) শক্তির উৎস—ভারতে **নিম্নলিখিত সূত্র** (source) হইতে শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। এই শক্তি বিভিন্ন কলকারখানার কাজ, নানাপ্রকার যানবাহন চালনার কাজ, গৃহস্থালীর কাজ প্রভৃতি অসংখ্য কাজে ব্যবহৃত হইতেছে।

(১) **তাপবিদ্যুৎ শক্তি**—ভারতে যে কয়লা ও খনিজ তৈল উৎপন্ন হয় তাহার কতক অংশ জাহাজ, রেলওয়ে ইঞ্জিন পরিচালনা ও বিভিন্ন কলকারখানা চালানোর জন্য সোজাসুজি শক্তির উৎস রূপে ব্যবহৃত হয়। তবে বিভিন্ন কলকারখানাতে কয়লা ও খনিজ তৈলের তুলনায় **তাপবিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে**। ট্রামগাড়ি, রেলগাড়ি প্রভৃতিও বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চলিতেছে। তাপবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ও বিভিন্ন কাজে তাহা ব্যবহারের সুবিধা অনেক। যেমন, অতি বৃহৎ উনুন (furnace) কয়লার সাহায্যে কলকারখানাতে সর্বক্ষণ জ্বালাইয়া রাখা দরকার হয় না। ফলে, বায়ুর দূষণও কমে। তাহাছাড়া যে কেন্দ্রে তাপবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয় তথা হইতে আশপাশের যে কোন কারখানাতে তাহা সহজে সরবরাহ করা যায়। বৈদ্যুতিক রেলওয়ে ইঞ্জিন চালানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বা কেন্দ্রেও ঐ বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা যায়। এবং সেখানে তাহা ঠিক প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা যায়। তাপবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট কয়লা ও খনিজ তৈল ব্যবহৃত হয়। তবে প্রচুর লিগ্‌নাইট বা নিকৃষ্ট কয়লা এবং প্রকৃতিক গ্যাসও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

ভারতে বৈদ্যুতিক শক্তি **ব্যাপক ভাবে উৎপাদন** আরম্ভ হয় ১৯৪৭ খ্রীঃ দেশের

হইতেছে। ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ দেশের প্রায় ৮০টি প্রধান কেন্দ্রে প্রায় ১৩,৭৭৭

নোয়ামুণ্ডি, গুয়া, চিরিয়া, বুদাবুরু, পান্সিরাবুরু

প
বে
পা
এ
সা
রত্ন
খনি

নান
ব্যব

তাহ
চাল
কল
বাড়
চলি
সুবিধ
কলক
দক্ষিণ
হইতে
বৈদ্যু
বৈদ্যু
অনুস
উৎকৃষ্ট
কয়লা
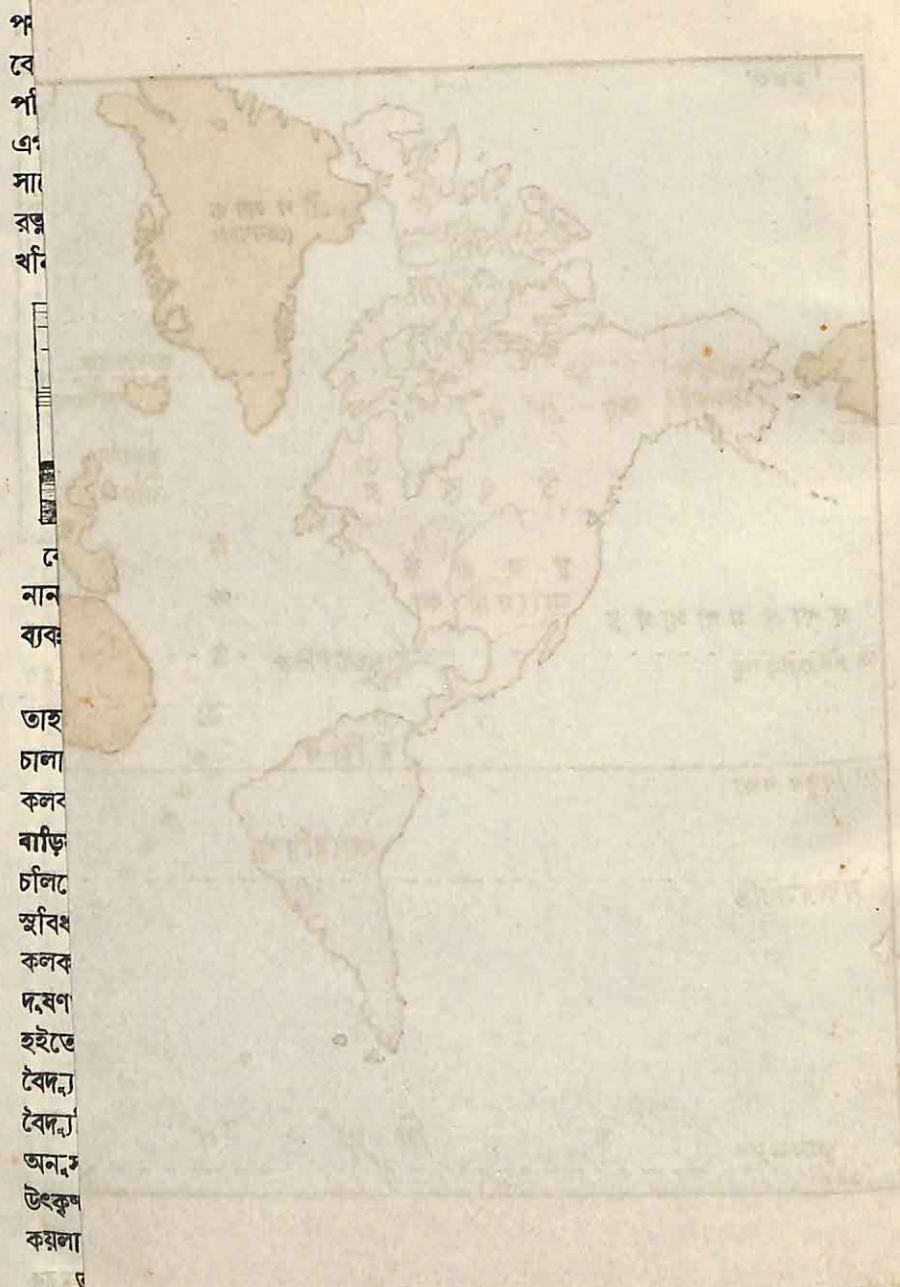
স্বাধীনতা লাভের পরে। তখন হইতে ইহার উৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে, ইতিমধ্যেই ১৯৬০ খ্রীঃ তুলনায় ৪ **গুণের বেশী তাপবিদ্যুৎ শক্তি** উৎপন্ন হইতেছে। এখন সমগ্র দেশে যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে তাহার ৬০%-**এর বেশী তাপবিদ্যুৎ শক্তি,** আর প্রায় ৩৫% **জলজ বিদ্যুৎশক্তি**। ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ এদেশের ৭০টির অধিক প্রধান কেন্দ্রে মোট প্রায় ২৪,২১০ মেগাওয়াট (mw) তাপবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা (installed capacity) ছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র **ব্যাণ্ডেল, কোলাঘাট, দুর্গাপুর, সাঁওতালদি** এবং **কলিকাতা**।

(২) **জলজ বিদ্যুৎশক্তি**—পার্বত্য অঞ্চলে যে সকল নদীর মধ্য দিয়া প্রচুর জলস্রোত প্রবল বেগে বহিয়া চলে তাহাদের উপত্যকাতে সুবিধাজনক স্থানে উঁচু ও মজবুত **প্রকাণ্ড বাঁধ** তৈরী করা হয়। আর তাহার পাশে **বিরাট জলাধার** তৈরী
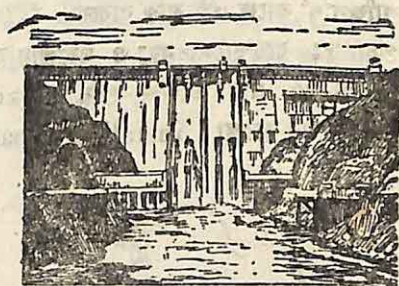
ভাকরা বাঁধের একটি অংশ

করিয়া তথায় জল সঞ্চয় করা হয়। তারপর **ঐ জলকে** নির্দিষ্ট পথে **অত্যন্ত প্রবল বেগে** নীচের দিকে প্রবাহিত করাইয়া সৃষ্টি করা হয় **কৃত্রিম জলপ্রপাত**। তাহার **জলশক্তির সাহায্যে** উৎপন্ন করা হয় **জলজ বিদ্যুৎশক্তি**। তাপবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য কয়লা, খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। তাহা আর অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে জল ব্যবহৃত হয়। তাহা পরে **সেচ কার্য, যাতায়াত ও পরিবহন, মাছের চাষ** প্রভৃতি নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে বর্ষা কালের তুলনায় বৎসরের অন্যান্য সময়ে বৃষ্টি কম হয় এবং নদী ও জলাধারে জল কম থাকে। তাই ঐ সকল সময়ে জলজ বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন কমিয়া যায়। এজন্য তখন তাপবিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা বাড়ে।

এখন এদেশে ১৯৬০ খ্রীঃ তুলনায় ৫ গুণের বেশী জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে। ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ দেশের প্রায় ৮০টি **প্রধান কেন্দ্রে** প্রায় ১৩,৭৭৭

মেগাওয়াটের (mw) অধিক জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা (installed capacity) ছিল। পশ্চিমবঙ্গে জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় প্রধানতঃ **দামোদর উপত্যকা প্রকল্প** (D. V. C.), **ময়ূরাক্ষী প্রকল্প, তিস্তা প্রকল্প** ও **জলঢাকা প্রকল্প** প্রভৃতি প্রকল্প অনুসারে। ইহাদের তুলনায় অনেক বেশী জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় উত্তর ভারতের শতদ্রু নদীর **ভাকরা-নাঙ্গল** প্রকল্প এবং দাক্ষিণাত্যের **কয়না, সরাবতী** প্রভৃতি নদীর প্রকল্প অনুসারে।

(৩) **আণবিক শক্তি**—এদেশে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। ইহাদের সাহায্যে আণবিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। এই শক্তি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র মহারাষ্ট্রে **বোম্বাইয়ের** পাশে **ট্রম্বে**, রাজস্থানে **কোটার** পাশে **রেণুসাগর** ও তামিলনাড়ুর **কালপক্কম্**। এই শক্তি উৎপাদনের জন্য কিছু কিছু বৈদেশিক সাহায্য এখনও আবশ্যক। উত্তর প্রদেশের **নারোরাতে** একটি নূতন কেন্দ্র তৈরী হইতেছে। এদেশে কেবলমাত্র উন্নয়নমূলক **শান্তিপূর্ণ কাজে** এই শক্তি ব্যবহৃত হইবে—ইহাই **ভারতের নীতি**। তদনুসারে প্রধানতঃ রাজস্থানের **মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলে সেচের** জন্য ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ১,০৯৫ মেগাওয়াট (mw) আণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা (installed capacity) ছিল।
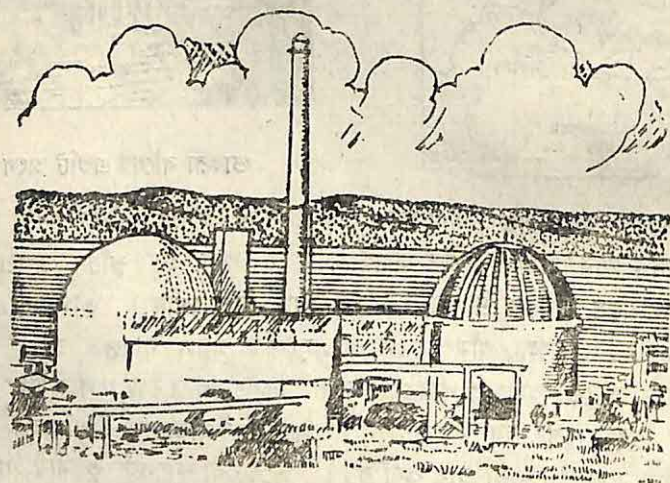
কোটাতে আণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের একটি অংশ

(৪) **অন্যান্য সূত্র হইতে উৎপন্ন শক্তি**—পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের মত ভারতেও নূতন সূত্র (source) হইতে শক্তি উৎপাদনের জন্য চেষ্টা হইতেছে। যেমন, **সৌরশক্তি** বা সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপের সাহায্যে উৎপন্ন শক্তি, **বায়ুপ্রবাহের**

শক্তি, সমুদ্রের জলস্রোতের শক্তি, জোয়ার-ভাঁটার শক্তি প্রভৃতি। গো-মহিষের **গোবরের** সাহায্যেও এদেশে কিছু শক্তি উৎপন্ন হয়।

অনুশীলনী

১। ভারতের সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ কি? ইহা কোন্ কোন্ কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়? এদেশের তিনটি প্রধান কয়লা খনির নাম লিখ। (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৭)। ইহার কয়েকটি প্রধান উপজাত দ্রব্যের নাম লিখ এবং কোন্‌টি কোন্ কাজে অধিক ব্যবহৃত হয় তাহাও লিখ। ২। এদেশে কোথায় কোথায় খনিজ তৈল অধিক উৎপন্ন হয়? ইহার কয়েকটি প্রধান উপজাত দ্রব্যের নাম লিখ। এগুলি কোন্ কোন্ কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়? সাগর সম্রাট কি? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৭)। ৩। লৌহের কয়েকটি প্রধান আকরিক পদার্থের নাম লিখ। ভারতে কোন্ কোন্ রাজ্যে ইহা অধিক উৎপন্ন হয়? ৪। তাপবিদ্যুৎ শক্তি কোন্ কোন্ উপাদানের সাহায্যে উৎপন্ন হয়? ৫। জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পর ঐ জল কোন্ কোন্ কাজে ব্যবহৃত হয়? এদেশের তিনটি প্রধান তাপবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের ও তিনটি জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের নাম লিখ।

বহু পূর্বে আমাদের দেশ সহ পৃথিবীর সর্বত্র **কুটীর শিল্পের** (cottage industries) যুগ ছিল। ক্রমশঃ **বৃহৎ শিল্পসমূহ** (large scale industries) অধিক উন্নতি লাভ করিতেছে। এখন তাহাদেরই প্রাধান্য অধিক। পরাধীন ভারতে এসকল বিষয়ে উন্নতি ও অগ্রগতি ইংরেজ সরকারের কাম্য ছিল না। তাই তাহাদের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে স্বাধীন ভারতে। ফলে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতির তুলনায় ভারতে অনেক পরে বৃহৎ শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এক দিকে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার উপাদান, শক্তির উৎস, শ্রমিক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়ার স্থবিধা থাকা দরকার। যাতায়াত ও পরিবহনেরও বিশেষ স্থবিধা থাকা দরকার। এসকল বিষয়ে স্থবিধা এবং উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের স্থবিধা ইত্যাদি না থাকিলে কোথায়ও বড় শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হইতে পারে না। **শিল্পের কেন্দ্রীভবন বা একদেশতাও** হইতে পারে না। অন্য দিকে শিল্পকেন্দ্রের ধোঁয়া দ্বারা যাহাতে বায়ুর দূষণ হইতে না পারে, শিল্পকেন্দ্র হইতে যে সকল জিনিস ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহাদের দ্বারাও বায়ু, জল প্রভৃতির দূষণ হইতে না পারে তাহা চিন্তা করা প্রয়োজন। বড় শিল্পকেন্দ্রগুলিকে ঘনবসতি অঞ্চল, নগর, বন্দর প্রভৃতি হইতে কিছু দূরে স্থাপন করা উচিত।

এদেশের শিল্পগুলি ইহাদের প্রধান উপাদান অনুসারে নানা ভাগে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে বর্তমান পাঠ্যসূচী বা সিলেবাস অনুসারে ভারতের দুইটি প্রধান কৃষিজ সম্পদ্‌ভিত্তিক ও একটি খনিজ সম্পদ্‌ভিত্তিক বৃহৎ শিল্পের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(১) **কার্পাস বস্ত্রশিল্প**—এই শিল্পের মূল উপাদান কার্পাস তুলা। কৃষিকার্য দ্বারা ইহা উৎপন্ন হয়। সেই হিসাবে ইহা **কৃষিজ সম্পদ্‌ভিত্তিক শিল্প**।

বর্তমান অবস্থা—কার্পাস বস্ত্র শিল্প **এদেশের সর্বপ্রধান বৃহৎ শিল্প**। ভারতে **প্রথম** কাপড়ের **কল** তৈরী হয় কলিকাতার পাশে **ঘুসুড়িতে** (ফোর্ট গ্লস্টার) সম্ভবতঃ ১৮১৮ খ্রীঃ। আর এখন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) সমগ্র দেশে কাপড় কলের সংখ্যা ৯২০।

এদেশের কয়েকটি অংশে নিম্নলিখিত বিষয়ে স্থবিধার ফলে এদেশের এই শিল্প ঐ সকল স্থানে অধিক উন্নত। অনেক ক্ষেত্রে এই শিল্পের একদেশতা বা কেন্দ্রীভবন হইয়াছে। এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় স্থবিধাগুলি নিম্নরূপ—ঐ সকল স্থানে ও আশপাশে মিল ও তাঁত বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজন মিটাইবার মত

পরিমাণে **উৎকৃষ্ট তুলা** জন্মে। ঐ সকল স্থানের **জলবায়ু আর্দ্র**। তাহা কাপড় বুনিবার (weaving) পক্ষে বিশেষ সহায়ক। তাহাছাড়া **কয়লা, তাপবিদ্যুৎ ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি, দক্ষ শ্রমিক, মূলধন** প্রভৃতিও ঐ সকল অংশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় **কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি** দেশেই তৈরী হয়। **যাতায়াত ও পরিবহন** ব্যবস্থা উন্নত থাকার ফলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিস সহজেই আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। এদেশে কাপড়ের চাহিদা খুব বেশী। ফলে, এদেশে কলে ও তাঁতে অর্থাৎ কুটীর শিল্প ও বৃহৎ শিল্প দুইটি মিলিয়া যত কাপড় তৈরী হয় তাহার বেশীর ভাগ দেশেই ব্যবহৃত হয়। এদেশে তৈরী কতক কাপড়, জামা প্রভৃতি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। ফলে, বিদেশেও তাহাদের চাহিদা খুব বেশী। তাই সেগুলি সহজেই বিদেশে যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হয়। এরূপ বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানি সম্পর্কে ভারতের স্থান পৃথিবীতে এখন **দ্বিতীয়**, কেবল জাপানের পারে। ১৯৮৫-৮৬ খ্রীঃ এদেশ হইতে ৩৭১·৬ কোটি টাকার অধিক মূল্যের কার্পাস বস্ত্র এবং ১১০০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের পোশাক ও এই জাতীয় অন্যান্য জিনিস রপ্তানি হইয়াছে।

এখন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) এদেশে কাপড়ের কলের **মোট সংখ্যা** ৯২০। তাহাদের মধ্যে প্রায় ২৮০ টি কলে সুতা কাটা ও কাপড় বোনা দুই কাজই হয়, আর প্রায় ৬৪০ টি কলে কেবল সুতা কাটা হয়। ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ এদেশে প্রায় ১৩১ **কোটি কেজি** কার্পাস সুতা তৈরী হইয়াছে (১৯৫০ খ্রীঃ মাত্র ৫৩ কোটি কেজি তৈরী হইয়াছে)। ঐ সুতা মিলে ও তাঁতে কাপড় তৈরীর জন্য এবং গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি তৈরী সংক্রান্ত হোসীয়ারী শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এদেশের কাপড়ের কলে ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ প্রায় ৩৪০ **কোটি মিঃ** বস্ত্র তৈরী হইয়াছে। তবে ঐ বৎসর (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) এদেশে তাঁতে তৈরী হইয়াছে ৬৯০ **কোটি মিঃর** অধিক কাপড়। অর্থাৎ ঐ বৎসর মিলে যত কাপড় তৈরী হইয়াছে তাহার চেয়ে প্রায় ৮০% বেশী কাপড় এদেশে তাঁতে তৈরী হইয়াছে। ১৯৫০ খ্রীঃ এদেশে তাঁতে যত কাপড় তৈরী হইয়াছিল, ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ তাহার তুলনায় ৮ গুণ বেশী কাপড় তাঁতে তৈরী হইয়াছে।

এদেশে কেবল যে **কার্পাস সুতার** তৈরী ধুতি, শাড়ী, লুঙ্গী, জামার কাপড় প্রভৃতির উৎপাদন বাড়িতেছে তাহা নহে। এদেশে কার্পাস সুতা ও **নাইলন, রেয়ন** প্রভৃতি কৃত্রিম সুতার **মিশান** কাপড়ও ক্রমশঃ অধিক তৈরী হইতেছে। ১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় এখন এদেশে এজাতীয় মিশান সুতার কাপড় প্রায় ৬০-৬৫ গুণ বেশী তৈরী হয়।

কার্পাস বস্ত্র শিল্পের অঞ্চল—পূর্বপৃষ্ঠায় ও উপরে লিখিত সুবিধাগুলির জন্য ভারতের নিম্নলিখিত পাঁচটি অঞ্চলে কার্পাস বস্ত্র শিল্প উন্নত। ঐ সকল

স্থানে এই শিল্পের **একদেশীভবন** হইয়াছে। (i) **পশ্চিম ভারত অঞ্চল**—ভারতে বস্ত্রশিল্পের সর্বপ্রধান অঞ্চল গুজরাট ও মহারাষ্ট্র। এদেশের প্রায় অর্ধেক মিলের কাপড় ও অধিকাংশ সুতা এই অঞ্চলের কলগুলিতে তৈরী হয়। গুজরাটের **আহ্মদাবাদ** বহু দিন **ভারতে** কার্পাস বস্ত্র শিল্পের **সর্বপ্রধান** কেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল। ইহাকে ভারতের ম্যাঞ্চেস্টারও বলা হইত। এখন মহারাষ্ট্রের **বোম্বাই** এদেশে কার্পাস বস্ত্র শিল্পের **সর্বপ্রধান কেন্দ্র**। আহ্মদাবাদ এখন এদেশের কার্পাস বস্ত্রশিল্পের **দ্বিতীয়** কেন্দ্র। গুজরাটের ভাদোদারা (বরোদা), ভাবনগর, রাজকোট প্রভৃতি এবং মহারাষ্ট্রের নাগপুর. পুণে, শোলাপুর, ওয়ার্ধা প্রভৃতিও কার্পাস বস্ত্রশিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র।

(ii) **দক্ষিণ ভারত অঞ্চল**—দাক্ষিণাত্যের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও কেরালা রাজ্য এদেশে বস্ত্র শিল্পের দ্বিতীয় অঞ্চল। এখানকার প্রধান কেন্দ্র তামিলনাড়ুর **কয়েম্বাটোর**। ঐ রাজ্যের মাদ্রাজ, মাদুরাই প্রভৃতি, কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর, কেরালার ত্রিবান্দ্রম্ প্রভৃতি এই অঞ্চলের বস্ত্র শিল্পের অন্যান্য প্রধান কেন্দ্র। (iii) ভারতের মধ্য অংশে কার্পাস বস্ত্র শিল্পের দুই প্রধান অঞ্চল **দিল্লী-উত্তর প্রদেশ** ও (iv) **মধ্য প্রদেশ**। তন্মধ্যে ভারতের রাজধানী দিল্লী, উত্তর প্রদেশের কানপুর, মধ্য প্রদেশের গোয়ালিয়র প্রভৃতি এই দুই অঞ্চলের কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র। এখানকার শুষ্ক জলবায়ু কার্পাস বস্ত্র শিল্পের পক্ষে অসুবিধাজনক। এজন্য এখানে প্রয়োজনমত কৃত্রিম আর্দ্রতার ব্যবস্থা করা হয়। (v) **পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল**—এই রাজ্যে বস্ত্র শিল্পের উন্নতির পক্ষে নানাপ্রকার সুবিধা আছে। যেমন, এখানকার জলবায়ু আর্দ্র। এখানে কয়লা, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি সহজে পাওয়া যায়। শ্রমিকও সুলভ। এখানকার যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত। এখানে জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানির সুযোগ অধিক। এখানে কেবল তুলা ও সুতার অভাব। এগুলি এখানে আমদানি করা হয়। ভাগীরথী-হুগলি নদীর দুই তীরে শ্যামনগর, সোদপুর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি এই শিল্পের কেন্দ্র। এই রাজ্যে বস্ত্র শিল্প, পাট শিল্প প্রভৃতির, এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিং বা পূর্ত শিল্পেরও প্রধান অঞ্চল ভাগীরথী নদীর দুই পাশের স্থানসমূহ। ইহাই **ভারতের সর্বপ্রধান শিল্পাঞ্চল**। তবে এখানকার ধূলি, ধোঁয়া, কলকারখানা

হইতে ফেলিয়া দেওয়া বিভিন্ন জিনিস দ্বারা ভাগীরথীর জলের ও এই অঞ্চলের বায়ুর দূষণ এক বিরাট **সমস্যার** সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) **পাট শিল্প—বর্তমান অবস্থা**—ভারতের **কৃষিজ সম্পদ্‌ভিত্তিক** বৃহৎ শিল্পের মধ্যে পাট শিল্পের স্থান **দ্বিতীয়**। তবে ইহাই **পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান** শিল্প। **এমন** কি এখানকার কলগুলিতে তৈরী চট, থলে প্রভৃতি বহু দিন ছিল ভারতের **সর্বপ্রধান** রপ্তানি-দ্রব্য। এই রাজ্যের **কলিকাতা শিল্পাঞ্চল** বা হুগলি (নদী) শিল্পাঞ্চল, অর্থাৎ ভাগীরথী-হুগলির উভয় তীর সমগ্র **পৃথিবীতে পাট শিল্পের সর্বপ্রধান অঞ্চল**। এখানে এই শিল্পের **উন্নতির কারণ** ও **সুবিধাগুলি** কার্পাস বস্ত্র শিল্পের সুবিধার মত। তাহার উপর পাটকলগুলির চাহিদা মিটাইবার মত পাট এখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে **এদেশেই জন্মে**। তাহার প্রায় অর্ধেক জন্মে পশ্চিমবঙ্গে, বাকী অংশ আশপাশের রাজ্যগুলিতে জন্মে। সামান্য পাট বাংলাদেশ হইতে আমদানি করা হয়। এখানকার **আর্দ্র জলবায়ু** এই শিল্পের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। তাহাছাড়া এখানে প্রয়োজনমত **শ্রমিক ও মূলধন** পাওয়া যায়। এখানকার **যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা** উন্নত। তাহাছাড়া এই শিল্প সম্পর্কে এখানে অন্যান্য বিষয়েও সুবিধা আছে।

এদেশে তৈরী পাটের জিনিসের ৯০% **চট ও থলে**। তারপর কার্পেট, ক্যানভাস, ত্রিপল, আসন, দড়ি, প্ল্যাস্টিকের নানারকম জিনিস, বৈদ্যুতিক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস ইত্যাদি। ১৯৫০ খ্রীঃ এদেশে এসকল জিনিস যে পরিমাণে তৈরী হইয়াছিল ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ তাহার তুলনায় প্রায় ৬৫% বেশী এসকল জিনিস তৈরী হইয়াছে। ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ প্রায় ১৩·৭ লক্ষ টন তৈরী হইয়াছে। তবে কিছুদিন যাবৎ কয়েকটি অসুবিধারও সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন, এখন বিদেশে চট ও থলের **চাহিদা** আগেকার তুলনায় অনেক কম। তাহাছাড়া এদেশের কলগুলির যন্ত্রপাতি পুরানো। এজন্য এখন এদেশে এই শিল্পে লাভ কম। তাই এদেশে পাট কলে জিনিসের উৎপাদন কম, কলগুলির জন্য পাটের চাহিদাও কম। ফলে, এখন এদেশে পাটের দাম কম। এজন্য এখন এদেশে অনেক জমিতে পাটের পরিবর্তে যথেষ্ট আউস ধানের চাষ হয়। এখানে উল্লেখ করা

প্রয়োজন যে, পাট চাষের সময়ের (চৈত্র-বৈশাখ হইতে ভাদ্র-আশ্বিন পর্যন্ত) জলবায়ু পাট ও আউস ধান, দুয়েরই চাষের পক্ষে উপযুক্ত। আর পাট চাষের উপযুক্ত জমি (পলি মাটি) ধান চাষের পক্ষেও উপযুক্ত।

পাট শিল্পের অঞ্চল—ভাগীরথী-হুগলি নদীর পূর্ব (বাম) তীরে **ভাটপাড়া, আগরপাড়া, বজবজ, বিড়লাপুর** প্রভৃতি এবং নদীর পশ্চিম (ডান) তীরে **রিষড়া, শ্রীরামপুর, বালি, উলুবেড়িয়া** ইত্যাদি এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ইহাদের দ্বারা এই অঞ্চলের পরিবেশ দূষণ এক বিরাট সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বিহারের **কাটিহার,** উত্তর প্রদেশের **কানপুর** প্রভৃতিও পাট শিল্পের কেন্দ্র।

(৩) **লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—ক্রমোন্নতি ও বর্তমান অবস্থা**—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ভারতের **সর্বপ্রধান খনিজ সম্পদ্‌ভিত্তিক শিল্প**। এদেশে

আধুনিক ইস্পাত শিল্পের সূত্রপাত হয় বীরভূম জেলাতে (**সম্ভবতঃ ১৭৭৭ খ্রীঃ**)। তাহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে স্থাপিত হয় বর্ধমান জেলার **কুলটির কারখানা**। কয়েক বৎসর পূর্বে এই কারখানাতে ইস্পাত তৈরীর কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৯০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের **জামসেদপুরে** স্থাপিত হয় এদেশে ইস্পাত শিল্পের **বৃহত্তম কারখানা**। তারপর পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জের পাশে **হীরাপুর** ও **বার্নপুরের** কারখানা এবং কর্ণাটকে **ভদ্রাবতী** কারখানা স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে দেশের প্রয়োজনীয় নানা প্রকার জিনিস তৈরীর উদ্দেশ্যে এদেশে ইস্পাতের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের **দুর্গাপুরে,** উড়িষ্যার **রৌরকেল্লাতে** ও মধ্য প্রদেশের **ভিলাইতে** তিনটি বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হয়। তারপর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পে বিহারের **বোকারোতে** স্থাপিত হয় ইস্পাত শিল্পের চতুর্থ বৃহৎ কেন্দ্র। দুর্গাপুরের কারখানার জন্য ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের, রৌরকেল্লার জন্য পশ্চিম জার্মানীর এবং ভিলাই ও বোকারোর জন্য সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। এই কেন্দ্রগুলি স্থাপনের পূর্বে **১৯৫০ খ্রীঃ** এদেশে উৎপন্ন হইত মাত্র ১০½ লক্ষ টন বিক্রয়ের উপযোগী ইস্পাত।

আর ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ এদেশে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার প্রায় ৮ গুণ, অর্থাৎ প্রায় ৮০ **লক্ষ টন** ইস্পাত। এই বৃহৎ কেন্দ্রগুলি ভিন্ন এদেশে এই শিল্পের আরও বহু কেন্দ্র আছে। যেমন, তামিলনাড়ুর **সালেমে** নূতন ইস্পাতকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং ১৯৮১ খ্রীঃ হইতে এখানে উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপটনম্-এ (বালাচেরুভু) নূতন ইস্পাতকেন্দ্র নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ। কর্ণাটকের বিজয় নগরে (হসপেট) ও উড়িষ্যার পারাদীপের নিকট দেওরী বা দুবারিতে ইস্পাত কেন্দ্র তৈরীর কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। তাহা-ছাড়া এখন এদেশে ইস্পাত শিল্পের প্রায় ১৭০ টি ক্ষুদ্র কেন্দ্রও (mini steel plant) আছে। এখন এদেশে এই শিল্পের উন্নতির ফলে বিশেষ ধরনের অত্যন্ত **শক্ত** ইস্পাত, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বহু জিনিসও তৈরী হয়। এদেশের **ভদ্রাবতীতে** কেবল **সংকর ইস্পাত** তৈরী হয়। আরও কতক কেন্দ্রেও বিশেষ ধরনের ইস্পাত তৈরী হয়।

ইস্পাত শিল্পের অঞ্চল—ভদ্রাবতী, সালেম, বিজয় নগর, বিশাখাপটনম্ প্রভৃতি এদেশের ইস্পাত শিল্পের কয়েকটি কেন্দ্র আছে দক্ষিণ ভারতে। বাকী সব বড় কারখানাই **ছোটনাগপুর মালভূমির** অন্তর্গত জামসেদপুর ও বোকারোতে এবং

তাহাদের **আশপাশে** পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে, উড়িষ্যার রৌরকেল্লাতে ও মধ্য প্রদেশের ভিলাইতে অবস্থিত। কারণ, এই শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যক উপাদান **লৌহ আকরিক, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ** এবং **কয়লা**—এই কয়টি খনিজ সম্পদ্ এখানে

প্রচুর পরিমাণে খুব কাছাকাছি পাওয়া যায়। তাহাছাড়া **তাপবিদ্যুৎ ও জলজ বিদ্যুৎশক্তি, নদীর জল, শ্রমিক, মূলধন** প্রভৃতিও এখানেই সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। **যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা** সম্পর্কেও এখানে সুযোগ-সুবিধা অধিক। এদেশে উৎপন্ন জিনিসের স্থানীয় চাহিদা অধিক, বিদেশেও রপ্তানির সুযোগ প্রচুর। কর্ণাটকের ভদ্রাবতীতে কয়লার অভাব। তথায় পূর্বে কাঠ কয়লা ব্যবহৃত হইত। এখন তথায় জলজ বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়। অপর দিকে এসকল শিল্পকেন্দ্রে পরিবেশ দূষণ এক বিরাট সমস্যা। ছোটনাগপুরের সমস্যা আরও বেশী। কারণ, এই অঞ্চলেই ভারতের অধিকাংশ কয়লা খনি অবস্থিত। তাহাদের ধূলি, ধোঁয়া প্রভৃতি দ্বারা পরিবেশ দূষণ হয় খুব বেশী পরিমাণে।

পূর্ত বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প—১৯৪৭ খ্রীঃ স্বাধীনতা লাভের পর হইতে এদেশে একদিকে বড় বড় বাড়ী, সেতু, কলকারখানা প্রভৃতি তৈরী হইতেছে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে। অন্যদিকে এদেশে নানাপ্রকার শিল্পেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। ফলে, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় এবং অন্যান্য কাজের জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এদেশেই যাহাতে দেশের প্রয়োজনীয় কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিস তৈরী হইতে পারে, সে বিষয়ে

এদেশে বিস্তর সুযোগ আছে। যেমন, এদেশে ইস্পাত শিল্প বিশেষ উন্নত। এদেশে কারিগরী বিদ্যাও অত্যন্ত উন্নত। ফলে, এদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং বা পূর্ত শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইতেছে। স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়, এদেশে ১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ নিম্নলিখিত জিনিসের উৎপাদন নিম্ন হারে বাড়িয়াছে। মোটর গাড়ির উৎপাদন হইয়াছে ৬ গুণ। তাহাছাড়া এসময়ে ট্রাক, বাস, টেম্পো প্রভৃতিও তৈরী হইয়াছে মোটর গাড়ির সমান সংখ্যায়। আর স্কুটার ও মোটর সাইকেল তৈরী হইয়াছে বহু গুণ (এমন কি ১৯৬০ খ্রীঃ তুলনায় ২১ গুণ)। বাইসাইকেল তৈরী হইয়াছে প্রায় ৬০ গুণ। সেলাই কল তৈরী হইয়াছে প্রায় ১০ গুণ এবং রেলওয়ে ওয়াগন ও বগি তৈরী হইয়াছে প্রায় ৬ গুণ বেশী। অন্য বহু প্রকার কলকব্জা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উৎপাদন বাড়িয়াছে ১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় কয়েক শত গুণ। এখন কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ট্র্যাক্টর

প্রভৃতি এবং বিভিন্ন প্রকার শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কলকব্জা এদেশেই তৈরী হয়। ইহাদের মধ্যে পাটের কল, কাপড়ের কল, চিনির কল, কাগজের কল, ছাপাখানা প্রভৃতির যন্ত্রপাতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানারকম বিমানপোত, স্টীমার, জাহাজ, এমন কি দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বহু কলকব্জা, যন্ত্রপাতি অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতিও এখন এদেশে তৈরী হয়। এদেশে তৈরী কতক যন্ত্রপাতি এত **উন্নত ধরনের** যে বিদেশেও তাহাদের চাহিদা প্রচুর। তাই ১৯৮৫-৮৬ খ্রীঃ এদেশের মোট রপ্তানির মধ্যে ইহাদের স্থান ছিল **তৃতীয়**। ঐ বৎসর এদেশ হইতে **লৌহ ও ইস্পাতের** তৈরী ও অন্যান্য প্রকার যন্ত্রপাতি **রপ্তানির** মূল্য ছিল প্রায় ৭৬০ **কোটি** টাকা।

অনুশীলনী

১। ভারতের সর্বপ্রধান বৃহৎ শিল্প কি? এদেশে কখন এই শিল্প প্রথম আরম্ভ হয়? ২। এদেশের দুইটি প্রধান কৃষিজ সম্পদ্‌ভিত্তিক শিল্পের নাম লিখ। কোন্‌টির মূল উপাদান কি? এই শিল্প দুইটির উন্নতি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর অধিক নির্ভরশীল? ৩। 'শিল্পের একদেশতা' বলিতে কি বোঝায়? পশ্চিম ভারতে কার্পাস বস্ত্র বয়ন শিল্পের একদেশীভবন ঘটিয়াছে কেন? কোন্ শহরকে 'ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার' বলা হয়? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬ Ext)। ৪। এদেশে কার্পাস বস্ত্রশিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র কোথায়? ৫। এদেশে পাট শিল্পের সর্বপ্রধান অঞ্চল কোথায়? এদেশে এই শিল্পের প্রধান অসুবিধা কি? ৬। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য কি কি কাঁচা মালের প্রয়োজন হয়? পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্প গড়িয়া উঠার ভৌগোলিক কারণগুলি কি কি? ভারতের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কারখানাটি কোথায় অবস্থিত? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬)। ৭। এদেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলি কোথায়?

ভারতের **যাতায়াত ও পরিবহন সংক্রান্ত ব্যবস্থা চারি ভাগে** বিভক্ত —

(১) **স্থলপথ**—স্বাধীনতা লাভের সময় এদেশে **গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড, গ্রেট ডেকান রোড** প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি প্রসিদ্ধ রাস্তা ছিল। তাহাছাড়া মাত্র দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি নগরের আশপাশের রাস্তা ছিল উন্নত ধরনের। ১৯৪৭ খ্রীঃ হইতে এদেশের বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন ব্যবস্থারও উন্নতিবিধান হইতেছে। ফলে, এখন এদেশে **স্থলপথের দৈর্ঘ্য** ১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় তিন গুণের বেশী। এখন এদেশে স্থলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫½ **লক্ষ কিঃমিঃ** অর্থাৎ পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে **চতুর্থ**। এখন এদেশের স্থলপথের মোট দৈর্ঘ্য কেবল যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ও ফ্রান্সের পরে। এদেশের স্থলপথগুলি **তিন ভাগে** বিভক্ত।

(i) **জাতীয় সড়ক** (National Highways)—এদেশের আগেকার **প্রধান স্থলপথগুলির** বিস্তর **উন্নতি** হইয়াছে। কিছু কিছু **নূতন প্রশস্ত পথও** তৈরী হইয়াছে। ফলে, এখন এদেশে প্রায় ৬০টি জাতীয় সড়ক আছে। এগুলিই **দেশের সর্বপ্রধান স্থলপথ**। ইহাদের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩১,৭০০ কিঃমিঃ। এই পথগুলি **অত্যন্ত প্রশস্ত ও বাঁধান**। এসকল পথে **যে কোন প্রকার যান-বাহন সকল ঋতুতে যাতায়াত** করিতে পারে। এসকল পথেই **দেশের প্রধান নগর, বন্দর** ও **শিল্পকেন্দ্রসমূহে** যাতায়াতের এবং ইহাদের **পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের** পক্ষে সুবিধা খুব বেশী। যেমন, ২ নং জাতীয় সড়ক কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত। ৫ নং জাতীয় সড়ক কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত। এবং ৬ নং জাতীয় সড়ক কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত বিস্তৃত। তাহাছাড়া ৩১ নং, ৩২ নং, ৩৪ নং প্রভৃতি জাতীয় সড়কও পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া বিস্তৃত।

(ii) **রাজ্য সড়ক** (State Highways)—প্রত্যেক রাজ্যের বিভিন্ন

অংশে জাতীয় সড়কের চেয়ে কম প্রশস্ত অথচ বাঁধান, কতক স্থলপথ আছে। এই পথগুলি রাজ্য সড়ক। এসকল পথে প্রত্যেক **রাজ্যের প্রধান শহর ও শিল্প-কেন্দ্রগুলির** মধ্যে যাতায়াতের পক্ষে সুবিধা হয়। আবার **জাতীয় সড়কগুলির সহিতও** এগুলির যোগাযোগ আছে। এগুলি এক রাজ্যের বিভিন্ন শহর বা শিল্পকেন্দ্র হইতে ঐ রাজ্যের অন্যান্য শহর ও শিল্পকেন্দ্রে যাতায়াতের পক্ষে সুবিধাজনক। এমন কি এগুলি অন্য রাজ্যের শহর, নগর ও শিল্পকেন্দ্রেও যাতায়াত ও মালপত্র পরিবহনের পক্ষেও সুবিধাজনক।

(iii) **জেলা ও গ্রাম সড়ক** (District and rural roads)—এই প্রকার সড়কগুলি রাজ্য সড়কের চেয়ে সরু, তবে তাহাদের সহিত যুক্ত। কাজেই এসকল পথের সাহায্যে গ্রাম হইতে জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন **শহর ও শিল্পকেন্দ্রে যাতায়াত** করা যায়। আবার রাজ্য সড়ক ও জাতীয় সড়কের সহিত এগুলি যুক্ত। ফলে, এসকল পথে গ্রাম হইতে জিনিস পত্র দেশের যে কোন অংশেই পরিবহন করা সম্ভবপর। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রে মোট সড়কের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী।

(iv) এগুলি ভিন্ন এদেশের **সীমান্ত সড়কগুলিও** (Border roads) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে হিমাচল প্রদেশের মানালি হইতে জম্মু ও কাশ্মীরের লেহ পর্যন্ত বিস্তৃত স্থলপথ **পৃথিবীর উচ্চতম স্থলপথ**। এই অঞ্চলে ইহার উচ্চতা গড়ে ৪২৭০ মিঃ।

এদেশের স্থলপথে ৪০ লক্ষের অধিক **বাষ্পচালিত গাড়ি** যাতায়াত করে। এরূপ গাড়ীর সংখ্যা এশিয়াতে কেবল **জাপানের পরে**। এদেশের মধ্যে **মহারাষ্ট্রে** এরূপ গাড়ির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এদেশে কেবলমাত্র সরকারী **বাসে দৈনিক ৪ কোটির বেশী যাত্রী** যাতায়াত করে। এসকল গাড়ি চালাইবার জন্য ব্যবহৃত পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতির ধোঁয়া দ্বারা পরিবেশ দূষণের সমস্যা ক্রমশঃ গুরুতর হইতেছে।

(২) **রেলপথ**—১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতের রেলপথগুলি ছিল সরু, (প্রধানতঃ মিটার গেজ)। তখন পর্যন্ত রেলওয়ে ইঞ্জিনগুলি (steam engine) বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে চলিত। তখন হইতে এদেশে যানবাহন ব্যবস্থার ক্রমশঃ উন্নতিবিধান হইতেছে। ফলে, এখন ভারতের অধিকাংশ রেলপথ **প্রশস্ত** বা **ব্রড গেজ**। এবং এখন রেলগাড়ীগুলি চলে প্রধানতঃ **বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ও ডিজেল** ইঞ্জিনের সাহায্যে। রেলগাড়ি সম্পূর্ণ রূপে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের সাহায্যে চলাচলের ব্যবস্থা নানা কারণেই কাম্য। এই ব্যবস্থার ফলে কয়লা, ডিজেল প্রভৃতি দ্বারা ইঞ্জিন চালাইলে বায়ুর যে দূষণ হয় তাহাও দূর করা সম্ভব। এখন (১৯৮৪ খ্রীঃ) এদেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য

প্রায় ৬১,৪৬০ **কিঃমিঃ** অর্থাৎ **এশিয়ার** দেশগুলির মধ্যে **প্রথম**। এদেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য সমগ্র **পৃথিবীতে ও চতুর্থ**— যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণ-তন্ত্র ও ফ্রান্সের পরে। ভারতের এসকল রেলপথে প্রতি দিন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) গড়ে প্রায় ১১,০০০ **ট্রেন** চলে। সেগুলি ১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ বহন করিয়াছে ৩৩২ ৫ **কোটির** অধিক **মানুষ ও** ২৬ **কোটি টনের অধিক জিনিসপত্র**।
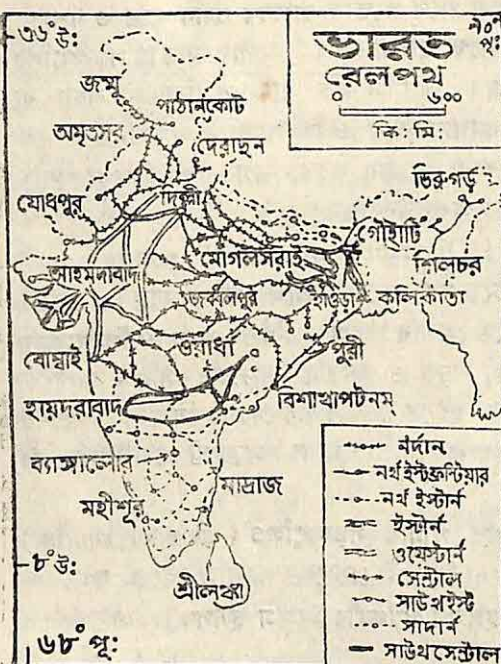
এদেশের রেলপথগুলি পরিচালনার সুবিধার জন্য নিম্নেলিখিত **নয়টি অঞ্চলে** (Railway zones) বিভক্ত। ভবিষ্যতে ত্রিবান্দ্রম্ রেলওয়েজ নামে ভারতীয় রেলপথের দশম অঞ্চল গঠনের **সম্ভাবনা** আছে।

রেলওয়ে অঞ্চলের নাম	দৈর্ঘ্য কিঃমিঃ	দেশের কোন্ অংশে বিস্তৃত	প্রধান কার্যালয়
নর্দান রেলওয়েজ	১০,৯৭৭	উত্তর	নূতন দিল্লী
ওয়েস্টার্ণ ,,	১০,২৯৫	পশ্চিম	বোম্বাই
সেন্ট্রাল ,,	৬,৩৭১	মধ্য	বোম্বাই
ইস্টার্ন ,,	৪,২৩৮	পূর্ব	কলিকাতা
নর্থ ইস্টার্ন ,,	৫,১৬৩	উত্তর পূর্ব	গোরক্ষপুর
নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার ,,	৩,৫৮৩	উত্তর পূর্ব সীমান্ত	গুয়াহাটি (মালিগাঁও)
সাউথ ইস্টার্ন ,,	৭,০৫১	দক্ষিণ পূর্ব	কলিকাতা
সাউথ সেন্ট্রাল ,,	৭,০৭২	দক্ষিণ মধ্য	সেকেন্দ্রাবাদ
সাদার্ন ,,	৬,৭১০	দক্ষিণ	মাদ্রাজ

(৩) **নৌপথ**—১৯৪৭ খ্রীঃ হইতে এদেশে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের এবং নৌপথে যাতায়াত ব্যবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। ফলে, এখন এদেশের **নৌশক্তি এশিয়াতে দ্বিতীয়,** কেবল জাপানের পরে। এখন (১৯৮৪-৮৫ খ্রীঃ) এদেশের জাহাজের পরিবহন ক্ষমতা ৬১·২৮ লক্ষ টনের অধিক অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় ২৫ গুণের বেশী। এদেশের নৌপথ বা জলপথ তিন ভাগে বিভক্ত :

(i) **নদী ও খালপথ**—এদেশের নদীগুলির মধ্য দিয়া **স্টীমার** চলে প্রায় ১৭০০ কিঃমিঃ। আর দেশের বিভিন্ন অংশের খালের মধ্য দিয়া স্টীমার চলে মাত্র প্রায় ৫০০ কিঃমিঃ। অথচ এদেশে নদী ও খালের মধ্য দিয়া মোট প্রায় ১০,০০০ কিঃমিঃ স্টীমার, লঞ্চ চলাচলের ব্যবস্থা করা সম্ভব। **কলিকাতা** হইতে ভাগীরথী-হুগলি নদীর মধ্য দিয়া দক্ষিণদিকে গিয়া সুন্দরবন ও বাংলাদেশ হইয়া **ব্রহ্মপুত্রের** মধ্য দিয়া আসামের ডিব্রুগড় পর্যন্ত প্রায় সারা বৎসর স্টীমার চলে। আর কলিকাতা হইতে **ভাগীরথী-হুগলির** মধ্য দিয়া উত্তরদিকে গিয়া **গঙ্গা নদীর** মধ্য দিয়া উত্তর প্রদেশের **কানপুর** পর্যন্ত বর্ষা কালে স্টীমার চলে। তাহাছাড়া কেরালা ও উড়িষ্যার উপকূল অঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে এবং অন্য কয়েকটি স্থানে বড় বড় খালে প্রায় সারা বৎসর নৌকা ও লঞ্চ চলে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন নৌপথে আসামের চা, কাঠ, পশ্চিমবঙ্গের কয়লা, কাঠ, পাট, বিহার ও উত্তর প্রদেশের চিনি, কার্পাস, তামাক, বিহার ও উড়িষ্যার কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়। আর দক্ষিণ ভারতের নৌপথে অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুর কার্পাস, তামাক, চীনাবাদাম, কেরালার কাঠ, নারিকেল প্রভৃতি পরিবহন করা হয়।

(ii) **উপকূল পথ**—এদেশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে আছে **১০টি বড় বা প্রথম শ্রেণীর** বন্দর। যেমন, পশ্চিম উপকূলে কান্দলা, বোম্বাই, মর্মুগাঁও, নিউ ম্যাঙ্গালোর ও কোচিন এবং পূর্ব উপকূলে কলিকাতা (হলদিয়া সহ), পারাদীপ, বিশাখাপটনম্, মাদ্রাজ ও টুটিকোরিন। ইহাদের মধ্যে বোম্বাই বৃহত্তম। তাহাছাড়া এদেশে আছে প্রায় ১৪০টি মাঝারি ও ছোট বন্দর। বহু নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার ও কতক জাহাজ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত করে।

(iii) **সমুদ্রপথ**—এদেশের ১০টি প্রথম শ্রেণীর বন্দর হইতে দেশী ও বিদেশী জাহাজের সাহায্যে এদেশের মানুষ **বিভিন্ন দেশে** যাতায়াত করে। আর এসকল বন্দরের মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশের সহিত এদেশের বাণিজ্য চলে। এদেশের **রপ্তানি দ্রব্যের** মধ্যে চা, পাটের চট, থলে, কার্পাস বস্ত্র, পোশাক, আকরিক-তৈল,

মাছ, চামড়ার তৈরী জিনিস, যন্ত্রপাতি ও কলকবজা, লৌহ আকরিক, কার্পাস তুলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আর এদেশের **আমদানি দ্রব্যের** মধ্যে নানাপ্রকার আকরিক তৈল, তৈলজাত জিনিস, কলকবজা, যন্ত্রপাতি, সার, ভেষজ তৈল, খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি প্রধান।
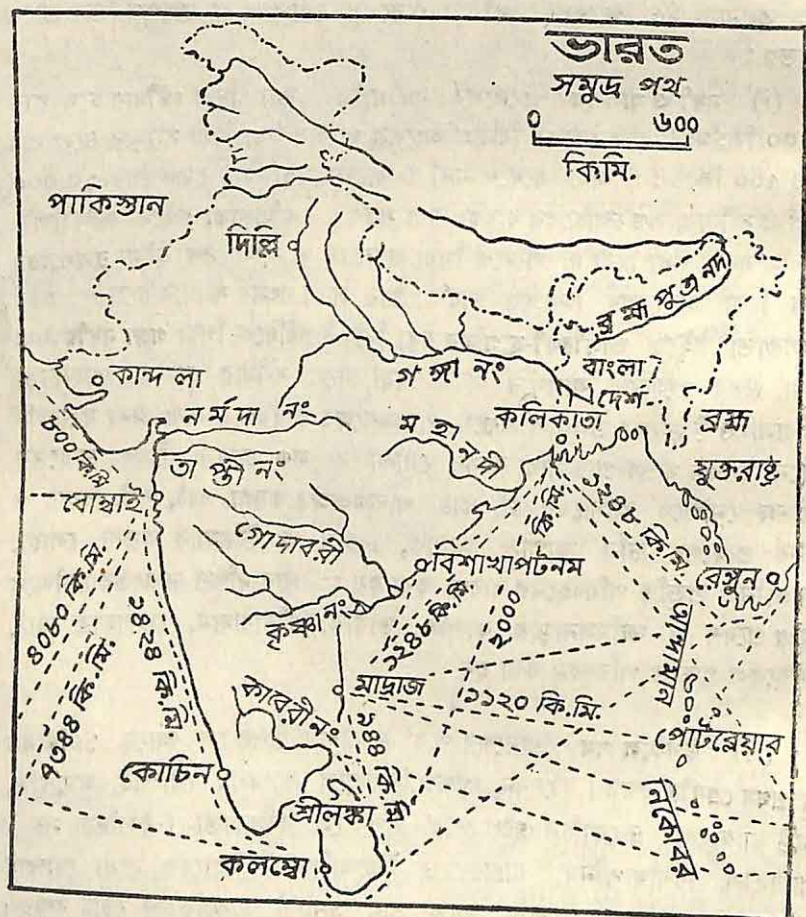
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে নিকটবর্তী বৃহৎ বন্দরসমূহের পথের দূরত্ব

(৪) **বিমানপথ—দিল্লী** (পালাম বা ইন্দিরা), **বোম্বাই** (সান্তাক্রুজ), **কলিকাতা** (দমদম) ও **মাদ্রাজ** (মীনম্বকম) এদেশের চারিটি **আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর**। এসকল বিমানবন্দর হইতে **এয়ার ইণ্ডিয়ার** বড় বড় বিমানপোত অন্ততঃ ৩০টি দেশে নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করে। পৃথিবীর বহু দেশের বিমান-পোতও এসকল বিমানবন্দরে নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করে। তাহাছাড়া এদেশে

আছে প্রায় ১০০টি মাঝারি ও ছোট বিমানবন্দর। এই সকল বন্দর হইতে **ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্-এর** বিমানপোত দেশের বিভিন্ন অংশে এবং আশপাশের বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল প্রভৃতি দেশে নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করে। এখন দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে অল্প দূরত্বে যাইবার জন্য **বায়ুদূতও** চলাচল করে।
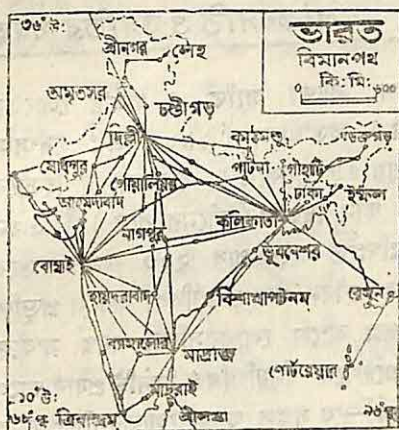
এখন এদেশের **বিমানপোত** ১৯৫০ খ্রীঃ তুলনায় তিন গুণের বেশী পথ (১৯৮৪ খ্রীঃ ১০.২ কোটি কিঃমিঃ) যাতায়াত করে। এদেশের বিমানপোতের মাধ্যমে ১৯৮৪ খ্রীঃ এক কোটির বেশী **মানুষ** এবং ২.১ **লক্ষ টনের** বেশী জিনিস **পরিবহন** করা হয়।

অনুশীলনী

১। ভারতের স্থলপথ কয়টি প্রধান ভাগে বিভক্ত? কোন্ বিভাগ সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ? কোন্ কোন্ জাতীয় সড়ক পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া বিস্তৃত? ২। যাত্রী ও মাল পরিবহন সম্পর্কে এদেশের রেলপথের গুরুত্ব কিরূপ? এদেশের রেলপথ কয়টি অঞ্চলে বিভক্ত? এদেশের রেলপথের কোন্ কোন্ অঞ্চলের কেন্দ্র কলিকাতা? ৩। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের কতটুকু পর্যন্ত কলিকাতা হইতে নৌপথে যাতায়াত করা যায়? এদেশের কোন্ কোন্ জিনিস নৌপথে অধিক পরিবহন করা হয়? এদেশের কোন্ কোন্ জিনিস সমুদ্রপথে অধিক আমদানি, রপ্তানি হয়? ৪। যাত্রী ও মাল পরিবহন সম্পর্কে ভারতের বিমানপথের গুরুত্ব কিরূপ?

সপ্তদশ অধ্যায়

লোকবসতি ও বসতির ঘনত্ব

ভারত মহামানবের মিলনস্থল—এদেশ বিভিন্ন **জাতি** ও **ধর্মের** লোকের বাসভূমি ; সকলেরই **পরিচয় ভারতবাসী**। বর্তমানে (১৯৮১ খ্রীঃ সেন্সাস অনুসারে) ভারতের মোট লোকসংখ্যা প্রায় ৬৮·৪ কোটি। লোকসংখ্যা হিসাবে পৃথিবীর দেশসমূহের মধ্যে ভারতের স্থান **দ্বিতীয়** (চীনের পরে)। এখন এদেশে লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃমিঃতে গড়ে প্রায় ২২০ জন। তবে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মানুষের জীবন ধারণ, জীবিকা অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য খুব বেশী। ফলে, বিভিন্ন অংশে লোকবসতির ঘনত্ব সম্বন্ধে পার্থক্যও খুব বেশী। তদনুসারে এদেশকে নিম্নলিখিত **তিনটি প্রধান ভাগে** বিভক্ত করা যায়। (১) **ঘন বসতি অঞ্চল**—যে সকল স্থানে লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃমিঃতে গড়ে ২২০-এর বেশী, (২) **মধ্যম বসতি অঞ্চল**—যেখানে লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃমিঃতে গড়ে ১০০ হইতে ২২০-এর মধ্যে এবং (৩ **নিম্ন বসতি অঞ্চল**—যেখানে লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃমিঃতে গড়ে ১০০-এর কম।

(১) **ঘন বসতি** (High density) **অঞ্চল**—ভারতের প্রায় ২৮% স্থানে **আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক বেশী**। **উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ সমভূমি** এবং পূর্ব ও পশ্চিম **উপকূলের সমভূমির** অনেক জায়গা এরূপ ঘন বসতি অঞ্চলের অন্তর্গত। এসকল স্থানে বসবাসের সুযোগ অধিক। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা অর্জনের সুবিধাও এসকল স্থানে বেশী। তাহাছাড়া মালপত্র পরিবহন এবং যাতায়াতের সুবিধাও এসকল স্থানে এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। **গঙ্গা-সমভূমির** অন্তর্গত উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের আয়তন (৫·৫ লক্ষ বর্গ কিঃমিঃ) ভারতের আয়তনের প্রায় ১৭%। কিন্তু এই তিন রাজ্যের লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ প্রায় ২৩½ কোটি) ভারতের জনসংখ্যার ৩৪% এর অধিক। উত্তর পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত সিন্ধুর সমভূমি অঞ্চলের অর্থাৎ হরিয়ানা ও পঞ্জাবের এবং পূর্বদিকে **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার** অন্তর্গত আসামের মিলিত আয়তন (১·৭ লক্ষ বর্গ কিঃমিঃ) ভারতের আয়তনের প্রায় ৫%। আর এই তিন রাজ্যের লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ প্রায় ৫ কোটি) ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৭%। কাজেই হরিয়ানা, পঞ্জাব ও আসামের লোক-বসতির ঘনত্ব গঙ্গা সমভূমির অন্তর্গত তিন রাজ্যের ঘনত্বের চেয়ে কম।

পূর্ব উপকূলের তামিলনাড়ু এবং **পশ্চিম উপকূলের** কেরালা ও গোয়ার মিলিত আয়তন (প্রায় ১·৭ লক্ষ বর্গ কিঃমিঃ) ভারতের আয়তনের প্রায় ৫%।

কিন্তু ইহাদের লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ প্রায় ৭½ কোটি) ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ১১%। কাজেই ইহাদের **লোকবসতির ঘনত্ব** গঙ্গা-সমভূমির তিন রাজ্যের জনবসতির ঘনত্বের চেয়ে সামান্য বেশী।

অতিঘন বসতি অঞ্চল—কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলের মধ্যে দিল্লী, চণ্ডীগড়, দমন, দিউ, পণ্ডিচেরী ও লক্ষ দ্বীপের লোকবসতির **ঘনত্ব অত্যন্ত অধিক**

(১৯৮১ খ্রীঃ প্রতি বর্গ কিঃমিঃতে ৭০৮ হইতে ৪১৭৮)। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি নগরের লোকবসতির ঘনত্ব আরও অধিক। কাজেই উপরিলিখিত স্থানগুলি **অতিঘন বসতি অঞ্চল**।

(২) **মধ্যম বসতি** (Medium density) **অঞ্চল**—এদেশের ৫৮% স্থানে বাস করে দেশের প্রায় ৪৬% মানুষ। এসকল স্থানে জায়গার **আয়তন**

ও লোকসংখ্যার অনুপাত দুইই মধ্যম রকম এবং এসকল স্থানে মানুষের জীবিকা অর্জনের সুযোগও মধ্যম রকম। তাই এসকল স্থানের **লোকবসতির ঘনত্ব দেশের গড় অবস্থার মত** বা তাহার চেয়ে কিছু কম। কাজেই এগুলি **মধ্যম বসতি অঞ্চল**। মহারাষ্ট্র, কর্ণটিক, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, গুজরাট, মধ্য
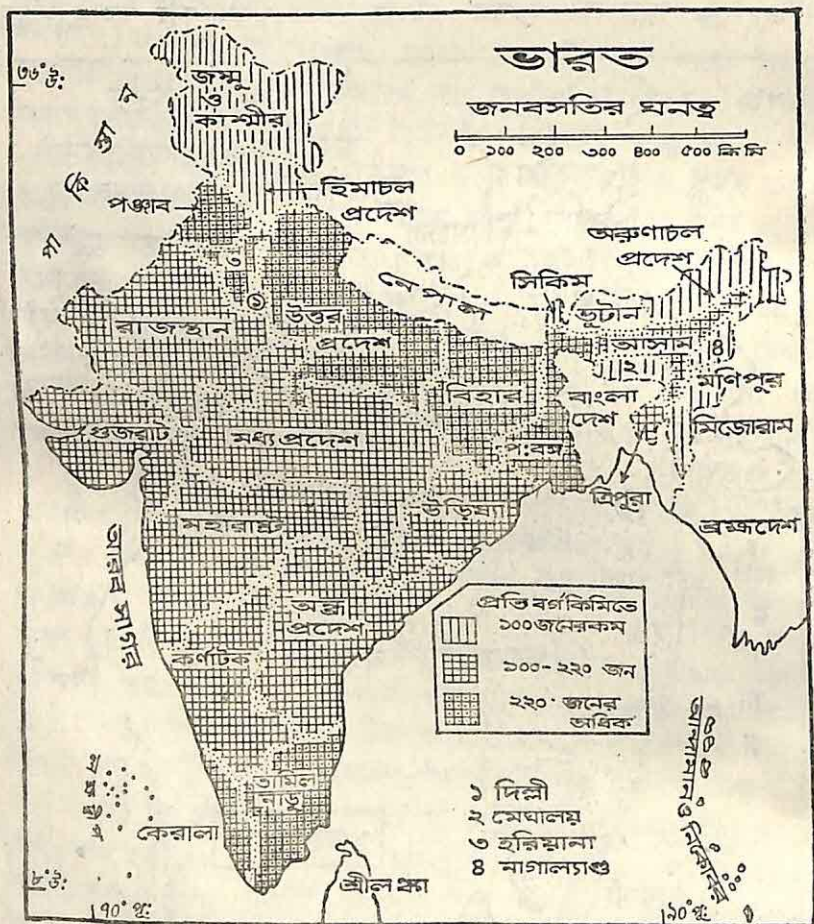
প্রদেশ ও রাজস্থান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। মধ্য প্রদেশ এদেশের বৃহত্তম রাজ্য ও রাজস্থান এদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য। এই দুই রাজ্যের আয়তন (প্রায় ৭·৯ লক্ষ বর্গ কিঃমিঃ) দেশের আয়তনের প্রায় ২৪%, অথচ এই দুই রাজ্যের লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ প্রায় ৮·৬ কোটি) দেশের জনসংখ্যার মাত্র ১২½%। এদেশের মধ্যম বসতি অঞ্চলে বসবাস, যাতায়াত, জীবিকা অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা বৃদ্ধি করিয়া এখানে যাহাতে আরও বেশী লোক বাস

করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। দেশের ঘন বসতি অঞ্চলে লোকবসতি যাহাতে আর খুব বেশী না বাড়ে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

(৩) **নিম্ন বা কম বসতি** (Low density) **অঞ্চল**—ভারতের মধ্যম ও ঘন বসতি অঞ্চলগুলির বাহিরে দেশের প্রায় ১৪% ভূভাগে বসবাস, জীবিকা অর্জন, যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ে অসুবিধা প্রচুর। সেজন্য এসকল স্থানে **আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম**। সুতরাং এসকল স্থান **নিম্ন বসতি অঞ্চলের** অন্তর্গত।

উত্তরদিকে **হিমালয় অঞ্চলের** অন্তর্গত হিমাচল প্রদেশ ও সিকিম এবং উত্তর-পূর্ব অংশের উচ্চভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর ও মেঘালয়ের আয়তন (১.২ লক্ষ বর্গ কিঃমিঃ) দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৪%। অথচ এই কয়টি রাজ্যের লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ ৮০ লক্ষ) দেশের মোট জনসংখ্যা ১%-এর সামান্য বেশী। এই সকল রাজ্যের **উচ্চ ভূপ্রকৃতি, ঘন বন** অধিক লোকবসতির পক্ষে অসুবিধাজনক। তাহার উপর এসকল স্থানে **যাতায়াত, পরিবহন ও জীবিকা অর্জন সম্পর্কে অসুবিধা** খুব বেশী। এসকল কারণই এখানকার এরূপ নিম্ন বসতির জন্য দায়ী।

অতিনিম্ন বসতি অঞ্চল—পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত জম্মু ও কাশ্মীর, অরুণাচল ও মিজোরাম এবং **দ্বীপ অঞ্চলের** অন্তর্গত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আয়তন (৩.৪ লক্ষ বর্গ কিঃমিঃ) দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১০%। অথচ ইহাদের লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ ৭৩ লক্ষ) দেশের জনসংখ্যার মাত্র ১%। ইহাদের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে লোকবসতি প্রতি বর্গ কিঃমিঃতে গড়ে ২৮ জন, অন্য তিন রাজ্যে লোকবসতি (১৯৮১ খ্রীঃ) প্রতি বর্গ কিঃমিঃতে ৭ হইতে ২৩ জন। ইহাদের কতক অংশ **জনহীন**। এসকল স্থানে লোকবসতি, যাতায়াত, জীবিকা অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে চরম অসুবিধা। সেজন্য এই রাজ্যগুলি **অতিনিম্ন বসতি অঞ্চল** রূপে গণ্য। এসকল স্থানের বিভিন্ন অসুবিধা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলে এসকল স্থানে লোকবসতি বাড়িবে। ইতিমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে বেশ কিছু মানুষ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। লোকবসতি বৃদ্ধির ফলে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নানা বিষয়ে উন্নতি হইতেছে। লোকবসতি বাড়িবার ফলে এদেশের অন্যান্য স্থানেরও যথেষ্ট উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৪৭ খ্রীঃ দেশ বিভাগের সময় ও পরে পূর্বদিকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমদিকে পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে আসিয়াছে। ইহার ফলে তখন এদেশের লোকসংখ্যা হঠাৎ খুব বেশী

বাড়িয়াছে। অবশ্য লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কতক অনুন্নত অংশের উন্নতির পক্ষেও যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

প্রত্যেক রাজ্যের লোকসংখ্যা ও বসতির ঘনত্ব পরিশিষ্ট অংশে দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী

১। ভারতে জনবসতির ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয় কেন? ১৯৮১-এর আদমসুমারী অনুসারে ভারতে জনবসতির ঘনত্ব কত? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬)। ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে কেন? ভারতের কোন্ রাজ্যে জনসংখ্যা সর্বাধিক? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৭)। ২। ভারতের জনসংখ্যা বণ্টনের উপর কি কি বিষয় প্রভাব বিস্তার করে আলোচনা কর। (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬, Ext) ৩। ভারতের কোন্ কোন্ রাজ্য ঘন বসতি অঞ্চলের অন্তর্গত? ভারতের কোন্ কোন্ রাজ্যে লোকবসতি মধ্যম ঘন? ৪। ভারতের কোন্ কোন্ রাজ্য নিম্ন বসতি অঞ্চলের অন্তর্গত? এসকল স্থানে লোকবসতি কম কেন? ৫। ভারতের কোন্ কোন্ রাজ্যে লোকবসতি অতিনিম্ন?

(ক) প্রধান নগর

ভারতের নিম্নলিখিত **বারটি নগরের** প্রত্যেকটির বর্তমান (১৯৮১ খ্রীঃ) লোকসংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক। এগুলি অন্যান্য বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

(১) **কলিকাতা**—পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে ভাগীরথী-হুগলি নদীর বাম বা পূর্ব তীরে কলিকাতা। ইহার উত্তর-দক্ষিণে নদীর দুই তীরে ভারতের **বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল**। ইহাকে **কলিকাতা শিল্পাঞ্চল** বা **হুগলী** (নদী) **শিল্পাঞ্চল** বলে। এই শিল্পাঞ্চলের লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ) ৯১·৬ লক্ষের অধিক (তন্মধ্যে কলিকাতাতে ৩২·৯ লক্ষের বেশী)। কলিকাতা **পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী** এবং দেশের **সর্বপ্রধান নগর ও দ্বিতীয় বন্দর**। ইংরেজ রাজত্বের সময় বহু বৎসর (১৭৫৭-১৯১১ খ্রীঃ) ইহা ভারতের রাজধানী ছিল। ইহাই এদেশের **সর্বপ্রধান নদী-বন্দর**। কলিকাতার প্রায় ৯০ কিঃমিঃ দক্ষিণে ভাগীরথী-হুগলির মোহনাতে **হলদিয়া**। এখানে কলিকাতার সহযোগী বন্দর স্থাপিত হইয়াছে। এখানে সারা বৎসর সমুদ্রগামী জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে। আসাম হইতে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল কলিকাতা বন্দরের পশ্চাৎভূমি। অর্থাৎ এসকল রাজ্যের আমদানি ও রপ্তানি—দুই প্রকার বহির্বাণিজ্যই কলিকাতা (হলদিয়া সহ) বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কলিকাতা (দমদম) একটি **আন্তর্জাতিক** বিমান-বন্দর। ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন এই দুইটি রেলওয়ে অঞ্চলের প্রধান কার্যালয় কলিকাতাতে। এখানে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানকার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল, হাইকোর্ট, যাদুঘর প্রভৃতি বিখ্যাত। ইহা ভারতের পাটশিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। এখানে কার্পাস বস্ত্র, রাসায়নিক, ইলেকট্রনিক, সিনেমা শিল্প প্রভৃতিও বিশেষ উন্নত।

(২) **বোম্বাই** বা **মুম্বাই**—আরব সাগরের পূর্ব উপকূলে ক্ষুদ্র **বোম্বাই দ্বীপে** বোম্বাই নগর অবস্থিত। ইহা সেতু দ্বারা মূল ভূভাগের সহিত যুক্ত। ইহা **মহারাষ্ট্রের রাজধানী** ও ভারতের **দ্বিতীয় নগর** এবং **সর্বপ্রধান বন্দর**। ইহা একটি **স্বাভাবিক সুগভীর** বন্দর। প্রায় সমগ্র পশ্চিম ভারত এখানকার পশ্চাৎভূমি। এসকল স্থানের অধিকাংশ বৈদেশিক বাণিজ্য বোম্বাই বন্দরের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হয়। বোম্বাই নগর ও বন্দরের আশপাশ ভারতের **দ্বিতীয় শিল্পাঞ্চল**। এখানকার লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ) প্রায় ৮২·৩ লক্ষ। বোম্বাই (সান্তাক্রুজ) একটি **আন্তর্জাতিক** বিমান-বন্দর। সেণ্ট্রাল ও ওয়েস্টার্ন এই দুইটি রেলওয়ে অঞ্চলের প্রধান কার্যালয় ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় বোম্বাইতে অবস্থিত। ইহা

ভারতের কার্পাস বস্ত্র ও সিনেমা শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক, আণবিক শক্তি, সার প্রভৃতি শিল্পও বিশেষ উন্নত।

(৩) **দিল্লী**—যমুনা নদীর ডান বা পশ্চিম তীরে দিল্লী অবস্থিত। ইহা **ভারতের রাজধানী** ও দেশের **তৃতীয় নগর**। প্রাচীন কালে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের সময়ও ইহা অনেক কাল ভারতের রাজধানী ছিল। এখানকার লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ) প্রায় ৫৭·১ লক্ষ। ইহার আশপাশ একটি বৃহৎ

শিল্পাঞ্চল। **প্রাচীন দিল্লীতে** মুঘল যুগের লাল কেল্লা (Red Fort), জামা মসজিদ প্রভৃতি প্রাচীন কীর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আর **নূতন দিল্লীতে** (New Delhi) আছে আধুনিক কালের রাষ্ট্রপতি ভবন, পার্লামেন্ট ভবন, সরকারী দপ্তরখানা প্রভৃতি। একটু দূরে প্রাচীন কুতুব মিনার অবস্থিত। দিল্লী (পালাম বা ইন্দিরা) ভারতের **প্রধান আন্তর্জাতিক** বিমানবন্দর। **সফদরজঙ্গেও**

একটি বিমানবন্দর আছে। নর্দান রেলওয়েজের কেন্দ্র ও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত। এখানে রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক প্রভৃতি শিল্প উন্নত।

(৪) **মাদ্রাজ**—ইহা **তামিলনাড়ুর রাজধানী** এবং দেশের **চতুর্থ নগর** ও বন্দর। ইহা বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ) প্রায় ৩২.৭ লক্ষ। ইহা একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। এই বন্দরের পশ্চাৎভূমি তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক রাজ্য। ইহাদের বৈদেশিক বাণিজ্য এই বন্দরের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হয়। মাদ্রাজ (মীনম্বক্কম্) একটি **আন্তর্জাতিক** বিমানবন্দর। মাদ্রাজে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানে তৈল শোধন, রেলগাড়ি নির্মাণ, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিমেন্ট শিল্প প্রভৃতি উন্নত।

(৫) **ব্যাঙ্গালোর**—দাক্ষিণাত্য মালভূমির দক্ষিণদিকের উচ্চ অংশে (উচ্চতা ৯১৬ মিঃ) ব্যাঙ্গালোর অবস্থিত। ইহা **কর্ণাটক** রাজ্যের **রাজধানী** ও দেশের **পঞ্চম নগর**। ইহা একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। এখানকার লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ) প্রায় ২৯.১ লক্ষ। এখানকার বিজ্ঞান গবেষণাগার বিখ্যাত। এখানে যন্ত্রপাতি ও বিমানপোত নির্মাণ, ইলেকট্রনিক, ঘড়ি নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প উন্নত।

(৬) **হায়দরাবাদ**—কৃষ্ণার উপনদী মুসীর ডান বা দক্ষিণ তীরে হায়দরাবাদ অবস্থিত। ইহা **অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী ও সমগ্র দেশের ষষ্ঠ নগর**। তবে ইহা দাক্ষিণাত্য **মালভূমি অঞ্চলের সর্বপ্রধান নগর**। এখানকার লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ) প্রায় ২৫.৩ লক্ষ। এখানে বিমানবন্দর, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈদ্যুতিক, ইলেকট্রনিক প্রভৃতি শিল্প উন্নত।

(৭) **আহ্মদাবাদ**—গুজরাট রাজ্যে খাম্বাট (কাম্বে) উপসাগরের সামান্য উত্তরে ইহা অবস্থিত। সবরমতী নদীর দুই তীরে আহ্মদাবাদ নগর বিস্তৃত। ইহা দেশের **সপ্তম নগর** এবং **কার্পাস বস্ত্র শিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র**। ইহাকে ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার'ও বলা হয়। এখানে পেট্রোকেমিক্যাল, ইলেকট্রনিক, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্পও উন্নত। এখানকার লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ) প্রায় ২৫.১ লক্ষ।

(৮) **কানপুর**—উত্তর প্রদেশে গঙ্গার ডান বা দক্ষিণ তীরে কানপুর অবস্থিত। ইহা দেশের **অষ্টম নগর**। কিন্তু ইহা ঐ **রাজ্যের সর্বপ্রধান নগর** ও বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং, কার্পাস বস্ত্র, সার, চর্মশিল্প প্রভৃতি উন্নত। এখানকার লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ) প্রায় ১৬.৯ লক্ষ।

(৯) **পুণে (পুণা)**—পশ্চিমঘাট পর্বতের ভোরঘাট গিরিপথের পাশে পুণা (পুণে) অবস্থিত। এখানকার উচ্চতা ৫০৮ মিঃ। ইহা **মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয়** ও

দেশের **নবম নগর**। এখানকার প্রাচীন দুর্গ, ঐতিহাসিক গবেষণাগার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এখানকার লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ) প্রায় ১৬.৯ লক্ষ।

(১০) **নাগপুর**—মহারাষ্ট্রের উত্তর অংশে গোদাবরীর উপনদী বেনগঙ্গার উপত্যকাতে ইহা অবস্থিত। ইহা **মহারাষ্ট্রের তৃতীয় ও ভারতের দশম নগর**। এখানকার লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ) প্রায় ১৩ লক্ষ। ইহা কার্পাস বস্ত্র, পূর্ত বা ইঞ্জিনিয়ারিং ও কাচ শিল্পের কেন্দ্র। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

(১১) **লক্ষ্নৌ**—উত্তর প্রদেশে গোমতী নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। ইহা একটি সুন্দর নগর (city of gardens and parks)। ইহা ঐ **রাজ্যের রাজধানী** ও একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং, কাগজ শিল্প প্রভৃতি উন্নত। এখানকার লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ) ১০ লক্ষের অধিক। ইহা ভারতের **একাদশ নগর**।

(১২) **জয়পুর**—ইহা **রাজস্থানের রাজধানী** ও প্রধান শিল্পকেন্দ্র। ইহা পাহাড়বেষ্টিত এবং সুন্দর পাথরের তৈরী। এই নগর (Pink city or Paris of India), বিশেষতঃ এখানকার রাজপ্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতি সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। ইহা ভারতের **দ্বাদশ নগর**। এখানকার প্রস্তর শিল্প উন্নত। এখানকার লোকসংখ্যা (১৯৮১ খ্রীঃ) ১০ লক্ষের অধিক।

(খ) প্রধান বন্দর

এদেশে **দশটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর** আছে। তাহাদের মধ্যে **বোম্বাই, কলিকাতা** (হলদিয়া সহ) **ও মাদ্রাজ,** এই তিনটি বন্দরের বিষয় উপরে আলোচিত হইয়াছে।

(৪) **কান্দলা**—গুজরাট রাজ্যে কচ্ছ উপসাগরের উত্তর-পূর্বদিকে পুরাতন 'কচ্ছের রন' অঞ্চলে কান্দলা বন্দর অবস্থিত। গুজরাট রাজ্য ইহার পশ্চাৎভূমি। কার্পাস (তুলা) ও কার্পাস বস্ত্র এখানকার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। ইহা এদেশে **বিনা শুল্কে বাণিজ্যের বা মুক্ত বাণিজ্যের** প্রথম বন্দর (Port of Free trade)।

(৫) **মর্মুগাঁও**—এ দেশের পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের সংযোগস্থলে **গোয়া** অবস্থিত। সম্প্রতি ইহা গভর্ণর-শাসিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। এদেশের গভর্ণর-শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে ইহা ক্ষুদ্রতম। তাহার পশ্চিম অংশে মর্মুগাঁও বন্দর। ইহা লৌহ আকরিক রপ্তানির বৃহৎ কেন্দ্র।

(৬) **নিউ ম্যাঙ্গালোর**—কর্ণাটকের পশ্চিম উপকূলে নিউ ম্যাঙ্গালোর বন্দর অবস্থিত। ঐ রাজ্য ইহার পশ্চাৎভূমি। কাঠ, কার্পাস, বস্ত্র প্রভৃতি এখানকার প্রধান রপ্তানিদ্রব্য।

(৭) **কোচিন**—কেরালার পশ্চিম উপকূলে কোচিন বন্দর অবস্থিত। ইহা **কেরালা** রাজ্যের **প্রধান নগর, বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র**। ঐ রাজ্য ইহার পশ্চাৎভূমি।

এখানকার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য কাঠ, নারিকেল তেল ও ছোবড়ার জিনিস। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

(৮) **পারাদীপ**—উড়িষ্যার পূর্ব উপকূলে পারাদীপ বন্দর অবস্থিত। ইহার পশ্চাৎভূমি বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য। নানাপ্রকার খনিজ সম্পদ্ এখানকার রপ্তানি দ্রব্য।

(৯) **বিশাখাপটনম্**—অন্ধ্র প্রদেশের পূর্ব উপকূলে বিশাখাপটনম্ বন্দর অবস্থিত। ইহার পশ্চাৎভূমি উড়িষ্যা ও অন্ধ্র প্রদেশ। নানারকম খনিজ সম্পদ্ এখানকার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। এখানকার জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র ও তৈল শোধনাগার প্রসিদ্ধ। ইহা ইস্পাত শিল্পেরও কেন্দ্র।

(১০) **টুটিকোরিন**—তামিলনাড়ু রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মান্নার উপসাগরের তীরে টুটিকোরিন বন্দর অবস্থিত। ইহা শ্রীলঙ্কার সহিত ভারতের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র।

অনুশীলনী

১। ভারতে দশ লক্ষের বেশী লোক-অধ্যুষিত নগর কয়টি ? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬, Ext) লোকসংখ্যা (অধিক হইতে কম) অনুসারে তাহাদের নাম লিখ। ২। ভারতে প্রথম শ্রেণীর বন্দর কয়টি ? পূর্ব উপকূলের প্রধান বন্দরগুলির নাম লিখ। পশ্চিম উপকূলের প্রধান বন্দরগুলির নাম লিখ। ৩। বোম্বাই বন্দরের পশ্চাৎভূমি কতদূর বিস্তৃত ? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬, Ext)। ৪। নিম্নলিখিত নগর ও বন্দরগুলির অবস্থিতি ও গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর :—বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, হায়দরাবাদ, কান্দলা, কানপুর, বিশাখাপটনম্, লক্ষ্নৌ।

তৃতীয় ভাগ

এশিয়া

ঊনবিংশ অধ্যায় | ভূপ্রকৃতি

পৃথিবীর মহাদেশসমূহের মধ্যে আয়তন ও লোকসংখ্যা, উভয় হিসাবে এশিয়ার স্থান প্রথম। এখানকার আয়তন পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের প্রায় ৩০%। আর এখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী বাস করে। এই মহাদেশের ভূপ্রকৃতি নিম্নলিখিত **পাঁচটি** প্রধান ভাগে বিভক্ত ঃ—

(১) **উত্তরদিকের সমভূমি অঞ্চল**—এশিয়ার পূর্ব সীমান্তে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পশ্চিমে উরল পর্বত ও উরল নদী পর্যন্ত **এশিয়ার সমগ্র** উত্তর অংশ **সমভূমি** অঞ্চল। উত্তর এশিয়ার এই বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চলের আয়তন এশিয়া মহাদেশের প্রায় ২০%। এই অঞ্চল পূর্ব হইতে পশ্চিমে ক্রমশঃ অধিক প্রশস্ত। তাই এই অঞ্চলের পশ্চিম অংশ অর্থাৎ পশ্চিম সাইবেরিয়ার সমভূমি আয়তনে বৃহত্তম। এই সমভূমির উপর দিয়া উত্তরদিকে বহিয়া গিয়াছে এশিয়ার তিন বৃহৎ নদী—**ওব, ইয়েনিসি ও লেনা**। তাহাদের মধ্যে উপনদী ইর্টিশ সহ **ওবের বা ওব-ইর্টিশের দৈর্ঘ্য এশিয়ার নদীগুলির মধ্যে প্রথম**। এই সমভূমির পশ্চিমদিকের কতক অংশ **জলাভূমি**। তাহার দক্ষিণে আছে **তুরান নিম্নাঞ্চল** (Turan basin)। এই সমভূমির পূর্বদিকের অংশ নিম্ন মালভূমি বা প্রায়-সমভূমি। ইহা **সাইবেরিয়ান শিল্ড** নামে পরিচিত। উত্তর এশিয়ার এই বিস্তীর্ণ সমভূমির জলবায়ু তীব্র শীতল। তাহাছাড়া এখানে আছে বিরাট তৈগা বনভূমি। সেজন্য এখানে লোকবসতি খুব কম, বহু স্থান জনহীন।

(২) **মধ্য এশিয়ার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল**—পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এশিয়ার সমুদয় মধ্য ভাগ পার্বত্য ভূমি। ইহাই **পৃথিবীর বৃহত্তম উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল**। এখানকার আয়তন এশিয়া মহাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ৩৫%। এই অঞ্চলের **মধ্য অংশ উচ্চতম**। একদিকে এখানকার ভূপ্রকৃতি অতি উচ্চ, অন্যদিকে এখানকার জলবায়ু তীব্র শীতল। ফলে এখানকার বহু অংশ জনহীন। এখানে জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তরে পামির গ্রন্থি অবস্থিত। ইহা **পৃথিবীর উচ্চতম** (৪৮৭৮ মিঃ) **মালভূমি ও** সবচেয়ে বড় পর্বতগ্রন্থি। তাই ইহাকে বলা হয় **'পৃথিবীর ছাদ'**।

পামির হইতে বিস্তৃত পর্বতসমূহ— পামির গ্রন্থি হইতে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব-দিকে গিয়াছে **কারাকোরম** পর্বত। তাহার **দক্ষিণদিক** দিয়া পূর্বদিকে গিয়াছে **হিমালয় পর্বতমালা**। পামির হইতে পূর্বদিকে গিয়াছে **কুনলুন সান, আল্টিনট্যাগ**

বা **আস্টিনট্যাগ, নান সান, সিনলিং সান** প্রভৃতি পর্বত। আর পামির হইতে উত্তর-পূর্বদিকে গিয়াছে **টিয়েন সান, আলটাই, সয়ান, য়্যাব্লোনাভ, স্ট্যানোভয়** প্রভৃতি পর্বত। পামির হইতে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়াছে **হিন্দুকুশ, সুলেমান** ও **খিরথর** পর্বত।
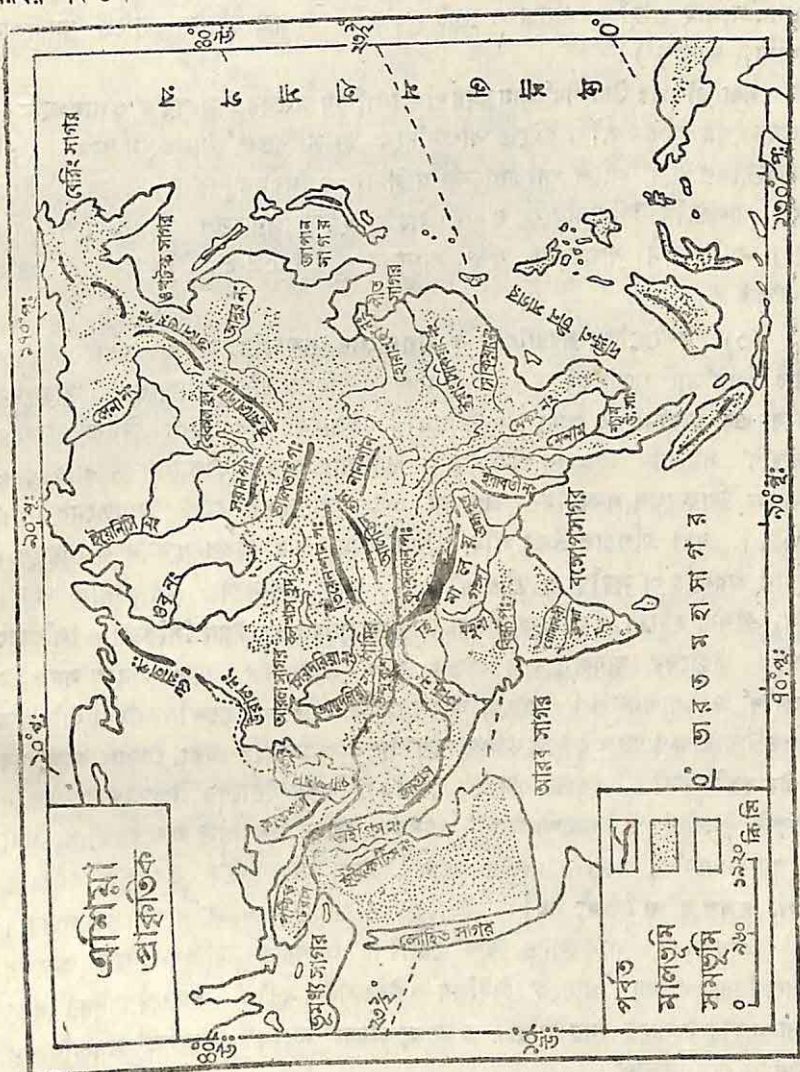
পর্বতসমূহের মধ্য ভাগের উচ্চ মালভূমি—হিমালয় ও কুনলুন সানের মাঝখানে তিব্বত মালভূমি অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর **বৃহত্তম উচ্চ** (৪২৬৮ মিঃ) মালভূমি। তাহার উত্তরে আছে **সিনকিয়াং মালভূমি**। এখানকার কতক অংশ

টাকলামাকান মরুভূমি। আরও উত্তরে **মঙ্গোলিয়া মালভূমি** অবস্থিত। তাহার কতক অংশ গোবি বা সামো মরুভূমি।

মধ্য এশিয়ার উচ্চ পর্বতসমূহের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের নিম্ন পর্বত ও মালভূমি—হিমালয়ের পূর্ব সীমা হইতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে গিয়াছে **পাটকই বুম, নাগা, লুসাই** প্রভৃতি পাহাড় ও ছোট পর্বত। আরও দক্ষিণে আছে **আরাকান য়োমা** (পাহাড়)।

মধ্য এশিয়ার উচ্চ পর্বতসমূহের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের নিম্ন পর্বত ও মালভূমি—হিমালয়ের পশ্চিম সীমা হইতে পশ্চিমদিকে আছে বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চল। এই মালভূমির পূর্ব অংশে পাকিস্তানের সুলেমান ও খিরথর পর্বত। এখান হইতে এই মালভূমি পশ্চিমদিকে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। উত্তর পশ্চিমদিকে ইহা কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের (Black Sea) মাঝখান পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৩) **নদীগুলির অববাহিকা ও উপকূলের সমভূমি অঞ্চল**—মধ্য এশিয়ার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল হইতে বহু নদ-নদী নানাদিকে বহিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে **ওব, ইয়েনিসি ও লেনা** উত্তরবাহিনী। ইহাদের অববাহিকা উত্তর এশিয়ার বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। এশিয়ার বাকী নদীগুলির অববাহিকা ও বিভিন্ন উপকূলের সমভূমির আয়তন এই মহাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ২০%। মধ্য এশিয়ার উত্তর সীমা হইতে আমুর নদী উত্তর-পূর্বদিকে গিয়াছে। ইহার অববাহিকা সঙ্কীর্ণ ও তীব্র শীতল। তাই এখানকার লোকবসতি কম। মধ্য এশিয়া হইতে পূর্বদিকে বহিয়া গিয়াছে **হোয়াংহো, ইয়াং সিকিয়াং ও সিকিয়াং** নদী। ইহাদের অববাহিকার কতক অংশ উচ্চভূমি। বাকী অংশে **সমভূমি বিস্তীর্ণ** ও শস্যশ্যামল। এরূপ অংশে লোকবসতি খুব বেশী। মধ্য এশিয়ার উচ্চভূমির দক্ষিণ অংশ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আসিয়াছে **মেকং, মেনাম, সালুয়েন ও ইরাবতী** নদী। ইহারা দৈর্ঘ্যে ছোট। কিন্তু ইহাদের উপত্যকার সমভূমি যথেষ্ট বিস্তীর্ণ ও শস্যশ্যামল। এসকল স্থানে জনবসতি খুব বেশী। মধ্য এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণ অংশ হইতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে **গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু** নদী। ইহাদের অববাহিকার সমভূমি অধিক বিস্তৃত। তাই এখানকার লোকবসতি খুব বেশী। এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে **টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস** নদী। তাহাদের উত্তর দিকে দিয়া বহিয়া গিয়াছে **সির দরিয়া ও আমু দরিয়া** নদী। ইহাদের অববাহিকার সমভূমি কম বিস্তীর্ণ।

উত্তর উপকূলের সমভূমি উত্তর এশিয়ার বিরাট সমভূমিরই অংশ। অন্যান্য **উপকূলেও সমভূমি** যথেষ্ট বিস্তীর্ণ। তবে এই সকল সমভূমির কতক অংশ

তথাকার বদ্বীপের অন্তর্গত। এই মহাদেশের বিভিন্ন অংশের নদীসমূহের অববাহিকাতে ও উপকূলের এসকল **সমভূমিতে** বাস করেন এই মহাদেশের ৮৫-৯০% **মানুষ**।

(৪) **দক্ষিণ এশিয়ার মালভূমি অঞ্চল**—এশিয়ার দক্ষিণ অংশে আছে তিনটি মালভূমি। ইহাদের আয়তন এশিয়া মহাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ২০%। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের আরব মালভূমি আয়তনে বড়। কিন্তু এখানকার অধিকাংশ মরুভূমি ও কতক স্থান জনহীন। অন্য দুই মালভূমির একটি **দাক্ষিণাত্য** মালভূমি। দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় মালভূমিটি ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বদিকের অংশ হইতে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। দাক্ষিণাত্য ও এই মালভূমিতে লোকবসতি যথেষ্ট বেশী।

(৫) **দ্বীপ অঞ্চল**—এশিয়ার চারিদিকে বহু দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ আছে। ইহাদের আয়তন এই মহাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ৫%। এশিয়ার পূর্ব-দিকের **জাপান**, দক্ষিণ-পূর্ব অংশের **মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া** ও **ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ** আয়তনে বড়। এগুলি অর্থনৈতিক বিষয়েও উন্নত। ইহাদের লোকবসতিও ঘন।

অনুশীলনী

১। ভূপ্রকৃতি অনুসারে এশিয়া মহাদেশকে কয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়? ভাগগুলির নাম কর। যে কোন একটি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির বিবরণ দাও। পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমির নাম কর। (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬, Ext)। ২। এশিয়ার উত্তরদিকের সমভূমি অঞ্চল কতদূর বিস্তৃত? এই বিভাগের প্রাকৃতিক অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ৩। মধ্য এশিয়ার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল কতদূর বিস্তৃত? পামির গ্রন্থি কোথায়? ইহাকে 'পৃথিবীর ছাদ' বলে কেন? পামির হইতে পূর্বদিকে ও উত্তর-পূর্বদিকে বিস্তৃত পর্বতগুলির নাম লিখ। এসকল পর্বতের মাঝখানের প্রধান মালভূমিগুলির নাম লিখ। ৪। এশিয়ার নদীগুলির অববাহিকা ও উপকূলের সমভূমি বর্ণনা কর। এই অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব কিরূপ? তাহা এরূপ ঘন কেন? ৫। এশিয়ার প্রধান দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জগুলির নাম লিখ।

মালয়শিয়া

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের সামান্য কতক স্থান লইয়া ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন **মালয়শিয়া** দেশের জন্ম। আয়তনে ইহা একটি ক্ষুদ্র দেশ। এদেশের আয়তন মাত্র প্রায় ৩.৩ লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ অর্থাৎ ইহা আয়তনে রাজস্থানের চেয়ে ছোট। আর এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ১.২ কোটি। অর্থাৎ এখানে বাস করে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার মাত্র প্রায় ২০% মানুষ। এদেশের দুইটি অংশ—**পশ্চিম মালয়শিয়া ও পূর্ব মালয়শিয়া**। তাহাদের মধ্যে লোকবসতি, অর্থনৈতিক উন্নতি, যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে পার্থক্য খুব বেশী।

অবস্থিতি ও আয়তন—মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশ **পশ্চিম মালয়শিয়া** (Penisular Malaysia)। এখানকার আয়তন প্রায় ১.৩ লক্ষ বর্গ কিঃমিঃ। অর্থাৎ এদেশের আয়তনের প্রায় ৪০% পশ্চিম মালয়শিয়া। আর তাহার পূর্বদিকে বৃহৎ বোর্নিও দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম অংশের **সারাওয়াক** ও উত্তর অংশের **সাবাহ** মিলিয়া **পূর্ব মালয়শিয়া** গঠিত। এখানকার আয়তন প্রায় ২ লক্ষ বর্গ কিঃমিঃ। অর্থাৎ মালয়শিয়ার আয়তনের প্রায় ৬০% পূর্ব মালয়শিয়া। তাহার মধ্যে সারাওয়াকের আয়তন পশ্চিম মালয়শিয়ার চেয়ে সামান্য কম।

ভূপ্রকৃতি ও নদী—**পশ্চিম মালয়শিয়ার** মধ্য ভাগ দিয়া কয়েকটি **নীচু পাহাড়** প্রায় উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এখানকার **নদীগুলিও** প্রধানতঃ তাহাদের ফাঁক দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এখানকার পূর্ব ও পশ্চিম দুই **উপকূলেই** আছে

সংকীর্ণ সমভূমি। তথাকার কতক অংশ **নিম্নভূমি ও জলাভূমি**। **পূর্ব মালয়শিয়াতেও** আছে অনেক **পাহাড়**। তাহাদের মধ্যে **পেনাম্বো রেঞ্জ** বৃহত্তম।

তাহার উচ্চতম **শৃঙ্গ কিনাবালু** (৪১৭৫ মিঃ)। পূর্ব মালয়শিয়াতেও অনেক **নদী** আছে। তাহাদের মধ্যে **রাজাঙ্গা** সবচেয়ে বড়। সারাওয়াকের পশ্চিমদিকের অর্ধেক অংশ **সমভূমি**, কিন্তু সাবাহের মাত্র উত্তর উপকূলে আছে **সমভূমি**।

জলবায়ু—এই দেশ নিরক্ষরেখার সামান্য উত্তর হইতে প্রায় ৭১/৪° উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এদেশের এই প্রকার অবস্থিতির জন্য এখানকার **জলবায়ু নিরক্ষীয় প্রকৃতির**। অর্থাৎ এখানকার জলবায়ুর অবস্থা **সারা বৎসরই উষ্ণ ও আর্দ্র**। এখানে শীত বা গ্রীষ্ম কাল নাই। তবে প্রতিদিন ভোর বেলার অবস্থা **আরামদায়ক**। বেলা বাড়িবার **সঙ্গে সঙ্গে** এখানে ক্রমশঃ উষ্ণতা বাড়ে। **দুপুরের পর** এখানে **বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রচুর** পরিমাণে **বৃষ্টি হয়**। এই দেশ নিরক্ষ-রেখার এত কাছে বলিয়া এখানকার বৃষ্টি **পরিচলন বৃষ্টি**। এখানে বৈকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে। আর এখানে **রাত্রিতে** মৃদু শীত। ফলে, এখানে মানুষ কাজ করে **সকালে ও বিকালে**। এই দেশ সমুদ্র দ্বারা প্রায় পরিবেষ্টিত। তাই এখানকার জলবায়ু আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ুর মত অস্বাস্থ্যকর নয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ—মালয়শিয়া দেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর জন্য সমগ্র দেশের প্রায় ৭৫% **বনময়**। পূর্ব মালয়শিয়ার অধিকাংশ বনভূমি। পশ্চিম মালয়শিয়াতে বন কম। এরূপ জলবায়ুর জন্যই এদেশে **বন খুব ঘন**। **সমগ্র** দেশের অধিকাংশ গাছ **প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ** জাতীয়। **এদেশ** হইতে প্রচুর **কাঠ, প্লাইউড** প্রভৃতি **রপ্তানি** হয়। পূর্ব মালয়শিয়ার মোট রপ্তানি দ্রব্যের প্রায় ৭০% কাঠ।

মালয়শিয়ার একটি ধীবর (জেলে) পল্লী

ভূমির ব্যবহার ও কৃষিজ সম্পদ—পশ্চিম মালশিয়ার মধ্য ভাগে আছে **রবার, পাম** ও **চায়ের** বহু আবাদ। আর উপকূলে **নারিকেলের** আবাদ বহু দূর বিস্তৃত। এদেশে উৎপন্ন হয় **পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী** অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় ৪৫% **রবার**। এখান হইতে বাৎসরিক ১৭ লক্ষ টনের অধিক **রবারের রস** (latex) ও প্রায় ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড **চা রপ্তানি হয়**। পূর্ব মালশিয়াতেও রবারের বহু আবাদ আছে।

খনিজ সম্পদ—পশ্চিম মালয়শিয়াতে টিন উৎপাদনের পরিমাণ **পৃথিবীতে প্রথম**। এখানে পৃথিবীর প্রায় ৪০% টিন পাওয়া যায়। এখানকার **সেলাঙ্গার** টিন খনি বিখ্যাত। মালয়শিয়াতে বক্সাইট, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ট্যাংস্টেন প্রভৃতিও পাওয়া যায়।

প্রাণিজ সম্পদ—এদেশের উপকূলে প্রচুর মাছ ধরা হয়। কাজেই উপকূলে অনেক ধীবর পল্লী আছে। এদেশের বহু লোকের প্রধান জীবিকা মাছ ধরা ও নাবিকের কাজ।

লোকবসতি—এদেশের মোট **জনসংখ্যা** প্রায় **১·২ কোটি**। ফলে, এদেশে লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমিতে গড়ে মাত্র ৩০-৩৫ জন। **পশ্চিম মালয়শিয়াতে** জীবিকা অর্জন, যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধা বেশী। সেজন্য এখানকার **লোকসংখ্যা** প্রায় **৯৮ লক্ষ**। অর্থাৎ এদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৮৫% এই অংশে বাস করে। তাহাদের **আর্থিক অবস্থাও খুব ভাল**। এখানকার অধিবাসিগণ **মিশ্র জাতির**। তাহাদের মধ্যে মালয় জাতি প্রায় অর্ধেক। তাহার পর চীন, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হইতে আগত অধিবাসীদের স্থান। ইহাদের সংখ্যা এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০%। **পূর্ব মালয়শিয়াতে লোকসংখ্যা খুব কম**। এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫% এখানে বাস করে।

পশ্চিম মালয়শিয়ার প্যাগোডা

যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা—পশ্চিম মালয়শিয়ার দক্ষিণ সীমার দক্ষিণে **সিঙ্গাপুর** একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য। ইহা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম বন্দর। তথা হইতে **স্থলপথ, রেলপথ ও বিমানপথ** পশ্চিম মালয়শিয়ার উপর দিয়া উত্তরদিকে বিস্তৃত। এদেশে ও আশপাশে **নৌপথ** বিশেষ উন্নত।

নগরাদি—পশ্চিম মালয়শিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে **কুয়ালালামপুর** অবস্থিত। ইহা এদেশের **রাজধানী** ও **প্রধান নগর**। এখানে ও দেশের নানা স্থানে বহু সুন্দর বৌদ্ধমন্দির বা প্যাগোডা আছে। রাজধানী কুয়ালালামপুরের পাশে অবস্থিত **কেলাঙ্গ** একটি বড় বন্দর। এদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে **পেনাং স্টেট**। এখানকার **জর্জ টাউন** একটি বড় শহর ও বন্দর।
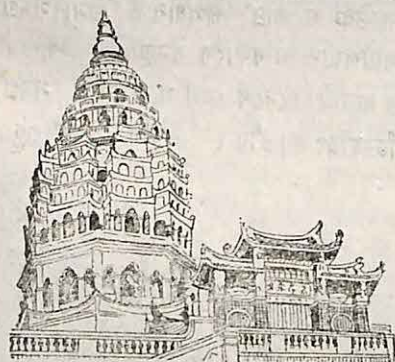
অনুশীলনী

১। মালয়শিয়ার জলবায়ু কিরূপ ? এরূপ জলবায়ুর সহিত তথাকার মানুষের কাজের সময়ের সম্পর্ক উল্লেখ কর। ২। এদেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে উদ্ভিদ্, কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের পার্থক্য উল্লেখ কর। ৩। এদেশের কোন্ অংশে লোকবসতি অধিক ? তাহাদের জাতি, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য ?

অবস্থিতি, আকৃতি ও আয়তন—ভারতের সামান্য পশ্চিমে **ইরান দেশ**। ১৯৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত এদেশের নাম ছিল **পারস্য**। এদেশের আকৃতি প্রায় চতুষ্কোণ এবং আয়তন প্রায় ১৬·৫ লক্ষ বর্গ কিঃমিঃ। অর্থাৎ এদেশের আয়তন ভারতের আয়তনের প্রায় অর্ধেক।

ভূপ্রকৃতি ও নদ-নদী—এদেশের অধিকাংশ **মালভূমি**। তাহার প্রায় উত্তর সীমান্তে **এলবুর্জ পর্বত**। ইহা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। তাহার **সর্বোচ্চ শৃঙ্গ দেমাভেন্দ** (৫৬০৪ মিঃ)। এদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে **জাগ্রস** পর্বত। ইরানের বিভিন্ন অংশে আছে কতক **নিম্নভূমি** ও লোনা জলের **হ্রদ**। এদেশের হ্রদের মধ্যে **রিজাইয়ে বড়। কারথেক** এদেশের এক মাত্র বড় **নদী**। তাহা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। ইহা খাল দ্বারা ইরাকের সাত-এল-আরবের সহিত যুক্ত। এদেশের উত্তর ও দক্ষিণ **উপকূলে** আছে সঙ্কীর্ণ **সমভূমি**।

জলবায়ু—এদেশের অধিকাংশ স্থানের জলবায়ু **মরু প্রকৃতির**। অর্থাৎ এখানে **গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা খুব বেশী** (দক্ষিণ অংশে ৫০° সেঃ পর্যন্ত)। অথচ **শীতকালে** এদেশে উষ্ণতা এত কম যে তখন **পর্বত অঞ্চলে তুষারপাত হয়**। এদেশের বহু স্থান **প্রায় বৃষ্টিহীন। উত্তর উপকূলে শীতকালে বৃষ্টি কিছু বেশী।**

স্বাভাবিক উদ্ভিদ—এদেশের অধিকাংশ স্থানের জলবায়ু মরু প্রকৃতির। সেজন্য দেশের বিস্তীর্ণ অংশে আছে **নিকৃষ্ট তৃণভূমি** ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। **উত্তর উপকূলে বৃষ্টির ফলে গাছপালা কিছু অধিক।**

ভূমির ব্যবহার ও কৃষিজ সম্পদ—এদেশের উত্তর ও দক্ষিণ **উপকূলের সমভূমিতে** ও পাহাড় পর্বতের উপত্যকাতে জলসেচের সাহায্যে **চাষ-আবাদ** হয়। এদেশের ফসলের মধ্যে **গম, আঙ্গুর, ডুমুর** প্রভৃতি প্রধান। এসকল স্থানে **তুঁতগাছও** জন্মে প্রচুর।

খনিজ সম্পদ—এদেশে **খনিজ তৈল** উৎপাদনের পরিমাণ **পৃথিবীতে চতুর্থ** (১৯৭৯ খ্রীঃ পঞ্চম)। এদেশের **দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ** তৈল **উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল। আবাদান** ও আশপাশ তাহার প্রধান কেন্দ্র। তথায় প্রচুর **প্রাকৃতিক গ্যাসও** পাওয়া যায়। এদেশের উত্তর অংশে পার্বত্য অঞ্চলে **মূল্যবান পাথর** এবং দক্ষিণে পারস্য উপসাগরে **মুক্তা** পাওয়া যায়।

শিল্পসম্ভার—সুন্দর কার্পেট, গোলাপের আতর প্রভৃতি এদেশের **প্রাচীন**

শিল্প। এগুলি এখনও যথেষ্ট উন্নত। এদেশে **আধুনিক বৃহৎ শিল্পও** বিশেষ উন্নত। তাহাদের মধ্যে তৈল শোধন, চিনি, লৌহ ও ইস্পাতের জিনিস, বিশেষতঃ মোটরগাড়ি এবং চর্ম, চা প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য।

লোকবসতি—এদেশের লোকসংখ্যা ৩ কোটির বেশী। তবে দেশের আয়তনের তুলনায় এই সংখ্যা কম। সেজন্য এখানে লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃমিঃতে গড়ে মাত্র প্রায় ২০ জন। এদেশের বহু স্থান মরুপ্রায় এবং লোকবসতির পক্ষে প্রায় অযোগ্য। ঐ সকল স্থান প্রায় **জনহীন**। এদেশের উত্তর ও দক্ষিণ উপকূলে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে তৈল খনি অঞ্চলে লোকবসতি বেশী।
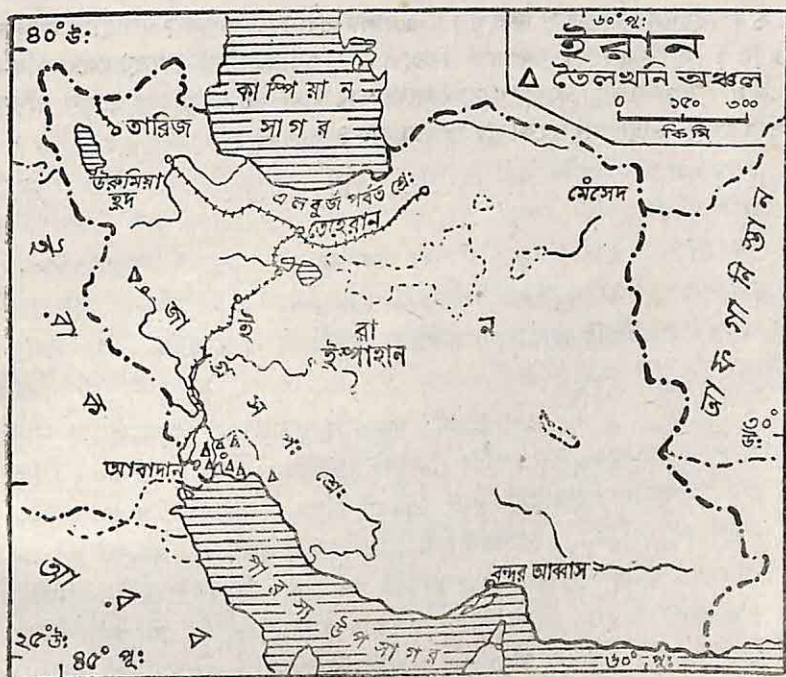
যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা—এদেশের উত্তর ও দক্ষিণ উপকূলে এবং দেশের রাজধানী ও অন্যান্য বৃহৎ নগরের আশপাশে যাতায়াত ব্যবস্থা **উন্নত ধরনের**। এদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে তৈল খনি অঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা বিশেষ উন্নত।

নগরাদি—এদেশের উত্তর অংশে এলবুর্জ পর্বতের পাদদেশে **তেহরান** অবস্থিত। ইহা এদেশের **রাজধানী ও প্রধান নগর**। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ। দেশের মধ্য ভাগে **ইস্ফাহান** অবস্থিত। ইহা দেশের প্রাচীন রাজধানী ও একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৬·৭ লক্ষ।

এদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের **তাব্রিজ** (অধিবাসী প্রায় ৬ লক্ষ) ও উত্তর-পূর্ব অংশের **মেসেদ** বা **মাসাদ** (লোকসংখ্যা প্রায় ৬'৭ লক্ষ) বৃহৎ নগর ও শিল্প-কেন্দ্র। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমাতে **আবাদান** অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। ইহা দেশের প্রধান বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। দেশের বৃহত্তম তৈল শোধনাগার এখানে অবস্থিত।

অনুশীলনী

১। ইরানের ভূপ্রকৃতি কিরূপ? এদেশের প্রধান পর্বত কি? তাহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কি? ২। এদেশের জলবায়ু কিরূপ? ৩। এদেশের কোন্ অংশে অধিক কৃষিকার্য হয়? তথায় কোন্ কোন্ ফসলের চাষ হয়? ৪। এদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ্ কি? তাহা অধিক কোথায় পাওয়া যায়?

চতুর্থ ভাগ

আফ্রিকা

দ্বাবিংশ অধ্যায় | ভূপ্রকৃতি

আফ্রিকা আয়তনে পৃথিবীর **দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ**। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় ২০% এই মহাদেশের অন্তর্গত। কিন্তু এখানকার প্রায় ৯০% ভূভাগ **নিম্ন মালভূমি** (Plateau continent)। তার উপর এখানে আছে পৃথিবীর বৃহত্তম **মরুভূমি,** আবার কতক অংশে আছে অতিশয় **ঘন বন**। এসকল কারণে আয়তনের তুলনায় আফ্রিকাতে লোকবসতি কম। এখানকার বহু স্থান মানুষের যাতায়াত ও বসতির পক্ষে প্রায় অযোগ্য। এসকল জায়গার অবস্থা বা খবরাদি বহু দিন বাহিরের মানুষের অজানা ছিল। প্রধানতঃ এজন্যই ইওরোপের লোকেরা ইহাকে বলিত **অন্ধকার মহাদেশ**। এখানকার বেশীর ভাগ জায়গাই বহু দিন ছিল ইওরোপের কয়েকটি দেশের অধীন। এখন এখানকার দেশগুলি স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর ইহারা **উন্নতির পথে** দ্রুত-তালে আগাইয়া চলিয়াছে।

আফ্রিকার **ভূপ্রকৃতি** নিম্নলিখিত **চারি ভাগে** বিভক্ত :—

(১) **উত্তর-পশ্চিম অংশের পার্বত্য অঞ্চল**—আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম অংশ ক্ষুদ্র **আটলাস পর্বত অঞ্চল**। এখানে তিনটি প্রায় সমান্তরাল ভঙ্গিল পর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। সকলের উত্তরে আছে **টেল আটলাস**। মধ্য ভাগে আছে **গ্রেট আটলাস** বা **হাই আটলাস**। তথাকার **সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জেবেল লিকুম্‌ট** (৪৫৮৫ মিঃ উঁচু)। এখানকার দক্ষিণে আছে **সাহারন্ আটলাস** বা **য়্যান্টি আটলাস**। তাহার দক্ষিণ দিকে কতক লোনা জলের **হ্রদ** ও **জলাভূমি** আছে। ঐ অংশকে বলে **শটস্**।

(২) **উত্তর আফ্রিকার নিম্ন মালভূমি অঞ্চল**—আফ্রিকার সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত অঞ্চল এই মহাদেশের মধ্য ভাগে নিরক্ষরেখার সামান্য উত্তরে। এই অঞ্চল **নিম্ন মালভূমি**। এখানকার উচ্চতা গড়ে ৩০০-৪৫০ মিঃ। অর্থাৎ এখানকার ভূপ্রকৃতির অবস্থা ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমির মত। আফ্রিকার এই অঞ্চলের বৃহত্তম অংশ **সাহারা** মরুভূমি। তাহার বিভিন্ন অংশ **লিবিয়া, টিম্বক্টু** প্রভৃতি **মরুভূমি**। এই মালভূমি অঞ্চল পৃথিবীর **প্রাচীনতম ভূখণ্ড** গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অংশ। ফলে, ইহা অতিশয় **ক্ষয়প্রাপ্ত** অঞ্চল। তথায় লক্ষ লক্ষ বৎসর যাবৎ বায়ু দ্বারা

সঞ্চিত হইয়াছে বালুকারাশি, আর বন্যা দ্বারা সঞ্চিত হইয়াছে অসংখ্য পলিস্তর। এই অঞ্চলের মধ্য ভাগে আছে **টিবেস্টি উচ্চভূমি**। আর পশ্চিম অংশে আছে **ক্যামারুন** (৪০৭০ মিঃ উচ্চ), **ফুটাজালন**, কং প্রভৃতি **পর্বত**। সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ-পূর্বে **চাদ হ্রদ** অবস্থিত। এখানকার মালভূমি অঞ্চলের অধিকাংশ দক্ষিণ

হইতে উত্তরে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে ঢালু। এই মালভূমির পূর্ব অংশ দিয়া **নীল নদ** উত্তরদিকে প্রবাহিত। ইহা **পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী**। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৬৭০ কিঃমিঃ। উত্তর আফ্রিকার মালভূমি অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে আছে আর একটি প্রধান নদী। তাহার নাম **নাইজার**।

আফ্রিকার মধ্য ভাগ হইতে পশ্চিমে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত অংশ **পর্বতবেষ্টিত সমভূমির** মত। তাহার উপর দিয়া **কঙ্গো বা জায়রে নদী** অসংখ্য

উপনদী **সহ** পশ্চিমদিকে বহিয়া গিয়াছে। ইহা পথে দুইবার নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিয়াছে। এই নদীর স্ট্যানলি ও লিভিংস্টোন জলপ্রপাত বিখ্যাত।

আবিসিনিয়ার রাস ডসন পর্বতশৃঙ্গ

(৩) **দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার উচ্চ মালভূমি অঞ্চল**—আফ্রিকার দক্ষিণদিকের অংশ **উচ্চ মালভূমি**। তাহার উচ্চতম অংশ অত্যন্ত দীর্ঘ। তাহা ঐ মহাদেশের প্রায় দক্ষিণ সীমা হইতে উত্তর-পূর্বদিকে প্রায় লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাহার উত্তর-পূর্ব অংশে আছে **আবিসিনিয়া** উচ্চভূমি। তথাকার **সর্বোচ্চ শৃঙ্গ রাস ডসন** (৪৫৭৫ মিঃ উচ্চ)। এই অঞ্চলের মধ্য ভাগে নিরক্ষরেখার সামান্য দক্ষিণে আছে **কেনিয়া পর্বত** (৫১৯৪ মিঃ উচ্চ)। আর একটু দক্ষিণে আছে **কিলি-মাঞ্জোরো**। ইহা **আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত** (৫৮৯৫ মিঃ উচ্চ)। তাহাছাড়া এই অঞ্চলে আছে **রুয়েঞ্জোরি** (৫১৬৫ মিঃ উচ্চ) ও অন্য কয়েকটি পর্বত। ইহাদের বেশীর ভাগ **আগ্নেয় পর্বত**।

কিলিমাঞ্জোরো

মধ্য আফ্রিকার দক্ষিণদিকের এই পার্বত্য অংশে আছে **পৃথিবীর সর্বপ্রধান গ্রস্ত উপত্যকা** অঞ্চল। তাহা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এই নিম্ন অংশে **এলবার্ট, ট্যাঙ্গানিকা** ও **নিয়াসা** হ্রদ পর পর দক্ষিণদিকে বিস্তৃত। **এলবার্ট** ও **ট্যাঙ্গানিকা** হ্রদের মাঝখানে একটু পূর্বদিকে আছে বৃহৎ **ভিক্টোরিয়া হ্রদ**।

আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে আছে **ড্রাকেন্সবার্গ পর্বত**। এই মহাদেশের প্রায় দক্ষিণ সীমাতে আছে **নিউ ভেল্ড পর্বত**। ইহা **ধাপে ধাপে** সমুদ্রের দিকে **নীচু হইয়া** গিয়াছে। এখানকার বড় ধাপের নাম **গ্রেট কারু** ছোট ধাপের নাম **লিটল কারু**। দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম অংশে আছে **কালাহারি** মরু অঞ্চল।

আফ্রিকার দক্ষিণ অংশের প্রধান নদী **জাম্বেসী** ও **লিম্পপো**। ইহারা পূর্ব-দিকে প্রবাহিত। জাম্বেসী নদীর **ভিক্টোরিয়া** বা **মোসিওয়টুন্যা প্রপাত** বিখ্যাত।

(৪) **উপকূলের সমভূমি ও দ্বীপ অঞ্চল**—এই মহাদেশের **উপকূলের সমভূমি** অত্যন্ত **সঙ্কীর্ণ**। তাহা **খাড়া ভাবে** সমুদ্রে নামিয়া গিয়াছে। কেবল উত্তরে ভূমধ্যসাগরের উপকূলের ও পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলের উত্তর অংশে সমভূমি একটু চওড়া। **আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব** সীমার নিকট আছে বৃহৎ **মাদাগাস্কার** দ্বীপ। এই মহাদেশের অন্যান্য উপকূলের নিকট **দ্বীপ** নিতান্ত কম।

অনুশীলনী

১। আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানের ভূপ্রকৃতি কিরূপ? এই মহাদেশের কোন্ অংশে ভাঁজল পর্বত দেখা যায়? তথাকার কোন্ পর্বত অধিক বিখ্যাত? শটস্ কি? ২। এই মহাদেশের কোন্ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি উচ্চতম? তথাকার কয়েকটি প্রধান পর্বতের নাম বল। তথাকার ভূপ্রকৃতির অপর কোন্ বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য? ৩। এই মহাদেশের প্রধান হ্রদগুলির নাম লিখ। ৪। এই মহাদেশের উপকূলের সমভূমির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় | সাহারা অঞ্চল

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার আরব মরুভূমি হইতে পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকার প্রায় পশ্চিম সীমা পর্যন্ত **পৃথিবীর বৃহত্তম মরু অঞ্চল** (Dry world)। এখানকার আয়তন ভারতের আয়তনের প্রায় ২½ গুণ। তাহার বৃহত্তম অংশ আফ্রিকাতে। এখানকার **সাহারা পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি**।

অবস্থিতি—উত্তর আফ্রিকার বৃহৎ অংশ সাহারা মরু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চল পশ্চিমে প্রায় আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূল হইতে পূর্বদিকে মিশর ও সুদান পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ আলজিরিয়া, লিবিয়া ও মিশরের অধিকাংশ এবং ইহাদের দক্ষিণে মৌরিটানিয়া, মালি, নাইজার, চাদ ও সুদান দেশের উত্তর অংশ বৃহৎ সাহারা মরু অঞ্চলের অন্তর্গত।

ভূপ্রকৃতি—সাহারা অঞ্চল নিম্ন মালভূমি (উচ্চতা ৩০০-৪৫০ মিঃ)। কিন্তু এখানকার বিভিন্ন অংশের মধ্যে কতক **বৈচিত্র্য** সুস্পষ্ট। যেমন, আলজিরিয়া, লিবিয়া ও নাইজার দেশের প্রায় মিলনস্থলে আছে **তাসিলি উচ্চভূমি**। তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে আলজিরিয়ার দক্ষিণ অংশে আছে **আহাগ্‌গার উচ্চভূমি**। ইহাদের দক্ষিণে নাইজার দেশের পূর্ব অংশে আছে **এয়ার উচ্চভূমি**। আরও পূর্বে লিবিয়া ও চাদ দেশের মিলনস্থলে আছে **টিবেস্টি উচ্চভূমি**। এসকল উচ্চভূমি ১০০০ মিটারের বেশী উঁচু। ইহাদের কতক **শৃঙ্গ ২০০০ মিঃর অধিক উঁচু**। অপর দিকে সাহারার মধ্যে কতক যথেষ্ট নীচু অংশও আছে। যেমন, টিবেস্টি উচ্চভূমির দক্ষিণে আছে **বোডেলে নিম্নাঞ্চল**। তাসিলি ও আহাগ্‌গারের উত্তর-দিকেও আছে নিম্নাঞ্চল। এসকল নিম্নাঞ্চলের বা অববাহিকার (basin) কতক অংশ **সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতেও নীচু**।

সাহারা মরু অঞ্চলের পশ্চিম অংশ বালিয়াড়ি পূর্ণ। তাহা **এর্গ** (Erg) নামে পরিচিত। তাহার পূর্বদিকের অংশ প্রস্তরময়। তাহাকে বলা হয় **হামাদা মরু**। আর তাসিলি ও আহাগ্‌গার উচ্চভূমির পশ্চিমদিকে পাথরের অসংখ্য টুকরা জড় হইয়া আছে। সাহারার এই অংশ **রেগ** নামে পরিচিত। সমগ্র সাহারা অঞ্চলে আছে বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য বালিয়াড়ি বা বালুকার স্তূপ। তবে এখানকার প্রবল বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে প্রায়ই **বালিয়াড়ির** স্থান, উচ্চতা, আকৃতি, আয়তন প্রভৃতির পরিবর্তন হয়।

সাহারা অঞ্চলে বৃষ্টির অভাব। সেজন্য এখানে **নদীর অভাব**। তবে সামান্য **বৃষ্টি দ্বারাই** এখানকার বালুকাময় **ভূপ্রকৃতির বিস্তর পরিবর্তন** ঘটে।

জলবায়ু—এই মরু অঞ্চলে সমস্ত বৎসরই **দিবাভাগের উষ্ণতা** খুব বেশী

এবং **রাত্রি যথেষ্ট শীতল**। উচ্চভূমির কতক অংশে শুধু শীতকালে নয়, অন্য সময়েও **রাত্রে তুষারপাত হয়**। সাহারার অধিকাংশ স্থানে সাধারণতঃ উত্তর-পূর্বদিক হইতে **শুষ্ক উত্তপ্ত বায়ু** প্রবাহিত হয়। ইহার নাম **হারমাট্টান**। এই

অঞ্চলে মাঝে মাঝে প্রবল বালুকা ঝড় প্রবাহিত হয়। ঐ ধূলিঝড়কে (dust devil) বলে **সাইমুম**। সাহারা মরু অঞ্চল প্রায় **বৃষ্টিহীন**। তবে গ্রীষ্ম কালে কখন কখন ঝড়ের সময় সামান্য বৃষ্টি হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ—সাহারার পশ্চিম অংশ বালিয়াড়ি পূর্ণ **এর্গ মরু** অঞ্চল। এখানকার কতক অংশে **গুল্ম ও কাঁটা গাছ** আছে, আর কতক অংশ **উদ্ভিদহীন**। প্রস্তরময় **রেগ** ও **হামাদা** অঞ্চলে দেখা যায় **অর্ধমৃত** গাছ। সাহারা অঞ্চলের যেখানে একটু বেশী বৃষ্টি হয় সেখানে **গুল্ম ও কাঁটাগাছ** অধিক জন্মে। মরুভূমির বালুকারাশির নীচে কোথাও কিছু বেশী পরিমাণ জল জমিতে পারিলে ঐ অংশে সৃষ্টি হয় মরুদ্যান। সাহারার বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির পর ঘাস জন্মে। তাহা উট, মেষ, ছাগ, ঘোড়া প্রভৃতি পশু পালনের পক্ষে সুবিধাজনক।

মরুদ্যানে খেজুর গাছ

ভূমির ব্যবহার ও কৃষিজ সম্পদ—**মরুদ্যানগুলিতে প্রচুর খেজুর গাছ** জন্মে।

তাহাছাড়া তাহাদের কতক অংশে সেচের সাহায্যে গম, কার্পাস ও কতক ফল উৎপন্ন করা হয়। সাহারা মরুভূমির **টুয়াট, বোডেলে, এল জুফ** প্রভৃতি মরূদ্যান বিখ্যাত।

খনিজ সম্পদ—সাহারাতে ক্রমশঃ অধিক **খনিজ তৈল** (black gold) ও **প্রাকৃতিক গ্যাস** পাওয়া যাইতেছে। এজন্য এখানকার **অর্থনীতিক গুরুত্ব** বাড়িয়া চলিয়াছে। তৈল উৎপাদন সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল বা অংশসমূহের মধ্যে এখন **সাহারার** স্থান **অষ্টম**। **আলজীরিয়ার** এর্জিল, হাসি, মেসাউদ, **লিবিয়ার** জেলটেন, ডাহুরা, বীডা প্রভৃতি এই অঞ্চলে তৈল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। সাহারা অঞ্চলে **জিপসাম, লবণ** প্রভৃতি খনিজ সম্পদও পাওয়া যায়।

যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা—সাহারা অঞ্চলে মানুষ সাধারণতঃ **স্থলপথে** উটের পিঠে চড়িয়া যাতায়াত করে। ঘোড়াও ব্যবহৃত হয় অনেক। তবে এখানকার **তৈলখনি** অঞ্চলে যাতায়াতের প্রধান উপায় **মোটরগাড়ি ও বিমানপথ**।

লোকবসতি—সাহারা মরুভূমির কতক অংশ **জনহীন**, বাকী অংশেও **লোকবসতির ঘনত্ব** প্রতি বর্গ কিঃমিঃতে **গড়ে ১০ জনের কম**। সাহারার অধিবাসী **কাবাবিশগণ যাযাবর**। তাহারা জল ও তৃণভূমির খোঁজে নিজ নিজ উটের দল সহ ঘুরিয়া বেড়ায়। সুদানের **বেকুয়ারাগণ** তাহাদের পশুর দলসহ এক একটি তৃণভূমিতে মোটামুটি স্থায়ী ভাবে বাস করে। সাহারা অঞ্চলের কতক লোক **মরূদ্যানে স্থায়ী ভাবে** বাস করে। তাহারা তথায় পশুপালন ও কিছু কিছু চাষ-আবাদ করে। **তৈলখনি অঞ্চলে লোকবসতি অধিক** এবং তাহাদের **আর্থিক অবস্থা ভাল**।

অনুশীলনী

১। আফ্রিকার কোন্ অংশ সাহারা? ইহা Dry World এর কোন্ অংশ? ২। এখানকার ভূপ্রকৃতি কিরূপ? তাহার কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য? ৩। সাহারার জলবায়ু কিরূপ? এখানকার দিবা ও রাত্রির উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য কিরূপ? ৪। এখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ কিরূপ? এখানকার কোন্ অংশকে মরূদ্যান বলে? তথাকার উৎপন্ন দ্রব্যের ও লোকবসতির বৈশিষ্ট্য কি? ৫। সাহারার প্রধান খনিজ সম্পদ্ কি? ৬। সাহারার লোকবসতি কিরূপ? সাহারার কোথায় লোক স্থায়ী ভাবে বাস করে?

অবস্থিতি, আয়তন ও ভূপ্রকৃতি—কঙ্গো নদীর অববাহিকা অঞ্চল আফ্রিকা মহাদেশের মধ্য ভাগের পশ্চিম অংশে। এখানকার অধিকাংশ ১০° উত্তর অক্ষরেখা হইতে ১০° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। এখানকার আয়তন প্রায় ৬½ লক্ষ বর্গ কিঃমিঃ, অর্থাৎ ভারতের আয়তনের ২০% এর কিছু কম। এই অঞ্চলের ভূভাগ গড়ে প্রায় ২০০-৩০০ মিঃ উচ্চ। তাহা উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব—এই তিন দিকে উচ্চভূমি দ্বারা বেষ্টিত। কাজেই প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রায় সমভূমি হইলেও এখানকার অবস্থা অনেকটা **পর্বতবেষ্টিত নিম্নাঞ্চলের** মত। এই অঞ্চলের পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। কঙ্গো বা জায়রে নদীর অববাহিকার অধিকাংশ এখানকার **নিরক্ষীয় অঞ্চলের** অন্তর্গত। ফলে, এই অঞ্চলে সারা বৎসর বৃষ্টি হয়। তার উপর এই অঞ্চল পর্বতবেষ্টিত। তাই এখানে প্রচুর জল জমিয়া থাকে। সেজন্য এখানকার বিস্তীর্ণ অংশ **জলাভূমি**।

নদী—কঙ্গো বা জায়রে (Zaire) একটি বিচিত্র নদী। এ বিষয়ে এই অঞ্চলের কয়েকটি বিষয়ের প্রভাব অধিক। যেমন, এখানকার ভূপ্রকৃতি পর্বতবেষ্টিত। এখানে সারা বৎসর বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলের দক্ষিণদিকের **স্থানসমূহের** ভূপ্রকৃতি পাহাড় পর্বতময়। মধ্য আফ্রিকার দক্ষিণদিকে ট্যাঙ্গানিকা একটি প্রসিদ্ধ হ্রদ। এই হ্রদের দক্ষিণদিকের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল **কঙ্গো নদীর উৎস**। তথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কঙ্গোর উপনদী **চাম্বেসী**। তারপর সেখান হইতে উহা বেঙ্গুয়েলু হ্রদ পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিমে বহিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে কঙ্গো নদীর একটি অংশ উত্তরদিকে আসিয়াছে মোয়েরো হ্রদ পর্যন্ত। ইহার নাম **লুয়াপুলা**। কঙ্গোর আর একটি অংশ মোয়েরো হ্রদ হইতে অল্প দূর উত্তর-পশ্চিমে আসিয়াছে। তাহার নাম **লুভুয়া**। তারপর ইহা মিলিত হইয়াছে **লুয়ালাবা** নদীর সহিত। এই মিলিত নদী উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এভাবে ক্রমশঃ বহু উপনদীর মিলনের ফলে যে বৃহৎ নদী সৃষ্টি হইয়াছে

তাহার নাম **জায়রে** বা **কঙ্গো**। ইহা উৎস হইতে বহু দূর উত্তরদিকে গিয়াছে। তারপর ইহা বাঁকিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে আসিয়াছে। ইহার পর কিছু দূর পশ্চিমে গিয়া ইহা **আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত** হইয়াছে। ইহাই পৃথিবীর এক মাত্র

বৃহৎ নদী যাহা **দুই বার নিরক্ষরেখা অতিক্রম** করিয়াছে। ইহার উপনদীর সংখ্যা কয়েক শত। তাহাদের মধ্যে **উবাঙ্গি, কাসাই, লুয়ালাবা, চাম্বেসী** প্রভৃতি প্রধান। জায়রে নদীর গতিপথে **জলপ্রপাতও** অনেক। তাহাদের মধ্যে **লিভিংস্টোন** ও **স্ট্যানলী** প্রপাত বিখ্যাত। কঙ্গো নদীর মোহনাতে বদ্বীপ নাই।

জলবায়ু—কঙ্গো নদীর অববাহিকার বেশীর ভাগ **নিরক্ষীয় অঞ্চলের** অন্তর্গত। এজন্য এখানে **সমস্ত বৎসর উষ্ণতা** অধিক। এখানে দিবাভাগের তুলনায় রাত্রিতে উষ্ণতা বেশ কম। এই অঞ্চলে **সারা বৎসরই** বৃষ্টি হয়। এখানকার উত্তর অংশে জুন ও সেপ্টেম্বরে, আর দক্ষিণ অংশে নবেম্বর-ডিসেম্বরে বৃষ্টি বেশী। এখানকার এপ্রকার জলবায়ু নিরক্ষীয় জলবায়ু নামে পরিচিত। এপ্রকার অত্যন্ত আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ—এখানকার উষ্ণ ও আর্দ্র **জলবায়ু** উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধাজনক। ফলে, সমগ্র অঞ্চল **বনময়**। গাছগুলি যেন সূর্যের কিরণ লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া উঁচু হয়। এখানকার গাছের **ডালাপালা অনেক, পাতা প্রশস্ত ও চিরহরিৎ**। এই জন্য সমগ্র অঞ্চল প্রায় **অন্ধকার**। এখানকার **মেহীগনি, আবলুস** প্রভৃতি গাছের কাঠ এবং **রবার** গাছের **রস** মূল্যবান সম্পদ। এরূপ অরণ্য অসংখ্য বন্য প্রাণীর **আবাসস্থল**। তাহাদের মধ্যে বানর জাতীয় প্রাণী খুব বেশী। এই বন অত্যন্ত ঘন এবং এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল নয়। সেজন্য এখান হইতে কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা কষ্টকর।

ভূমির ব্যবহার ও কৃষিজ সম্পদ—এই অঞ্চলের বাহির দিকে রবার, কফি, কোকো, কার্পাস, বাদাম, ভুট্টা, কলা, ধান প্রভৃতি কিছু কিছু জন্মে।

খনিজ সম্পদ—এই অঞ্চলে সামান্য স্বর্ণ ও তাম্র পাওয়া যায়।

লোকবসতি—এই অঞ্চল জলাভূমি। তাহাছাড়া এখানে আছে ঘন বন। এখানকার জলবায়ুও অস্বাস্থ্যকর। তাহার উপর এখানে যাতায়াত ও জীবিকা অর্জনের পক্ষে অসুবিধা অনেক। এসকল কারণে কঙ্গো নদীর অববাহিকাতে **লোকবসতি কম**। এখানকার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ **নিগ্রো** জাতীয়।

নগরাদি—জায়রে নদীর মোহনার ধারে নদীর পশ্চিম তীরে **ব্রাজাভিল** অবস্থিত। তাহা কঙ্গো দেশের রাজধানী। তাহার বিপরীত দিকে **কিনসাসা** অবস্থিত। তাহা জায়রে দেশের রাজধানী।

অনুশীলনী

১। কঙ্গো অববাহিকার ভূপ্রকৃতি কিরূপ? ২। কঙ্গো বা জায়রে নদীর বৈশিষ্ট্য কি? ৩। কঙ্গো অববাহিকার জলবায়ু কিরূপ? ৪। কঙ্গো অববাহিকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ কিরূপ? ৫। এই অঞ্চলের লোকবসতি কিরূপ?

আফ্রিকার **নীল পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী**। নিরক্ষরেখার সামান্য দক্ষিণে ইহার উৎস বা উৎপত্তিস্থল। তথা হইতে উত্তরে ভূমধ্যসাগরে পতিত হওয়া পর্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬,৬৭০ কিঃমিঃ। ফলে, এই নদীর অববাহিকার দৈর্ঘ্যও খুব বেশী। এখানকার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। যেমন, এখানকার দক্ষিণ অংশ বা উৎস অঞ্চল **জনহীন** অরণ্য অঞ্চল। এই নদীর অববাহিকার মধ্যভাগের কতক অংশের পাশে আছে মরু অঞ্চল। এই নদীর অববাহিকার নিম্ন অংশ বা উত্তর অংশ বদ্বীপ অঞ্চল। ইহা পৃথিবীর **প্রাচীনতম সভ্যতার** একটি **প্রধান কেন্দ্র**।

অবস্থিতি ও আয়তন—নীল নদের অববাহিকার **দক্ষিণ অংশ** অর্থাৎ মূল নদী ও বিভিন্ন উপনদীর উৎস অঞ্চল মিলিয়া এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এখানকার আয়তন প্রায় ২০ লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ, অর্থাৎ ভারতের আয়তনের প্রায় ৬৫%। নীল নদের অববাহিকা অঞ্চলের **উত্তর অংশ** অর্থাৎ উপত্যকার নিম্ন অংশ ও বদ্বীপ অঞ্চল অত্যন্ত **সংকীর্ণ**। ইহা মিশরের অন্তর্গত। এখানকার আয়তন প্রায় ৩৫,৫০০ বর্গ কিঃমিঃ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের প্রায় ৪০%। নীল নদের অববাহিকার মধ্যভাগের অংশ সুদান, আবিসিনিয়া প্রভৃতি বহু দেশের অন্তর্গত।

নীল নদের অববাহিকার ভূপ্রকৃতি ও বিভিন্ন অংশে এই নদীর অবস্থা—নীল নদের অববাহিকা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে ভূপ্রকৃতি ও নদীর অবস্থা সম্বন্ধে পার্থক্য খুব বেশী। তদনুসারে এই অববাহিকা অঞ্চল **পাঁচ ভাগে** বিভক্ত। যথা—(১) **উৎস ও নিকটবর্তী অঞ্চল**—নীল নদের উৎস প্রকৃত পক্ষে উহার উপনদী **কাগেরার উৎস**। ইহা **নিরক্ষরেখার দক্ষিণে** অর্থাৎ ক্ষুদ্র বুরুণ্ডি রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা **উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল**। কাগেরা নদী এখান হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরে ঘুরিয়া **ভিক্টোরিয়া হ্রদে** পতিত হইয়াছে। নীল নদের একটি অংশ ঐ হ্রদ হইতে বাহির হইয়া উত্তরদিকে গিয়া **এলবার্ট হ্রদে** পড়িয়াছে। তাহার নাম **ভিক্টোরিয়া নীল**। (২) **নীল নদের অববাহিকার উচ্চ বা উপরের অংশ**—নীল নদের একটি উপনদী এলবার্ট হ্রদ হইতে বাহির হইয়া উত্তরদিকে সুদানের মালাকাল (প্রায় ১০° উত্তর অক্ষরেখা) পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার নাম **বাহর-এল-জেবেল**। এলবার্ট হ্রদের পাশে ইহার নাম এলবার্ট নীল। নীল নদের অপর এক উপনদী বাহর-এল-ঘাজল পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া এখানে বাহর-এল-

জেবেলের সহিত মিশিয়াছে। এই মিলিত নদীর নাম **হোয়াইট নীল** বা **নীল এল-আবিয়াড**। নীল নদের উৎস হইতে মালাকাল পর্যন্ত নীল নদের অববাহিকা অঞ্চলের উচ্চতা ৪০০-৫০০ মিঃ। ইহা নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত, অর্থাৎ নিরক্ষীয় অঞ্চল। তাই এখানে **সারা বৎসর বৃষ্টিপাত** হয়। ফলে, এখানকার বিস্তীর্ণ অংশ জলাভূমি। (৩) **নীল নদের অববাহিকার মধ্য অংশ মালাকাল হইতে এল খার্টুম**—হোয়াইট নীল মালাকাল হইতেও উত্তর দিকেই গিয়াছে। **আবিসিনিয়া** পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে নীল নদের এক উপনদী **ব্লু নীল** বা **নীল এল আজরাক**। ইহা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে আসিয়া এল খার্টুমে **হোয়াইট নীলের** বা **নীল-এল-আবিয়াডের** সহিত মিশিয়াছে। (৪) **নীল নদের নিম্ন বা নীচের অংশ**—এল খার্টুমের পর হইতে **সম্মিলিত নদীর** নাম **নাহরেন নীল** (Nile)। এখান হইতে ইহা উত্তরদিকে বহিয়া গিয়াছে। তবে এখানে ইহার পথের আকৃতি বৃহৎ S-এর মত। এখানে নীল নদের সহিত মিশিয়াছে ইহার উপনদী **নাহর আটবারা**। ইহাদের মিলনস্থলের উত্তরে বৃহৎ **নাসের হ্রদ**। **এল** খার্টুমের পর হইতে নীল নদের পূর্বদিকে উচ্চভূমি, পশ্চিমদিকে সাহারা মরুভূমি। নাসের হ্রদের উত্তর সীমা হইতে নীল নদ আবার সোজাসুজি উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। (৫) **বদ্বীপ অঞ্চল**—মিশরের রাজধানী **কায়রো** বা **এল কাহিরা হইতে উত্তরে** ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত নীল নদের বদ্বীপ। এই অঞ্চল অনেকটা **প্রশস্ত** এবং এখানকার **ভূমি পলিময়** ও **উর্বর**।

জলবায়ু—নীল নদের অববাহিকার উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য খুব বেশী। তাই এই অববাহিকার বিভিন্ন অংশে জলবায়ুর **বৈচিত্র্য** অধিক। নদীটির উৎস অঞ্চলে ও আশপাশে **উচ্চগতি অঞ্চলে** জলবায়ু **নিরক্ষীয় প্রকৃতির**। এখানে সারা বৎসর অস্বাস্থ্যকর উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু। তাহার উত্তরে অর্থাৎ নীল নদের

অববাহিকার **মধ্য অংশে গ্রীষ্ম কালে বৃষ্টি অধিক**। তাহার পূর্বদিকে ব্লু নীলের উৎস **আবিসিনিয়া** পর্বত। এই অঞ্চলের জলবায়ু **মৌসুমী প্রকৃতির**। নীল নদের অববাহিকার নিম্ন বা **উত্তর অংশের** পশ্চিমে সুবৃহৎ সাহারা মরুভূমি। এই অংশের জলবায়ু **মরু প্রকৃতির**। নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চলের জলবায়ু **ভূমধ্যসাগরীয় প্রকৃতির**। এখানে **শীত কালে** পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ—নীল নদের অববাহিকার বিভিন্ন অংশে ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর পার্থক্য খুব বেশী। ফলে, বিভিন্ন স্থানে স্বাভাবিক উদ্ভিদ সম্পর্কে পার্থক্য অধিক। এই নদীর উৎস ও আশপাশের **নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঘন বন** বহু দূর বিস্তৃত। এখানকার গাছগুলি **প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ** জাতীয়। তাহার উত্তরে মালাকাল পর্যন্ত **জলাভূমি** অঞ্চল। এখানে **পেপিরাস, বাঁশ** জাতীয় গাছ, **দীর্ঘ তৃণ, সাড** জাতীয় **ভাসমান উদ্ভিদ, কচুরীপানা** প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ অধিক। তাহার উত্তরে নীল নদের অববাহিকার মধ্য অংশের উদ্ভিদের অবস্থা পার্কের মত। এখানে আছে **দীর্ঘ তৃণ, গুল্ম ও মাঝে মাঝে বড় গাছ**। তাহার উত্তরে আছে **গুল্ম ও তৃণ** অঞ্চল বা **সাভানা**। নীল নদের অববাহিকার নিম্ন বা অধিক উত্তরদিকের অংশের উদ্ভিদের অবস্থা **মরূদ্যানের** মত। এখানে **খেজুর** ও অন্যান্য **কাঁটাযুক্ত গাছ** প্রচুর। নীল নদের অববাহিকার উত্তর সীমাতে **বদ্বীপ** অংশে **প্রশস্ত পত্রযুক্ত** কতক **চিরহরিৎ** গাছ আছে।

জলসেচ—নীল নদের বদ্বীপ **পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র**। এখানকার মরু প্রকৃতির জলবায়ু কৃষির পক্ষে অসুবিধাজনক। তাই কৃষিকার্যের উদ্দেশ্য **এখানে বহু প্রাচীন কাল** হইতে **সেচ ব্যবস্থা** প্রচলিত। নদীর দুই পাশে দীর্ঘ বাঁধ আছে। নীল **নদে যখন** বন্যা হয়, তখন বাঁধের বিভিন্ন ফাঁক দিয়া **বন্যার জল** চাষের জমিতে নিয়া তথায় আটকাইয়া রাখা হয়। প্রাচীন কাল হইতে এই ব্যবস্থা প্রচলিত। এদেশে নদীর বন্যাকে মনে করা হয় ভগবানের আশীর্বাদ। তাহাছাড়া পাত্রের সাহায্যে **কূপ** হইতে জল তুলিয়াও এখানে জমিতে সেচ কার্য হয়। ইহা **সাডুক** পদ্ধতি নামে পরিচিত। বড় চাকার গায়ে ছোট ছোট পাত্র বাঁধিয়াও এখানে কূপ হইতে জল তোলা হয়। ইহাকে বলা হয় **'পারসিয়ান হুইল'** পদ্ধতি। তবে এখন এখানে সেচের **আধুনিক** পদ্ধতির গুরুত্ব অনেক বেশী। আধুনিক ব্যবস্থা অনুসারে নীল নদের উপর এল কাহিরা বা কায়রোর উত্তরে আছে **ডেল্টা ব্যারেজ** বা **মহম্মদ আলি ব্যারেজ**। তথা হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে আছে **আসিয়ুট, নাগ হামাদি, এসনা বাঁধ** (নাসের হ্রদের উত্তরে), **আসোয়ান হাই ড্যাম** বা **উচ্চ বাঁধ, সেনার বাঁধ** প্রভৃতি বিখ্যাত বাঁধ। তাহাদের পাশে পাশে তৈরী হইয়াছে বিরাট জলাশয়। ইহাদের মধ্যে জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। তারপর চাষের কাজের প্রয়োজন অনুসারে

ঐসকল জলাশয় হইতে খালের সাহায্যে জল নিয়া বিভিন্ন জমিতে সেচ কার্য হয়। প্রধানতঃ নীল নদের সাহায্যে আধুনিক সেচ ব্যবস্থার ফলেই মিশর দেশ শস্য শ্যামল এবং নানাপ্রকার শিল্পেও উন্নত। মিশরের অধিবাসীদের উন্নতি এই নদীর উপর নির্ভরশীল। এজন্যই বলা হয় মিশর দেশ '**নীল নদের দান**'।

ভূমির ব্যবহার ও কৃষিজ সম্পদ—প্রচুর পরিমাণে সেচের ফলে মিশরে নীল নদের অববাহিকার উত্তর অংশে উৎপন্ন হয় **উৎকৃষ্ট কার্পাস**। এখানে আরও জন্মে **গম, ভুট্টা, বাজরা**। এখানে কম পরিমাণে জন্মে **যব, আখ, পেঁয়াজ, চীনাবাদাম** প্রভৃতি ফসল। এই নদীর অববাহিকার মধ্য অংশে জন্মে **কার্পাস, চীনাবাদাম, আখ, নানাপ্রকার তৈলবীজ**। মরূদ্যানগুলিতে প্রচুর **খেজুর** জন্মে।

কায়রোর পাশে পিরামিড ও স্ফিনস্ক মূর্তি
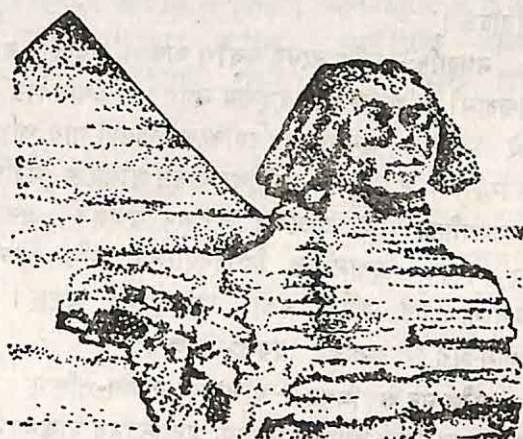
খনিজ সম্পদ—নীল নদের অববাহিকাতে কিছু **খনিজ তৈল, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফেট ও সীসা** পাওয়া যায়।

শিল্পসম্ভার—নীল নদের অববাহিকাতে **তৈল শোধন**, কার্পাস বস্ত্র, চর্ম, সিমেণ্ট, কৃষি সার উৎপাদন প্রভৃতি শিল্প উন্নত।

লোকবসতি—নীল নদের বদ্বীপ সহ অববাহিকার নিম্ন বা **উত্তর অংশে লোকবসতির ঘনত্ব অসামান্য**। এখানে প্রতি বর্গ কিঃমিঃতে গড়ে প্রায় ৭৫০ জন লোক বাস করেন। এখানে লোকবসতির ঘনত্ব পশ্চিমবঙ্গে লোকবসতির ঘনত্বের প্রায় ১½ গুণ। এখানকার অধিবাসিগণ কৃষি, শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নত। তবে এই অবস্থা মাত্র নদীর দুই পাশের সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এখানকার বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। **নীল নদের উৎস** ও আশপাশে **নিরক্ষীয় অঞ্চলে** পার্বত্য ভূপ্রকৃতি এবং উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুর জন্য লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃমিঃতে গড়ে প্রায় ১০ জন মাত্র। এখানকার বহু স্থান জনহীন।

যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা—নীল নদের অববাহিকার নিম্ন বা **উত্তর অংশে নৌপথে** নৌকা, লঞ্চ ও ছোট স্টিমারে যাতায়াত করা যায়। বদ্বীপের উত্তর

সীমাতে ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে **রেলপথ** নদীর ধার দিয়া এল খার্টুমের দক্ষিণে সেনার পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝে মাঝে সামান্য ফাঁক আছে। তাহাছাড়া **স্থলপথ** এবং **বিমানপথেও** অববাহিকা অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধা আছে। **এল ইস্কান্দারিয়া** বা **আলেকজান্দ্রিয়া, এল কাহিরা** বা **কায়রো, আসোয়ান, এল খার্টুম** প্রভৃতি এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক বিমানস্টেশন। স্থলপথ ও রেলপথের যোগাযোগে কায়রো হইতে আফ্রিকার দক্ষিণ সীমার কেপ টাউন পর্যন্ত যাতায়াত করা যায়। যাতায়াতের এই ব্যবস্থা **কেপ-টু-কায়রো** যোগাযোগ ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

নগরাদি—নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত **কায়রো** বা **এল কাহিরা** মিশরের রাজধানী ও আফ্রিকার বৃহত্তম নগর। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৫৭ লক্ষ। এই নগরের অনতিদূরে দেখিতে পাওয়া যায় পাথরের তৈরী বিখ্যাত পিরামিড ও স্ফিনস্ক মূর্তি। বদ্বীপের উত্তর সীমাতে অবস্থিত **আলেকজান্দ্রিয়া** বা **এল ইস্কান্দারিয়া** এই অঞ্চলের বৃহত্তম বন্দর। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় অতি প্রাচীন। সুয়েজ খালের মুখে ভূমধ্যসাগরের তীরে একটি বড় বন্দর আছে। তাহার নাম **সৈয়দ বন্দর**। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৩½ লক্ষ।

নীল নদ ও মিশর—এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের আরব মরুভূমি ও আফ্রিকার উত্তর অংশের সাহারা মরুভূমির মাঝখানে আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব অংশে মিশর দেশ অবস্থিত। কাজেই স্বাভাবিক ভাবে এদেশ শুষ্ক পৃথিবীর (Dry world) অন্তর্গত। অথচ এদেশের উপর দিয়া নীল নদ বহিয়া যাওয়ার ফলে এদেশ পৃথিবীর প্রধান উন্নত দেশগুলির অন্যতম। নীল নদের এপ্রকার গুরুত্বের জন্য ন্যায্য ভাবেই বলা হয় **মিশর দেশ 'নীল নদের দান'** (Gift of the Nile)।

অনুশীলনী

১। নীল নদ কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? ইহা কোথায় সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এই নদীর অববাহিকার বিভিন্ন অংশের ভূপ্রকৃতি বর্ণনা কর। ৩। নীল নদের অববাহিকার বিভিন্ন অংশের জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ বর্ণনা কর। ৪। এই অববাহিকা অঞ্চলের কোন্ অংশে সেচ ব্যবস্থা ও কৃষি কার্য উন্নত? তথাকার এই দুই বিষয় বর্ণনা কর। ৫। নীল নদের অববাহিকার বিভিন্ন অংশে লোকবসতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ৬। মিশরকে নীল নদের দান বলা হয় কেন? (মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮৬)।

পরিশিষ্ট (১)

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের আয়তন, লোকসংখ্যা ও লোকবসতির ঘনত্ব

গভর্ণর-শাসিত রাজ্য

রাজ্য	লোকসংখ্যা ১৯৮১ খ্রীঃ (লক্ষ)	ঐ হিসাবে রাজ্যের পর্যায়	আয়তন (হাজার বর্গ কিঃমিঃ)	ঐ হিসাবে রাজ্যের পর্যায়	লোকবসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃমিঃতে)	ঐ হিসাবে রাজ্যের পর্যায়
উত্তর প্রদেশ	১১০৯	১	২৯৪	৪	৩৭৭	৪
বিহার	৬৯৯	২	১৭৪	৯	৪০২	৩
মহারাষ্ট্র	৬২৮	৩	৩০৮	৩	২০৪	১০
পশ্চিমবঙ্গ	৫৪৬	৪	৮৯	১২	৬১৪	২
অন্ধ্র প্রদেশ	৫৩৫	৫	২৭৫	৫	১৯৪	১২
মধ্য প্রদেশ	৫২২	৬	৪৪৩	১	১১৮	১৬
তামিলনাড়ু	৪৮৪	৭	১৩০	১১	৩৭১	৫
কর্ণাটক	৩৭১	৮	১৯২	৮	১৯৩	১৩
রাজস্থান	৩৪৩	৯	৩৪২	২	১০০	১৭
গুজরাট	৩৪১	১০	১৯৬	৭	১৭৩	১৪
উড়িষ্যা	২৬৪	১১	১৫৬	১০	১৬৯	১৫
কেরালা	২৫৪	১২	৩৯	১৭	৬৫৪	১
আসাম*	১৯৯	১৩	৭৮	১৩	২৫৪	৯
পঞ্জাব	১৬৮	১৪	৫০	১৫	৩৩১	৬
হরিয়ানা	১২৯	১৫	৪৪	১৬	২৯১	৭
জম্মু ও কাশ্মীর**	৬০	১৬	*২২২	৬	২৭	২৩
হিমাচল প্রদেশ	৪১	১৭	৫৬	১৪	৭৬	১৮
ত্রিপুরা	২১	১৮	১০·৫	২২	১৯৫	১১
মণিপুর	১৪	১৯	২২·৩	১৯	৬৩	১৯
মেঘালয়	১৩	২০	২২·৪	১৮	৫৯	২০
গোয়া	১০	২১	৩·৭	২৫	২৭০	৮
নাগাল্যান্ড	৮	২২	১৭	২১	৪৭	২১
অরুণাচল প্রদেশ	৬·৩	২৩	৮·৪	২৩	৭	২৫
মিজোরাম	৪·৯	২৪	২১	২০	২৩	২৪
সিকিম	৩	২৫	৭	২৪	৪৪	২২

** পাকিস্তান ও চীনের অধিকারভুক্ত অংশসহ। * আনুমানিক।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

রাজ্য	লোকসংখ্যা ১৯৮১ খ্রীঃ (হাজার)	ঐ হিসাবে রাজ্যের পর্যায়	আয়তন (শত বর্গ কিঃমিঃ)	ঐ হিসাবে রাজ্যের পর্যায়	লোকবসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃমিঃতে)	ঐ হিসাবে রাজ্যের পর্যায়
দিল্লী	৬২২০	১	১৫	২	৪১৮০	১
পন্ডিচেরী	৬০৪	২	৫	৩	১২২৮	৪
চন্ডীগড়	৪৫২	৩	১·১	৫	৩৯৪৮	২
আন্দামান ও নিকোবর	১৮৯	৪	৮২	১	২৩	৭
দাদরা ও নগর হাভেলি	১০৪	৫	৫	৩	২১১	৬
দমন, দিউ	৭৯	৬	১	৫	৭১৮	৫
লক্ষ দ্বীপ	৪০	৭	০·৩	৭	১২৫৭	৩
সমগ্র ভারত	৬৮·৪ কোটি		৩২·৮ লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ		২২০*	

* আনুমানিক

Desk Work For Class VII

(Including Objective Tests)

I. *নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাপত্র* (Objective Tests)

নিম্নে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা দেওয়া গেল।

(ক) নিম্নে কতকগুলি বিবৃতি দেওয়া আছে। ইহাদের মধ্যে কতক সত্য ও কতক অসত্য। সত্য বিবৃতিগুলির ডানদিকে √ চিহ্ন দাও ও অসত্য বিবৃতিগুলির ডানদিকে × চিহ্ন দাও। কোন বিবৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে তাহার ডানদিকে ? চিহ্ন দাও।

১। পৃথিবীর মেরুরেখা ইহার কক্ষের বা ভ্রমণপথের উপর ৬৬$\frac{1}{2}$° কৌণিক ভাবে অবস্থিত।

২। সূর্যের আপাত গতি অনুসারে ডিসেম্বর হইতে জুন মাস দক্ষিণায়ন।

৩। হিমালয় একটি ভঙ্গিল পর্বত।

৪। নীলগিরি একটি সঞ্চয়জাত পর্বত।

৫। উত্তর ভারত একটি বিখ্যাত পাললিক সমভূমি।

৬। পার্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত নদীর উপত্যকাতে কখন কখন গিরিখাত দেখা যায়।

৭। বদ্বীপ অঞ্চলে নদীর উপত্যকার আকৃতি I-এর মত।

৮। পর্বতের পাদদেশে নদীর উপত্যকাতে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি হয়।

৯। নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণে দূরত্ব যত বেশী উষ্ণতা তত কম।

১০। ভূপৃষ্ঠ হইতে উপরদিকে উচ্চতা যত বেশী উষ্ণতা তত বেশী।

১১। নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিনই দুপুরে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি হয়।

১২। ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ বৃষ্টিই পরিচলন বৃষ্টি।

১৩। পাহাড়, পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে অধিক বৃষ্টি হয়।

১৪। সমুদ্র বায়ু এক প্রকার নিয়ত বায়ু।

১৫। ভারতের কোথাও পরিচলন বৃষ্টি হয় না।

(খ) নিম্নে কতকগুলি অসম্পূর্ণ বিবৃতি দেওয়া আছে। তাহাদের প্রত্যেকটির ডান পাশে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া তাহার নীচে দাগ দাও (underline)।

১। ২১শে জুন মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি—রেখার উপর লম্বভাবে পতিত হয়। কর্কট ক্রান্তি, নিরক্ষরেখা, মকর ক্রান্তি।

২। সূর্যের আপত গতি অনুসারে ২২শে ডিসেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত—। দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ।

৩। পৃথিবীর দীর্ঘতম পার্বত্য অঞ্চল—। গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ, আন্দিজ, আল্পস-হিমালয় অঞ্চল।

৪। রাজস্থানের আরাবল্লী একটি—পর্বত। ভঙ্গিল, স্তূপ, আগ্নেয়, ক্ষয়প্রাপ্ত।

৫। অতীত যুগের টেথিস সাগর অঞ্চলে বর্তমানে—পর্বত অবস্থিত। পশ্চিমঘাট, বিন্ধ্য, হিমালয়।

৬। জম্মু ও কাশ্মীরের বিতস্তা নদীর উপত্যকাতে—সমভূমি আছে। লাভাজাত, লোয়েস, হ্রদ।

৭। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ সমভূমি একটি বিখ্যাত—সমভূমি। হিমবাহ, পাললিক, বদ্বীপ।

৮। গঙ্গা নদীর উৎস হিমালয় অঞ্চলের—। কৈলাস পর্বত, মানস সরোবরের নিকটবর্তী হিমবাহ, গোমুখ বা গোমুখী।

৯। জম্মু ও কাশ্মীরে নাঙ্গা পর্বতের নিকটবর্তী সিন্ধু নদের—বিখ্যাত। গিরিখাত, জলপ্রপাত, ঝুলান উপত্যকা।

১০। পার্বত্য অঞ্চলে নদীর—কার্য হয় না। পরিবহন, ক্ষয়, সঞ্চয়।

১১। —নদীর গতিপথে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়। উচ্চ পর্বতে, পর্বতের পাদদেশে, সমভূমির নিম্ন অংশে (সমুদ্রের নিকটবর্তী অংশে)।

১২। সমুদ্র হইতে ক্রমশঃ দূরের দিকে স্থলভাগে বায়ুতে জলীয় বাষ্প ক্রমশঃ—। কম, বেশী।

১৩। নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণে কোন স্থানের দূরত্ব যত বেশী, তথাকার উষ্ণতা তত—। বেশী, কম।

১৪। সমভূমির লোক উচ্চ পর্বতে বেড়াইতে যায়—কালে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা।

১৫। পৃথিবীর অধিকাংশ বৃষ্টি—। শৈলোৎক্ষেপ, পরিচলন, ঘূর্ণ জাতীয়।

১৬। পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে—বৃষ্টি হয়। শৈলোৎক্ষেপ, পরিচলন, ঘূর্ণ।

১৭। স্থলবায়ু একটি—বায়ু। নিয়ত, সাময়িক, স্থানীয়।

১৮। ভারতীয় সংস্কৃতির কয়েকটি বিখ্যাত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়—। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়াতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে, মধ্য এশিয়াতে।

১৯। হিমালয় অঞ্চলের—ভারতীয় উপমহাদেশ। উপরিভাগে, উত্তরে, দক্ষিণে।

২০। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে—সম্পর্কে মিল সবচেয়ে বেশী। ধর্ম, রাজনৈতিক অবস্থা, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা।

২১। প্রধান হিমালয় পর্বত বা হিমাদ্রি হিমালয়ের—অংশে অবস্থিত। উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ।

২২। জম্মু ও কাশ্মীরের পিরপঞ্জাল—এর অন্তর্গত। প্রধান হিমালয়, মধ্য হিমালয়, শিবালিক পর্বত।

২৩। বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ—। এভারেস্ট, মাকালু, কাঞ্চনজঙ্ঘা।

২৪। ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের মেঘালয় একটি—। মালভূমি, পর্বতশৃঙ্গ, আগ্নেয়গিরি।

২৫। সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য — বিখ্যাত। এভারেস্ট, নাঙ্গা পর্বত, চেরাপুঞ্জি।

২৬। গঙ্গা-সমভূমির পলিমাটির গভীরতা গড়ে প্রায়—মিটার। ১০০, ৫০০, ১০০০।

২৭। এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা—মিটার। ৮৮৪৮, ৮৫৯৮, ৭৭১৭।

২৮। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃতি—কিলোমিটার। ৫০-১০০, ৩০০-৪০০।

২৯। রাজস্থানের মরু অঞ্চলের—অংশে বালিয়াড়ি অধিক। মধ্য, পশ্চিম, পূর্ব।

৩০। আরাবল্লী একটি—পর্বত। ভঙ্গিল, আগ্নেয়, ক্ষয়জাত।

৩১। — নদীর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য মালভূমি। তাপ্তী, মহানদী, নর্মদা।

৩২। ভারতের পূর্ব উপকূলের সমভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্য—। চারিটি নদীর বদ্বীপ, পশ্চিম উপকূলের সমভূমির তুলনায় অধিক বিস্তার।

৩৩। গঙ্গার প্রধান শাখানদী —। যমুনা, ভাগীরথী-হুগলি, পদ্মা।

৩৪। ভারতের — পৃথিবীর সর্বোচ্চ নদী-বাঁধ। ফরাক্কা, ভাকরা, মেট্টুর।

৩৫। —নদী 'দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা' নামে পরিচিত। মহানদী, গোদাবরী, নর্মদা।

৩৬। রাজস্থানের মরু অঞ্চলের গ্রীষ্মকালের উষ্ণতা গড়ে — °সে। ০-৫, ৩০-৩৫, ৫০-৭৫।

৩৭। গ্রীষ্মকালে দুপুরের পর দিল্লীর আশপাশে প্রবাহিত হয়—। কালবৈশাখী, লু, শৈত্য প্রবাহ।

৩৮। বর্ষাকালে আর্দ্র মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়—। পশ্চিমঘাটের প্রতিবাত পার্শ্বে, মেঘালয়ের প্রতিবাত পার্শ্বে, সুন্দরবনে।

৩৯। ভারতের বেশীর ভাগ স্বাভাবিক উদ্ভিদ—। সরলবর্গীয়, প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ, পর্ণমোচী।

৪০। বর্তমানে ভারতের অধিকাংশ স্থানে—সাহায্যে সেচ কার্য হয়। নানা প্রকার কূপ, জলাশয়, নদীর সহিত যুক্ত সেচখাল।

৪১। এদেশের অধিকাংশ ধান —। আউস, আমন, বোরো।

৪২। গম চাষের জন্য সাধারণতঃ -- সে মি বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। ৩০-৫০, ৬০-১০০, ১০০-২০০।

৪৩। এদেশের অধিকাংশ কার্পাস জন্মে—। (i) পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর-প্রদেশে, (ii) পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে।

৪৪। এদেশের অধিকাংশ চা উৎপন্ন হয়—। হিমাচল প্রদেশে, তামিলনাড়ুতে, আসামে।

৪৫। এদেশের অধিকাংশ কয়লা উৎপন্ন হয়—। পশ্চিমবঙ্গে, বিহারে, উড়িষ্যাতে।

৪৬। এদেশের অধিকাংশ খনিজ তৈল উৎপন্ন হয়—। পশ্চিম উপকূলের নিকটবর্তী অগভীর সমুদ্রে, দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে।

৪৭। এদেশের অধিকাংশ লৌহ আকরিক—জাতীয়। ম্যাগনেটাইট, হেমাটাইট, লিমোনাইট।

৪৮। এদেশের কার্পাস বস্ত্র শিল্পের সর্বপ্রধান অঞ্চল— । পশ্চিম ভারত, দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত।

৪৯। এদেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র— । জামসেদপুর, বোকারো, দুর্গাপুর।

৫০। এদেশের সর্বপ্রধান বন্দর— । কলিকাতা, কান্দলা, বোম্বাই।

(গ) নিম্নে কতকগুলি অসম্পূর্ণ বিবৃতি দেওয়া আছে। ইহাদের প্রত্যেকটি —চিহ্নযুক্ত শূন্য স্থানে কেবলমাত্র একটি উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া প্রত্যেক বাক্যকে ভৌগোলিক হিসাবে সত্য বা সার্থক করার ব্যবস্থা কর।

১। পৃথিবী তাহার—গতি বশতঃ প্রতিনিয়ত আপন মেরুরেখার চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরিতেছে।

২। ২১শে জুন মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি কর্কটক্রান্তির উপর—ভাবে পতিত হয়।

৩। ২১শে বা ২২শে ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধে—ঋতুর মধ্য ভাগ।

৪। গঠন হিসাবে হিমালয়—জাতীয় পর্বত।

৫। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান গঙ্গা নদীর—অন্তর্গত।

৬। পার্বত্য অঞ্চলে কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত নদীর উপত্যকার আকৃতি—এর মত।

৭। যমুনা গঙ্গার ডান তটের—।

৮। নদীর—গতিতে ইহার ক্ষয়, পরিবহন ও সঞ্চয়—এই তিন কার্যই লক্ষ্য করা যায়।

৯। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বৎসর উষ্ণতা —।

১০। ভূপৃষ্ঠ হইতে ক্রমশঃ উপরদিকে বায়ুর উষ্ণতা — হয়।

১১। উষ্ণ জলীয় বাষ্প ক্রমশঃ—হইয়া মেঘের সৃষ্টি হয়।

১২। হিমালয় পর্বতের—দিকের ঢালে আর্দ্র মৌসুমী বায়ু দ্বারা সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়।

১৩। বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগের সবচেয়ে বেশী সুবিধা—পথে।

১৪। মধ্য এশিয়ার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণদিকের স্থানসমূহকে ভারতীয়— —বলে।

১৫। ভারতের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ—।

১৬। দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ— ।

১৭। হিমালয়ের — অংশে নিম্ন শিবালিক পর্বত।

১৮। গঙ্গার সর্বপ্রধান উপনদী — ।

১৯। ভারতের—বাঁধ পৃথিবীর সর্বোচ্চ নদী-বাঁধ।

২০। পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বত দক্ষিণদিকে—পর্বতে পরস্পর মিলিত হইয়াছে।

২১। গঙ্গোত্রীর পশ্চিমে অবস্থিত—গঙ্গা নদীর উৎসস্থল।

২২। মেঘালয়ের—তে বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ পৃথিবীতে সর্বোচ্চ।

২৩। ব্রহ্মপুত্রের—দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম নদী-দ্বীপ।

২৪। ভারতের—মালভূমি এদেশের খনিজ সম্পদের সর্বপ্রধান অঞ্চল।

২৫। ভারতের দীর্ঘতম সেচ খালের নাম—ক্যানেল।

২৬। —নদীর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য মালভূমি।

২৭। ভারতের পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণ অংশকে বলে—উপকূল।

২৮। হিমালয়ের—অংশ সরলবর্গীয় গাছের বিস্তীর্ণ বনভূমি।

২৯। ভারতের পশ্চিম উপকূলের অদূরে—এদেশে খনিজ তৈল উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র।

৩০। ভারতের কার্পাস বস্ত্র শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র—।

(ঘ) নিম্নের অসম্পূর্ণ বিবৃতিগুলিতে একাধিক—চিহ্নযুক্ত শূন্য স্থান আছে। এরূপ প্রত্যেক স্থানে একটি উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া বাক্যগুলিকে ভৌগোলিক হিসাবে সত্য বা সার্থক করার ব্যবস্থা কর।

১। প্রতি বৎসর ২১শে—ও তাহার ছয় মাস পরে ২২শে বা ২৩শে—মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পতিত হয়।

২। ২১শে ডিসেম্বর—গোলার্ধে গ্রীষ্ম কালের মধ্য ভাগ ও —গোলার্ধে শীত কালের মধ্য ভাগ।

৩। এশিয়ার হিমালয়, ইওরোপের—, দক্ষিণ আমেরিকার—ও উত্তর আমেরিকার —ভঙ্গিল পর্বতের বিখ্যাত উদাহরণ।

৪। নদীর উপত্যকার নিম্নভূমিতে অধিক পলি সঞ্চয়ের ফলে—ভূমি ও মোহনাতে ঐ প্রকার সঞ্চয়ের ফলে—ভূমি সৃষ্টি হয়।

৫। পার্বত্য অঞ্চলে কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত অংশে নদীর উপত্যকার আকৃতি —এর মত, সমভূমিতে কোমল শিলা দ্বারা গঠিত অংশে নদীর উপত্যকার আকৃতি —এর মত।

৬। পার্বত্য অঞ্চলে নদীর—ও—কার্য সুস্পষ্ট, অথচ মোহনার নিকট নদীর কাজ—ও—।

৭। বায়ুমন্ডলের ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন সর্বনিম্ন স্তর হইতে ক্রমশঃ উপর দিকে বায়ুর — —।

৮। —অঞ্চলে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু সোজাসুজি উপর দিকে উঠিবার ফলে ঘনীভূত হইয়া যে বৃষ্টি হয়, তাহাকে—বৃষ্টি বলে।

৯। ভারতের পূর্বদিকের থাইল্যান্ড, মালয়শিয়া প্রভৃতিকে—এশিয়া ও পশ্চিমদিকের ইরান, ইরাক প্রভৃতিকে—এশিয়া বলে।

১০। হিমালয় অঞ্চলের উত্তর অংশের সর্বোচ্চ শ্রেণীকে—হিমালয় ও দক্ষিণ অংশের সর্বনিম্ন শ্রেণীকে—বলে।

১১। রাজস্থানের—ও মধ্যভারতের—এদেশের দুইটি প্রধান ক্ষয়জাত পর্বত।

১২। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ সীমার সামান্য উত্তরে দাক্ষিণাত্যের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ —, আর তাহার সামান্য উত্তরে বিখ্যাত—গিরিপথ।

১৩। গঙ্গার ডান তটের উপনদীর মধ্যে— ও বাম তটের উপনদীর মধ্যে—বৃহত্তম।

১৪। ভারতের ব্রহ্মপুত্র নদ অরুণাচলে—নামে ও বাংলাদেশে—নামে পরিচিত।

১৫। 'দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা' নামে পরিচিত—নদীর বদ্বীপের ঠিক দক্ষিণে—নদীর বদ্বীপ।

১৬। পশ্চিমঘাট পর্বতের—ঢালে ও হিমালয়ের—ঢালে বৃষ্টির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী।

১৭। এদেশের খারিফ ফসলের জন্য সেচের প্রয়োজন—, রবি শস্যের জন্য সেচের প্রয়োজন—।

১৮। দাক্ষিণাত্য মালভূমির মধ্য ভাগে—এর সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা অধিক, আর উত্তর প্রদেশে—এবং—এর সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা বেশী।

১৯। ভারতে—, —ও বোরো, এই তিন রকম ধানের চাষ হয়।

২০। উত্তর ভারতের সেচ অঞ্চলে খাদ্য শস্যের মধ্যে— ও বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে—অধিক জন্মে।

২১। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে আখ সবচেয়ে বেশী জন্মে—এ এবং চা সবচেয়ে বেশী জন্মে—এ।

২২। এদেশে কয়লা উৎপাদনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র—, —রাজ্যে অবস্থিত।

২৩। —কে 'Black gold' বলে ; ইহার সর্বপ্রধান উপজাত দ্রব্য—।

২৪। মহারাষ্ট্রের — ও রাজস্থানের—কেন্দ্রে আণবিক শক্তি উৎপন্ন হয়।

২৫। এদেশে কার্পাস বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রগুলির মধ্যে— ও—সবচেয়ে বড়।

২৬। এদেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বৃহৎ কেন্দ্রের মধ্যে—মধ্য প্রদেশে ও—উড়িষ্যাতে অবস্থিত।

২৭। এদেশের—ও—রেলওয়েজের কেন্দ্র কলিকাতাতে।

২৮। ভারতের বৃহত্তম নগর—এবং বৃহত্তম বন্দর—।

২৯। দাক্ষিণাত্য মালভূমির বৃহত্তম নগর —এবং দেশের মুক্ত বাণিজ্যের প্রথম বন্দর—।

৩০। মালয়শিয়াতে—ও—এর উৎপাদন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী।

৩১। জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি—কে পৃথিবীর —বলা হয়।

৩২। ভারতের উত্তরে হিমালয় ও—পর্বতের মাঝখানে—পৃথিবীর বৃহত্তম উচ্চ মালভূমি।

৩৩। এশিয়ার পূর্ববাহিনী বৃহৎ নদী আমুর,—, — ও ইয়াং সিকিয়াং।

৩৪। ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত—সে দেশের বৃহত্তম বন্দর ও—শোধনের কেন্দ্র।

৩৫। ইরানের রাজধানী—সেদেশের উত্তর অংশের—পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত।

৩৬। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম অংশের—পর্বত ভূগঠন হিসাবে—জাতীয় পর্বত।

৩৭। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী—আফ্রিকার—অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত।

৩৮। পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি—আফ্রিকার—অংশে অবস্থিত।

৩৯। —মহাদেশের একমাত্র—নদী তাহার গতিপথে দুই বার নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিয়াছে।

৪০। পৃথিবীতে এক মাত্র—নদের উৎসের আশপাশে সারা বৎসর বৃষ্টি হয়, মধ্য ভাগ প্রায় বৃষ্টিহীন, আর উত্তর অংশে—অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি হয়।

(ঙ) নিম্নে ভারতের অথবা এশিয়ার বিভিন্ন অংশের নাম লিখিয়া প্রত্যেকটি নামের পাশে কতক পাহাড়, নদ নদী, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, জীবজন্তু, উৎপন্ন দ্রব্য, প্রধান স্থান প্রভৃতির নাম দেওয়া আছে। ইহাদের মধ্যে যেগুলি ঐ অংশের অন্তর্গত নহে বা যেখানে ঐ জিনিস নিতান্ত কম পরিমাণে পাওয়া যায় তাহাদের নাম × চিহ্ন দ্বারা কাটিয়া দাও। কোন কোন ক্ষেত্রে কতক জিনিসের এক একটি গোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়া পাশে পাশে জিনিসের নাম লেখা হইয়াছে। এক্ষেত্রেও যে নামটি ঐ গোষ্ঠীর অন্তর্গত নহে তাতে × চিহ্ন দাও।

১। হিমালয় অঞ্চল—জাস্কর, পির পঞ্জাল, নীলগিরি, ধবলাধর, শিবালিক।

২। উত্তর পূর্বাঞ্চল—বরাইল, মিসমি, মিকির, আনাইমুদি।

৩। গঙ্গা-সমভূমি—গম, ধান, রাগি, বাজরা, কার্পাস, আখ।

৪। দাক্ষিণাত্য মালভূমি—পাঁচমারি, কস্তুলবাই, মহেন্দ্রগিরি, ফালুট, আনাইমুদি।

৫। পশ্চিম উপকূল—বোম্বাই, কলিকাতা, ম্যাঙ্গালোর, কোচিন।

৬। উত্তর ভারত—গণ্ডক, কোশী, শোণ, কৃষ্ণা, যমুনা।

৭। দক্ষিণ ভারত—মহানদী, গোদাবরী, কাবেরী, তাপ্তী, সিন্ধু।

৮। হিমালয় অঞ্চল—পাইন, ফার, দেবদারু, সেগুন, চন্দন।

৯। সুন্দরবন অঞ্চল—শাল, গরাণ, গেঁওয়া, কেয়া, সোঁদরী।

১০। খাদ্যশস্য—ধান, গম, রাগি, বাজরা, আখ।

১১। কয়লা খনি—ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, জামসেদপুর, গিরিধি, বোকারো।

১২। খনিজ তৈল অঞ্চল—এঙ্কলেশ্বর, বম্বে হাই, নাহারকাটিয়া, ওয়ার্ধা, কাম্বে।

১৩। লোহখনি—বাস্তার, গুরুমহিষাণী, কটক, দুর্গ, গোয়া।

১৪। কার্পাস শিল্পেরকেন্দ্র—আহ্মদাবাদ, বরোদা, বোম্বাই, বাটানগর, গোয়ালিয়র।

১৫। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র—দুর্গাপুর, ভিলাই, বর্ধমান, রৌরকেল্লা, ভদ্রাবতী।

১৬। ঘনবসতি অঞ্চল—পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, অরুণাচল, কেরালা।

১৭। প্রধান বন্দর—বিশাখাপটনম, বোম্বাই, কান্দলা, হায়দরাবাদ, কোচিন।

১৮। এশিয়া—ওব, ইয়েনিসি, হোয়াং হো, পামির, আমুর।

১৯। মালয়শিয়া—রবার, খেজুর, নারিকেল, চা।

২০। ইরান—তেহরান, কাবুল, ইস্পাহান, আবাদান, মেসেদ।

২১। আফ্রিকা—এলবার্ট, ট্যাঙ্গানিকা, জায়রে, ভিক্টোরিয়া।

২২। নীলনদের অববাহিকা—হোয়াইট নীল, জাম্বেসী, ব্লু নীল, আটবারা, বাহর এল জেবেল।

(চ) পর পৃষ্ঠায় প্রত্যেক সারিতে কতকগুলি এক জাতীয় স্থান বা জিনিসের নাম দেওয়া আছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রের নির্দেশ অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইয়া লিখ বা পাশে পাশে চিহ্ন দাও।

১। নিম্নলিখিত দেশগুলির মধ্যে যেগুলি দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অন্তর্গত তাহাদের প্রত্যেকের নামের ডানপাশে √ চিহ্ন দাও।

ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, ইরাক, ইরান, মঙ্গোলিয়া।

২। নিম্নলিখিত দেশগুলির মধ্যে যেগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্গত তাহাদের প্রত্যেকের নামের ডানপাশে √ চিহ্ন দাও।

ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, নেপাল।

৩। হিমালয় অঞ্চলের নিম্নলিখিত পর্বতশৃঙ্গগুলির মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ তাহার নামের ডানপাশে ১ এবং যেটি উচ্চতায় দ্বিতীয় তাহার নামের ডানপাশে ২ লিখ।

নন্দাদেবী, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলাগিরি, নাঙ্গা পর্বত।

৪। নিম্নলিখিত নদীগুলির মধ্যে যেটি দীর্ঘতম তাহার নামের ডানপাশে ১ এবং যেটি দ্বিতীয় তাহার নামের ডানপাশে ২ লিখ।

মহানদী, গোদাবরী, নর্মদা, তাপ্তী, কৃষ্ণা।

৫। নিম্নলিখিত নগরগুলির মধ্যে যেটির লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশী তাহার নামের ডানপাশে ১ ও যেটির স্থান দ্বিতীয় তাহার নামের ডানপাশে ২ লিখ।

মাদ্রাজ, পুণা, কানপুর, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী।

৬। নিম্নলিখিত বন্দরগুলির মধ্যে যেগুলি ভারতের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত তাহাদের প্রত্যেকের নামের ডান পাশে পূ এবং যেগুলি ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত তাহাদের প্রত্যেকের নামের বাম পাশে প লিখ।

মাদ্রাজ, বিশাখাপটনম্, কান্দলা, কোচিন, ম্যাঙ্গালোর, টুটিকোরিন।

(চ) নিম্নে ভারতের নানাজাতীয় কতক উৎপন্ন দ্রব্যের নাম দেওয়া গেল। তাহাদের প্রত্যেকের ডানপাশে ( ) আছে। ঐ উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্ জাতীয় তাহা স্থির কর। তারপর তাহার ডানপাশের ( ) এর মধ্যে ঐ জাতির আদ্যক্ষর লিখ। যেমন, কৃষিজ সম্পদ্ (কৃ), খনিজ সম্পদ্ (খ), প্রাণিজ সম্পদ্ (প্রা), স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ (স্বা), শিল্পদ্রব্য (শি)।

সেগুন ( ), ধান ( ), কয়লা ( ), চট ( ), শাল ( ), বাজরা ( ), নারিকেল ( ), টিন ( ), লোহ ( ), পাট ( ), পাইন ( ), কার্পাসবস্ত্র ( ), খনিজ তৈল ( ), চা ( ), আখ ( ), আবলুস ( )।

(জ). নিম্নের প্রত্যেক সারিতে কতকগুলি নাম দেওয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটি ভিন্ন বাকী সবগুলি এক জাতীয় স্থান বা জিনিসের নাম। প্রত্যেক সারির ভিন্ন জাতীয় শব্দটি × চিহ্ন দ্বারা কাটিয়া দাও।

১। ইরান, নেপাল, ভুটান, কলিকাতা, বাংলাদেশ।

২। হিন্দী, তামিল, তেলেগু, মারাঠী, শিখ, উর্দু।

৩। কারাকোরম, পিরপঞ্জাল, নন্দাদেবী, শিবালিক, বিন্ধ্য।

৪। ছোটনাগপুর, নীলগিরি, বুন্দেলখন্ড, মেঘালয়।

৫। গন্ডক, ঘাঘরা, কোশী, নর্মদা, শোণ।

৬। মহানদী, তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা।

৭। আবলুস, বাঁশ, মেহগিনি, গর্জন, চাপলাস।
৮। ধান, গম, বাজরা, পাট।
৯। কয়লা, আখ, খনিজ তৈল, লোহ আকরিক।
১০। চট, থলে, ত্রিপল, দড়ি, চা।
১১। জাতীয় সড়ক, বিমানপথ, রাজ্য সড়ক, জেলাপথ।
১২। কান্দলা, হায়দরাবাদ, পারাদীপ, টুটিকোরিন।

(ঝ) নিম্নে প্রত্যেক সারিতে তিনটি করিয়া শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম শব্দটির বা শব্দগুচ্ছের সহিত দ্বিতীয় শব্দটির বা শব্দগুচ্ছের সম্পর্ক স্থির কর। তারপর তৃতীয় শব্দটির বা শব্দগুচ্ছের সহিত যে শব্দের বা শব্দগুচ্ছের ঠিক সেইরূপ সম্পর্ক, তাহাকে তৃতীয় শব্দটির বা শব্দগুচ্ছের ডান পাশে লিখ।

১। কর্কটক্রান্তি : ২১শে জুন : : মকরক্রান্তি :
২। কঠিন শিলা : উপত্যকার আকৃতি I : : কোমল শিলা :
৩। নিরক্ষীয় অঞ্চল : অধিক উষ্ণতা : : মেরু অঞ্চল :
৪। উত্তপ্ত বায়ু : নিম্নচাপ : : শীতল বায়ু :
৫। প্রতিবাত পার্শ্ব : অধিক বৃষ্টি : : অনুবাত পার্শ্ব :
৬। অপরাহ্ন : সমুদ্রবায়ু : : শেষ রাত্রি :
৭। হিমালয় : এভারেস্ট : : কারাকোরাম :
৮। পশ্চিমঘাট : সহ্যাদ্রি : : পূর্বঘাট :
৯। গঙ্গা : গোমুখ : : সিন্ধু :
১০। কাবেরী : শিবসমুদ্রম্ : : নর্মদা :
১১। আউস ধান : ভাদ্র মাস : : আমন ধান :
১২। গম : পঞ্জাব : : আখ :
১৩। পাট : পশ্চিমবঙ্গ : : চা :
১৪। বিহার : ঝরিয়া : : পশ্চিমবঙ্গ :
১৫। গোয়া : লোহ আকরিক : : বম্বে হাই :
১৬। লোহ ও ইস্পাত : জামসেদপুর : : কার্পাস বস্ত্র :
১৭। কেরালা : অরুণাচল : : ঘনবসতি :
১৮। ইরান : খনিজ তৈল : : মালয়শিয়া :
১৯। এশিয়া : ওব-ইয়েনিসি : : আফ্রিকা :
২০। ইরান : তেহেরান : : মালয়শিয়া :
২১। আফ্রিকা : কিলিমাঞ্জোরো : : এশিয়া :

II. নক্সা, মানচিত্র প্রভৃতি পাঠ

এই পুস্তকের প্রথম হইতে ষষ্ঠ, এই ছয় অধ্যায়ে ৩০ খানা চিত্র ও নক্সা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সহজ ভাবে বুঝিবার পক্ষে ইহাদের সাহায্য

বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দয়া করিয়া ইহাদের ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবেন। নিম্নে কয়েকটি কথা উদাহরণ স্বরূপ লেখা হইল।

(i) **প্রথম অধ্যায়**—ঋতু পরিবর্তনের বিষয় বুঝিতে হইলে পৃথিবী গোলকের চিত্রগুলি ভাল ভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে পৃথিবীতে শীত বা উত্তাপ কোনটিই অধিক নয়। জুন মাসে সূর্যরশ্মি কর্কট ক্রান্তির উপর লম্ব ভাবে পতিত হওয়ার ফলে তখন উত্তর গোলার্ধে দিন বড় এবং আলোকের পরিমাণ বেশী—ইহা চিত্রে স্পষ্ট দেখা যায়। কাজেই তখন উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল, ইহাও বুঝা যায়। তাহার বিপরীত অবস্থা তখন দক্ষিণ গোলার্ধে। আর ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ গোলার্ধে মকর ক্রান্তির উপর সূর্যরশ্মি লম্ব ভাবে পতিত হয় বলিয়া তখন তথায় গ্রীষ্মকাল, চিত্র দেখিয়া ইহাও বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

(ii) **দ্বিতীয় অধ্যায়**—ভঙ্গিল পর্বত ও স্তূপ পর্বত সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থার চিত্রগুলি লক্ষ্য করিলে কিভাবে পর পর অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং শেষ পর্যন্ত পর্বত সৃষ্টি হয় তাহা সহজে বুঝা যায়। সেরূপ আগ্নেয় পর্বতের চিত্রের ১, ২, ৩, ৪নং অবস্থা লক্ষ্য করিলে কি ভাবে আগ্নেয় পদার্থ বা লাভাস্তূপ সঞ্চিত হইতে হইতে উচ্চতা বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পর্বতের আকার ধারণ করে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

(iii) স্থলভাগের ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদান (কাঁকর, বালুকা, পলি প্রভৃতি) উপকূল হইতে কি ভাবে নিকটবর্তী সমুদ্রে গিয়া সঞ্চিত হয় এবং সঞ্চয়ের ফলে ক্রমশঃ কি ভাবে ঐ অংশ উঁচু হইতে থাকে এবং পাশের দ্বীপ, চর প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া যথেষ্ট প্রশস্ত উপকূল সমভূমি সৃষ্টি হয় তাহা চিত্রগুলির সাহায্যে স্পষ্ট রূপে বুঝা যায়।

(iv) **তৃতীয় অধ্যায়**—পার্বত্য অঞ্চলের কঠিন শিলার উপর দিয়া প্রবাহিত নদীর উপত্যকার আকৃতি I এর মত। কিন্তু সেই নদীই যখন সমভূমির কোমল শিলার উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তখন তাহার উপত্যকার আকৃতি কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহাও চিত্রগুলির সাহায্যে স্পষ্ট বুঝা যায়। অবশ্য এবিষয়ে নদীতে ক্রমশঃ অধিক জলের প্রবাহও একটি বিশেষ কারণ। তারপর কিভাবে নদীর উপত্যকাতে পলি, কাঁকর প্রভৃতি সঞ্চয়ের ফলে প্লাবন ভূমি সৃষ্টি হয়, আর নদীর মোহনাতে ঐ সকল জিনিসের সঞ্চয়ের দ্বারা বদ্বীপ সৃষ্টি হয় তাহাও চিত্রে সহজে লক্ষ্য করা যায়। তাহাছাড়া কিভাবে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয় এবং প্লাবনের সময় কিরূপ অবস্থা হয়, এসকল বিষয়ও এই পুস্তকের বিভিন্ন চিত্রের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়।

(v) **চতুর্থ অধ্যায়**—যে কোন স্থানে দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যরশ্মি কিভাবে পতিত হয় চিত্রে তাহা লক্ষ্য করিলে প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা প্রভৃতি অবস্থা বুঝিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। আমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সহিত ইহা মিলাইয়া নিলে সহজেই উষ্ণতার পরিবর্তন বুঝিতে পারা যায়। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্যরশ্মি কিভাবে পতিত হয় তাহাও চিত্রে লক্ষ্য করিলে নিরক্ষরেখা হইতে ক্রমশঃ উত্তর-দক্ষিণে উষ্ণতা কমিয়া যাওয়ার বিষয়টি সহজেই বুঝা যায়।

(vi) **পঞ্চম অধ্যায়**—সূর্যরশ্মির প্রভাবে জলরাশি কিভাবে উত্তপ্ত হয় এবং জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হয়, আর তাহা কিভাবে উপর দিকে উঠিয়া গিয়া মেঘের সৃষ্টি

হয় চিত্রে তাহা স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। তারপর ঐ মেঘের প্রভাবে কিভাবে শৈলোৎক্ষেপ ও পরিচলন বৃষ্টি হয় তাহাও চিত্রগুলি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

(vii) **ষষ্ঠ অধ্যায়**—পূর্বের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের চিত্রগুলির সাহায্যে বায়ুর উষ্ণতা, প্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের সম্পর্কও স্পষ্ট বুঝা যায়। তাহাছাড়া কিভাবে উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি পরিমাপ করা যায় তাহার চিত্রও দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বিষয়টি বুঝাইয়া দিতে পারেন।

(viii) **সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়**—এশিয়ার বিভিন্ন মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে এশিয়াতে ভারতের অবস্থান, বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যভাগে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ও ভারতীয় উপমহাদেশের ধারনা খুব সহজে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে।

(ix) **নবম অধ্যায়**—পৃথক্ পৃথক্ মানচিত্রের সাহায্যে হিমালয়ের বিভিন্ন শাখার অবস্থান ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন পাহাড়ের অবস্থান খুব পরিষ্কার ভাবে দেখান হইয়াছে। সেরূপ মধ্য ভারতের উচ্চভূমি ও দাক্ষিণাত্য মালভূমি, উত্তর ভারতের সমভূমি, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমি প্রভৃতির অবস্থা বুঝাইবার জন্যও পৃথক্ পৃথক্ মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটির সাহায্যে ঐ সকল অঞ্চলের অবস্থা খুব সহজেই ভাল ভাবে বুঝা যায়। আগেকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিবরণ ও চিত্রগুলিও এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বুঝিবার পক্ষে বিশেষ ভাবে সহায্য করে।

(x) উপরের (নবম অধ্যায়) মানচিত্রগুলির সাহায্যে এদেশের নদ নদীর উৎপত্তি ও প্রবাহের দিক্ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হয়। **দশম অধ্যায়ের মানচিত্র** লক্ষ্য করিলে নদীগুলির গতিপথ বুঝিতে পারিবে। কোন্ কোন্ নদীর মোহনাতে বদ্বীপ আছে তাহাও বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হয়। আগেকার তৃতীয় অধ্যায়ের চিত্রগুলিও বিষয়বস্তুর সহিত মিলাইয়া পড়িলে এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান আরও দৃঢ় হইবে।

(xi) **একাদশ অধ্যায়ের** দুইখানা মানচিত্রে এদেশের গ্রীষ্ম ও শীতকালে উষ্ণতার অবস্থা, বায়ুপ্রবাহের দিক্ ও বৃষ্টিপাতের বিষয় স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। আগেকার চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের চিত্রগুলি ও বিবরণের সহিত মিলাইয়া পড়িলে এসকল বিষয় বুঝিবার পক্ষে আরও সুবিধা হয়।

(xii) **দ্বাদশ অধ্যায়ের** মানচিত্রখানা ভাল ভাবে লক্ষ্য করিলে এদেশের বিভিন্ন অংশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর সহিত স্বাভাবিক উদ্ভিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সহজেই বুঝিতে পারা যায় এবং বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে কোনরূপ ভুল হওয়ার ভয় থাকিবে না।

(xiii) **ত্রয়োদশ অধ্যায়ের** মানচিত্রে দেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে সেচকার্য হয় এবং কোথায় কিভাবে সেচের ব্যবস্থা করা হয় তাহা লক্ষ্য করিবে। তাহা হইলে কেন, তাহা করা হয় তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর বিভিন্ন ফসল চাষ সম্পর্কিত মানচিত্র লক্ষ্য করিলে বিভিন্ন ফসলের সহিত ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, সেচব্যবস্থা প্রভৃতির সম্পর্কও বুঝিতে পারা যায়। যেমন, গম, আখ, কার্পাস প্রভৃতি অধিক

জন্মে উত্তর ভারতের সেচ অঞ্চলে। আর পাট, ধান অধিক জন্মে দেশের পূর্বদিকের অংশে যেখানে বৃষ্টি অধিক। রাগি, বাজরা জন্মে দাক্ষিণাত্যের নিকৃষ্ট জমিতে, যেখানে বৃষ্টি কম।

(xiv) **চতুর্দশ অধ্যায়ের** খনিজ সম্পদ্ সংক্রান্ত মানচিত্র লক্ষ্য করিলে ছোটনাগপুর অঞ্চলের গুরুত্ব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর খনিজ তৈল সম্পর্কে দেশের উত্তর-পূর্ব অংশ ও পশ্চিম উপকূলের গুরুত্বও স্পষ্ট বুঝা যায়।

(xv) **পঞ্চদশ অধ্যায়ের** মানচিত্রগুলির সঙ্গে একাদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ের মানচিত্র মিলাইয়া দেখিলে বিভিন্ন শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলি কোথায় অবস্থিত ও কেন তথায় অবস্থিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

(xvi) **ষোড়শ অধ্যায়ে** যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কিত মানচিত্রগুলি লক্ষ্য করিলে দেশের প্রধান নগর, বন্দর, শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতির মধ্যে যাতায়াত ও পরিবহনের উপযোগী কোন্ ব্যবস্থা অধিক ও কেন অধিক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

(xvii) **সপ্তদশ অধ্যায়ে** লোকবসতির প্রথম মানচিত্রখানা দেখিলে কোন্ রাজ্যে লোকবসতি কিরূপ বেশী বা কম তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর দ্বিতীয় মানচিত্র দেখিলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেও কোথায় লোকবসতি বেশী বা কম তাহা বুঝা যায়।

আগের ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ অধ্যায়ের মানচিত্রগুলি দেখিলে এসম্পর্কে পার্থক্যের কারণও বুঝিতে পারা যায়।

(xviii) **অষ্টাদশ অধ্যায়ের** মানচিত্রখানা লক্ষ্য করিলে এবং আগেকার অধ্যায়ের মানচিত্র মিলাইয়া দেখিলে দেশের প্রধান নগর ও বন্দরগুলির অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা জন্মিবে।

(xix) এশিয়া ও আফ্রিকার দুইখানা প্রাকৃতিক মানচিত্র দেখিলে দুই মহাদেশের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা জন্মিবে। আর বিভিন্ন অঞ্চলগুলির পৃথক্ পৃথক্ মানচিত্র লক্ষ্য করিলে তাহাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

III নক্সা, চিত্র ও মানচিত্র অঙ্কন

বর্তমান পাঠ্যসূচীতে কতকগুলি চিত্র ও মানচিত্র অঙ্কনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীগণ বিভিন্ন নক্সা, চিত্র ও মানচিত্র পাঠের সময় যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছে তাহা অনুসরণ করিয়া নিজেরা চিত্র ও মানচিত্র আঁকিলে অনেক বেশী লাভবান্ হইবে ও তাহাদের শিক্ষা সার্থক হইবে।

(i) জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত চিত্র আঁকিবার সময় মানচিত্র পাঠ সম্পর্কে উপরে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। মেরুরেখার হেলান অবস্থা এবং কোন্ সময়ে কোথায় সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পতিত হয় তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(ii) বায়ুর উষ্ণতা, প্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক সম্বন্ধে চিত্র আঁকিবার সময় ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের চিত্রগুলি পাঠ সম্পর্কে যে সকল বিষয় লেখা হইয়াছে তাহা মনে রাখিতে হইবে।

(iii) ভারতের অবস্থান সংক্রান্ত মানচিত্র আঁকিবার সময় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যভাগে এদেশের অবস্থান এবং তাহার পূর্বদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও পশ্চিমে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অবস্থান বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

(iv) **ভারতের মানচিত্র অংকন**—ইহার পর ছাত্র-ছাত্রীগণ ভারতের অন্ততঃ ১৫ খানা সীমারেখা মানচিত্র (Outline map) আঁকিবে। এখানে দুইটি পদ্ধতি পর পর দেখান হইল।

ছকের সাহায্যে মানচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি
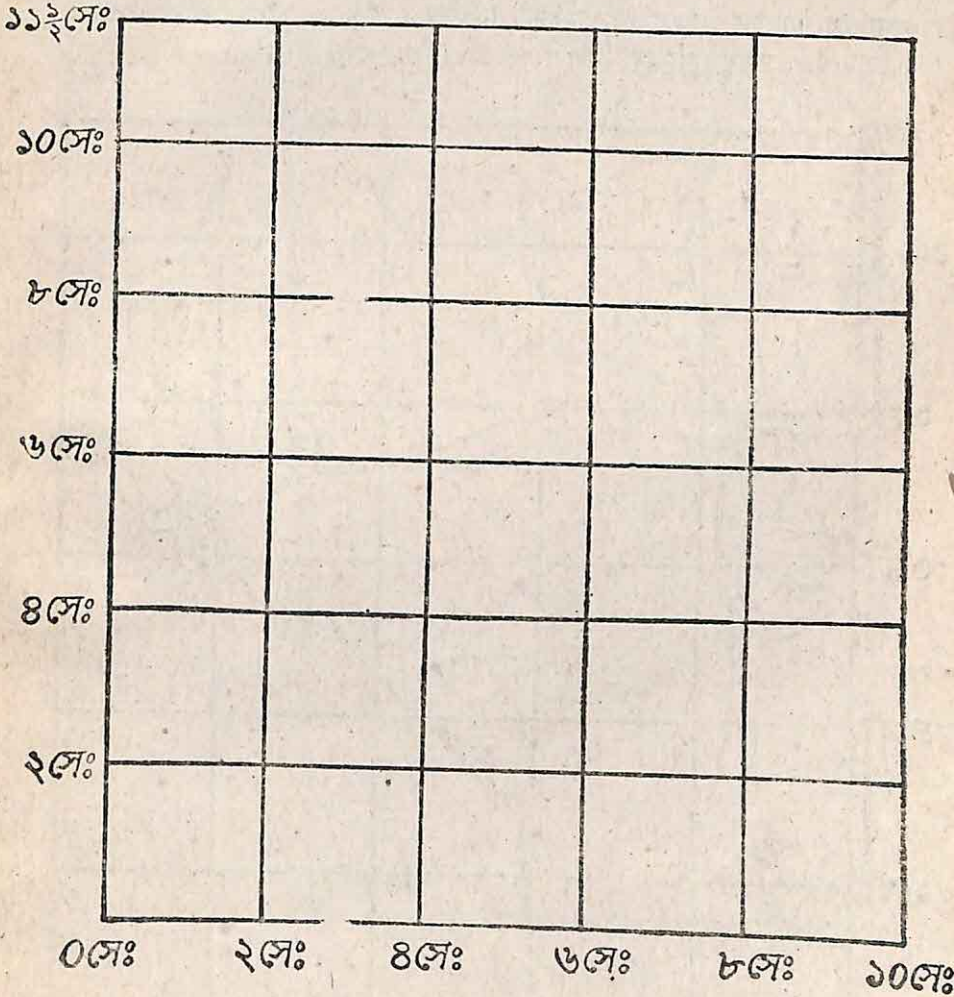
প্রথম পদ্ধতিতে তাহারা কাগজের উপর ছক আঁকিবে। তাহারা বড় কাগজে ২", ৩" বা ৫ সে মি, ৭½ সে মি প্রভৃতি মাপের ফাঁক দিয়া ছক আঁকিতে পারে। এখানে ২ সে মি ফাঁক দিয়া ছক আঁকা হইল। ভারতের উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২১৪ কি মি এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার প্রায় ২৯৩৩ কি মি। তাহার অনুপাতে ছকের উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ১১½ সে মি এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার ১০ সে মি করা হইল। তারপর একখানা ভূচিত্রাবলী অথবা ভারতের অপর কোন নির্ভরযোগ্য মানচিত্র সামনে রাখিয়া তাহা দেখিয়া এই ছকের উপর কতকগুলি বিন্দু বসাইবে। পরে মানচিত্র দেখিয়া বিন্দুগুলিকে যোগ করিলে ভারতের সীমারেখা মানচিত্র তৈরী হইবে। ভূচিত্রাবলী অথবা অন্য যে মানচিত্র দেখিয়া এই মানচিত্র আঁকা হইবে তাহাতে পেন্সিল বা কালীর দাগ দিবে না। স্কেলের সাহায্য নিয়া ছকের উপর বিন্দুগুলি বসাইবে।
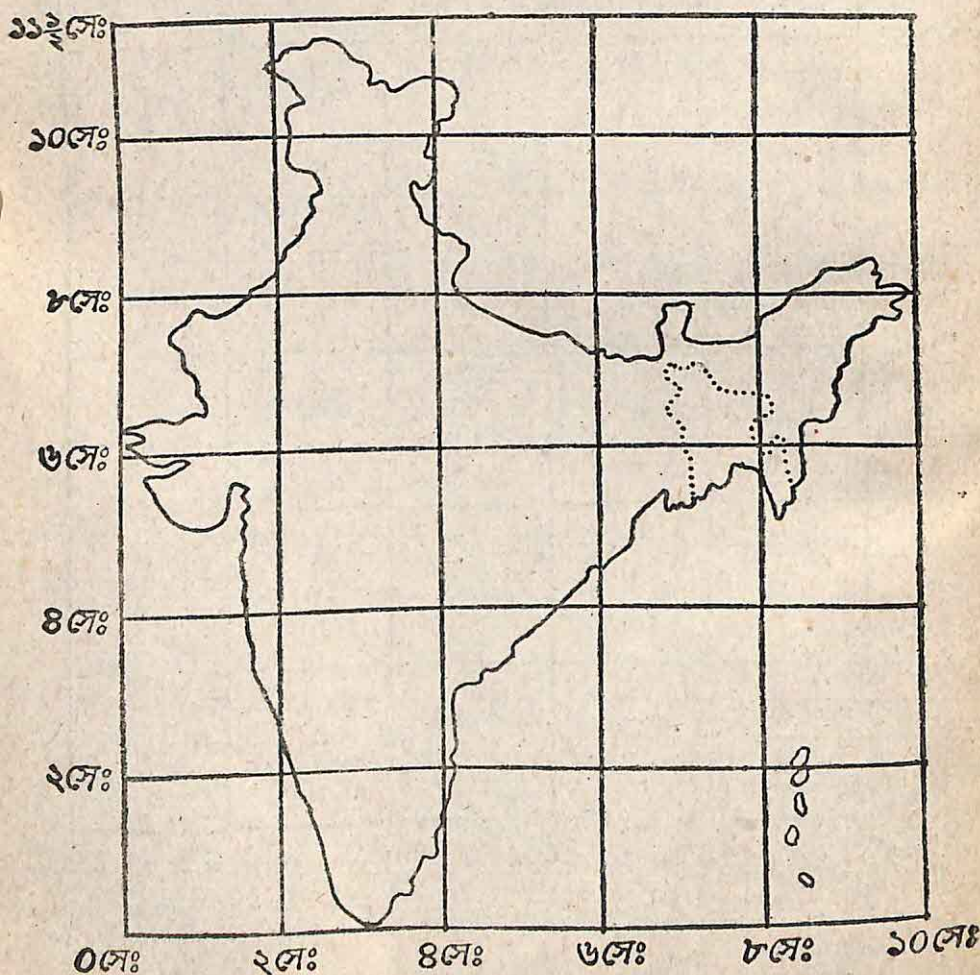
এই পদ্ধতি ছাড়া ত্রিভুজ আঁকিয়াও ভারতের সীমারেখা মানচিত্র আঁকা যায়। এখানে খ ঘ সরল রেখার (দৈর্ঘ্য প্রায় ৭.৫ সে মি) উপর ক খ ঘ এবং গ খ ঘ দুইটি ত্রিভুজ পরস্পর বিপরীত দিকে আঁকা হইয়াছে। অথচ ঐ ত্রিভুজ দুইটির ক খ বাহু = গ খ এবং ক ঘ = গ ঘ। ক গ কে যুক্ত করা হইয়াছে এবং গ ঘ কে চ পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইবার এই ত্রিভুজের সাহায্য নিয়া ভূচিত্রাবলী দেখিয়া ভারতের সীমারেখা মানচিত্র আঁকা যায়। এজন্যও প্রথমে ভূচিত্রাবলী দেখিয়া বিন্দু বসাইতে হইবে।
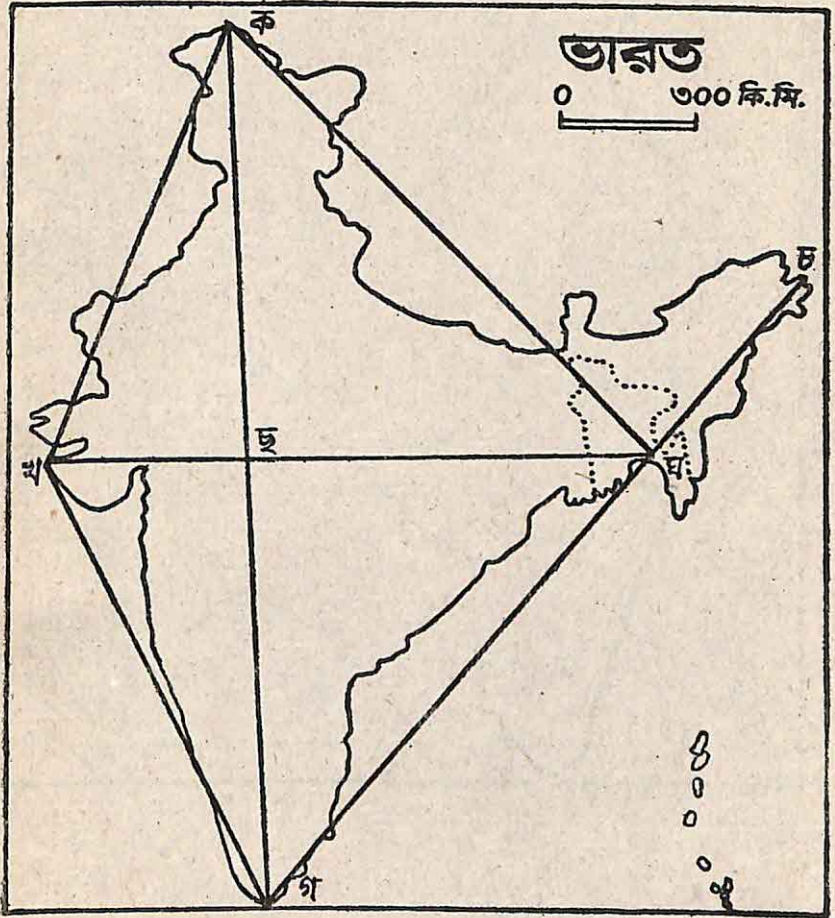
এরূপ যে-কোন পদ্ধতিতে সীমারেখা মানচিত্র আঁকার অভ্যাস করিতে করিতে এমন অবস্থা হইবে যে তখন আপনা হইতেই ভারতের সীমারেখা মানচিত্র আঁকিতে পারা যাইবে। তাহাছাড়া ট্রেসিং টেবিলের বা অন্য উপায়ে আলোর সাহায্য নিয়াও এরূপ মানচিত্র আঁকা যাইতে পারে।

সীমারেখা মানচিত্রের মধ্যে পরে রাজ্যগুলির সীমাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর সাহায্যে দেখাইতে পারা যাইবে। এবার ভূচিত্রাবলী দেখিয়া ভারতের সীমারেখা মানচিত্রে পর পৃষ্ঠায় লিখিত বিষয়গুলি নির্দেশ করিবে।
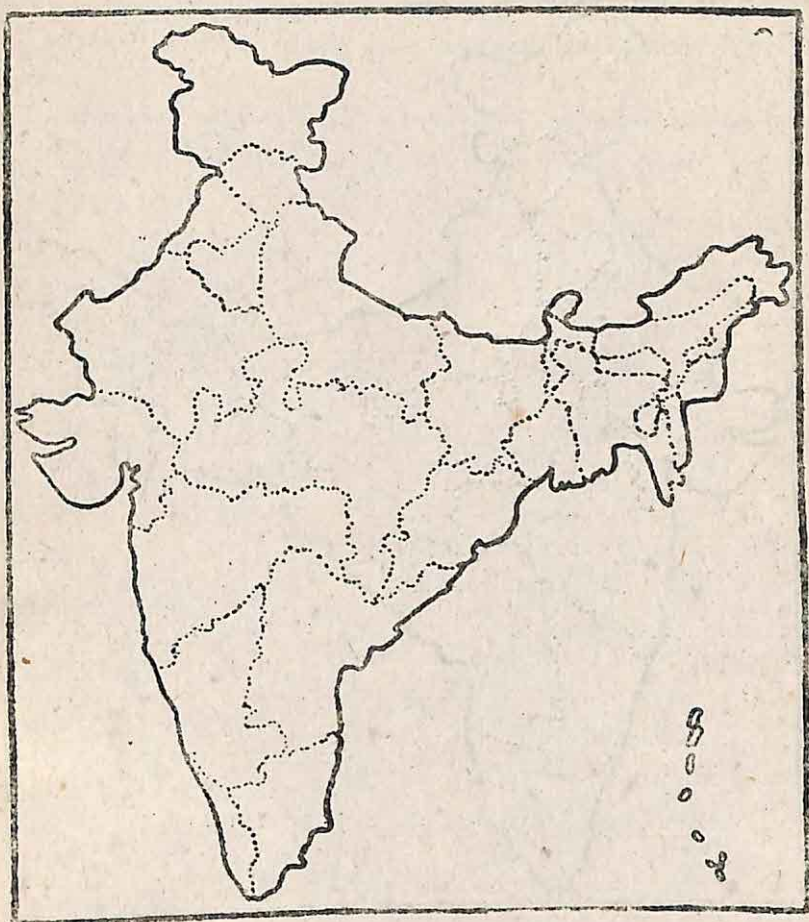
(v) ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্র আঁকিবার সময় উপরে মানচিত্র পাঠ সম্পর্কিত নির্দেশ মনে রাখিতে হইবে। নিম্নের মানচিত্রে ভারতের প্রধান পর্বতগুলির অবস্থান দেখাইতে হইবে।

স্কেল—
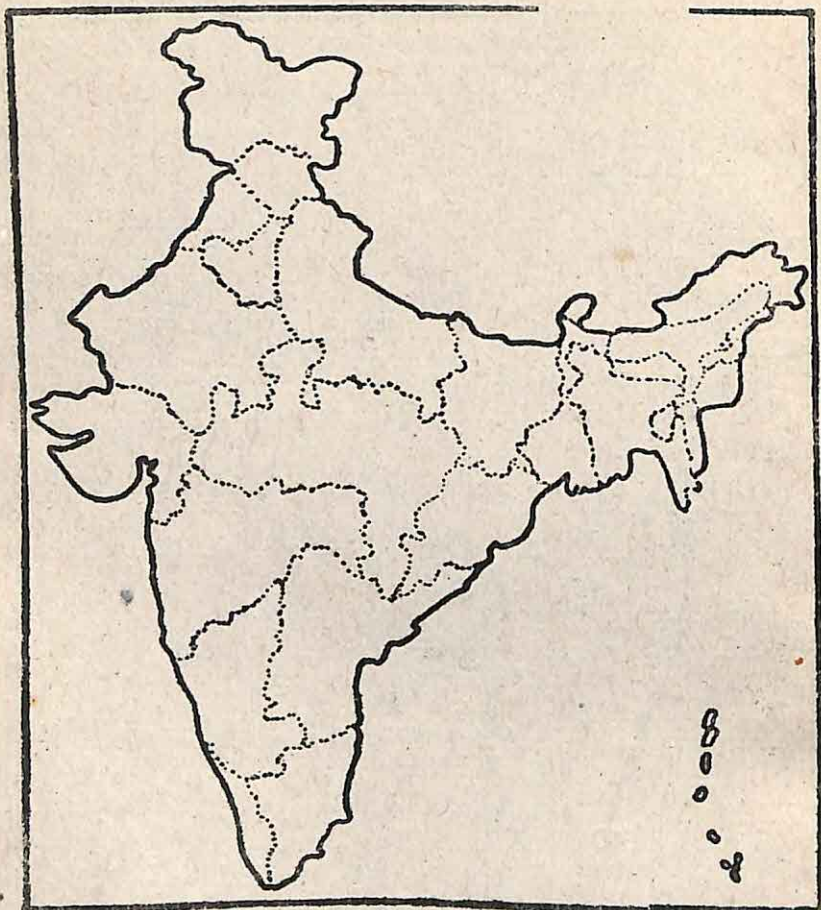
প্রধান পর্বতগুলির অবস্থান

পর্বতগুলির ও অন্যান্য উচ্চ অংশের অবস্থান দেখাইবার সময় তাহাদের সহিত নদীগুলির পথের সম্পর্ক বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেমন, দিল্লীর শৈলশিরার জন্য গঙ্গা নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। তারপর দাক্ষিণাত্য মালভূমির পূর্বদিকে ঢালের জন্য নর্মদা ও তাপ্তী ভিন্ন তথাকার অন্য সকল নদী পূর্ববাহিনী। ঐ দুইটি ব্যতিক্রম মাত্র। তাহার কারণ ঐ দুইটি গ্রস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত।
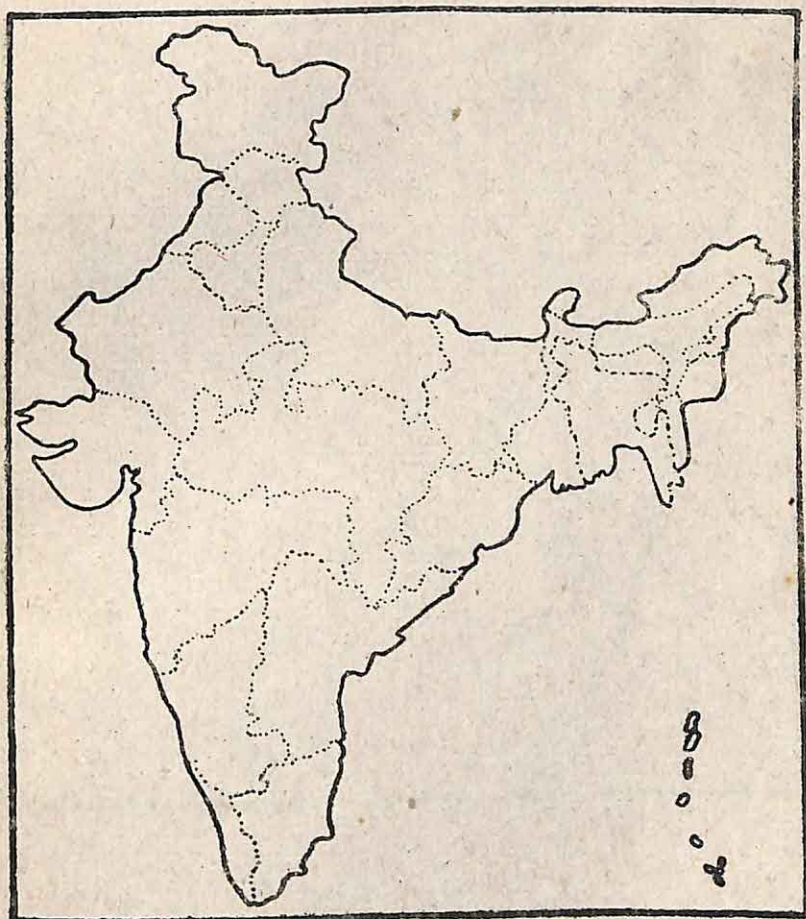
স্কেল—

প্রধান নদীগুলির গতিপথ—

(vi) ভারতের জলবায়ু সংক্রান্ত মানচিত্র আঁকিবার সময় এবিষয়ে মানচিত্র পাঠ সম্পর্কিত কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে। নিম্নে শীতকালের জলবায়ুর মানচিত্রে দেখা যাইবে তখন এদেশে বৃষ্টি অতি সামান্য, কিন্তু পর পৃষ্ঠার মানচিত্রে দেখা যাইবে
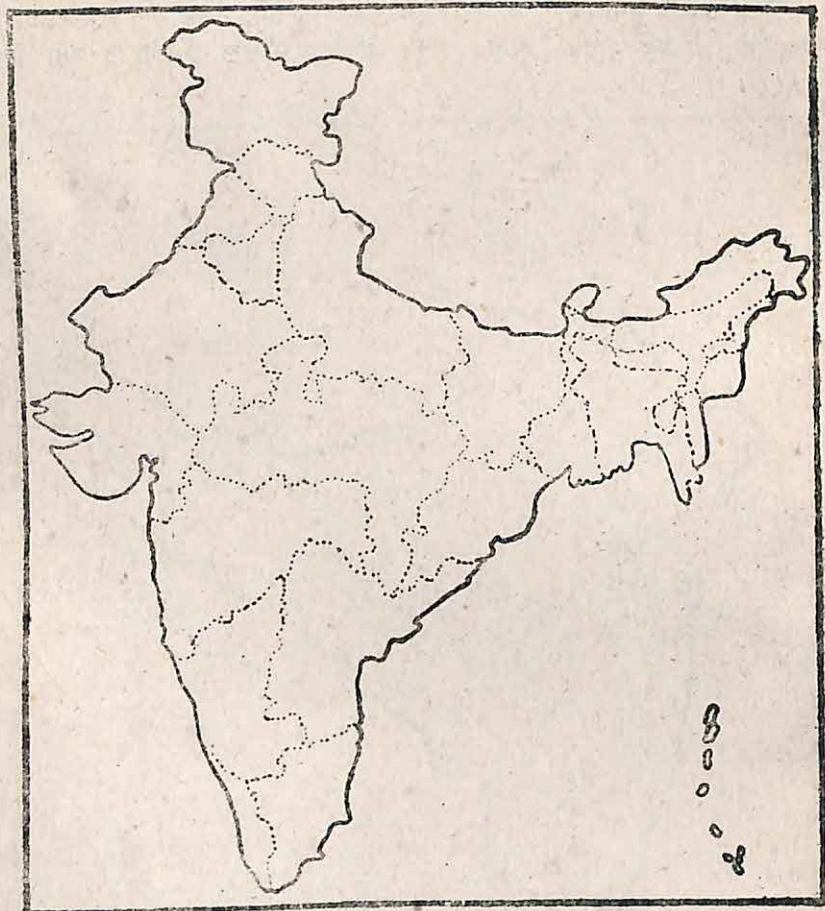
স্কেল—

জানুয়ারী মাসের জলবায়ু—

(i) উষ্ণতা (সমোষ্ণরেখা)

(ii) বায়ুপ্রবাহের দিক (তীর চিহ্ন)

(iii) বৃষ্টিপাত (ছায়াপাত বা অন্য সঙ্কেত চিহ্ন)

গ্রীষ্ম কালের উষ্ণতা ও বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে বর্ষাকালে বৃষ্টি কিভাবে এদেশের পূর্বদিক হইতে পশ্চিমে ক্রমশঃ কমিয়া যায়। আর পশ্চিম ঘাটের পশ্চিম ঢালে ও হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে অধিক বৃষ্টির বিষয়ও স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিতে হইবে।
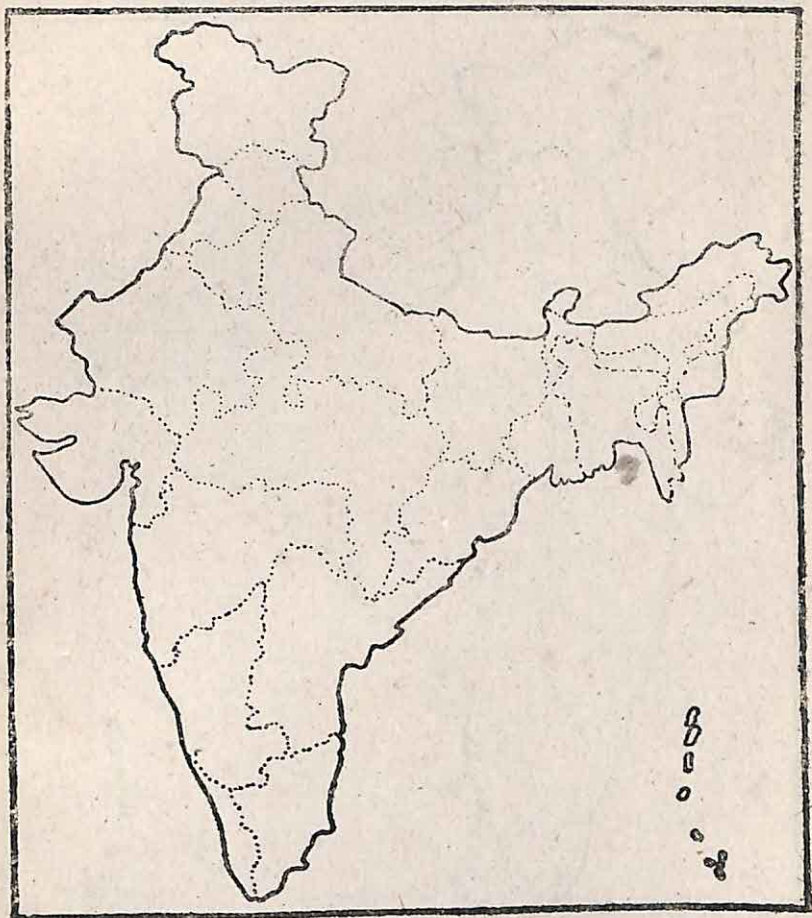
স্কেল—

জুলাই মাসের জলবায়ু—

(i) উষ্ণতা (সমোষ্ণরেখা)

(ii) বায়ুপ্রবাহের দিক্ (তীর চিহ্ন)

(iii) বৃষ্টিপাত (ছায়াপাত বা অন্য সঙ্কেত চিহ্ন)

(vii) স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ সংক্রান্ত মানচিত্রে এদেশের উদ্ভিদ্ অঞ্চলগুলিকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করার জন্য মানচিত্র পাঠ সম্পর্কে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা মনে রাখিতে হইবে এবং চিহ্নগুলি স্পষ্ট ভাবে দেখাইতে হইবে।
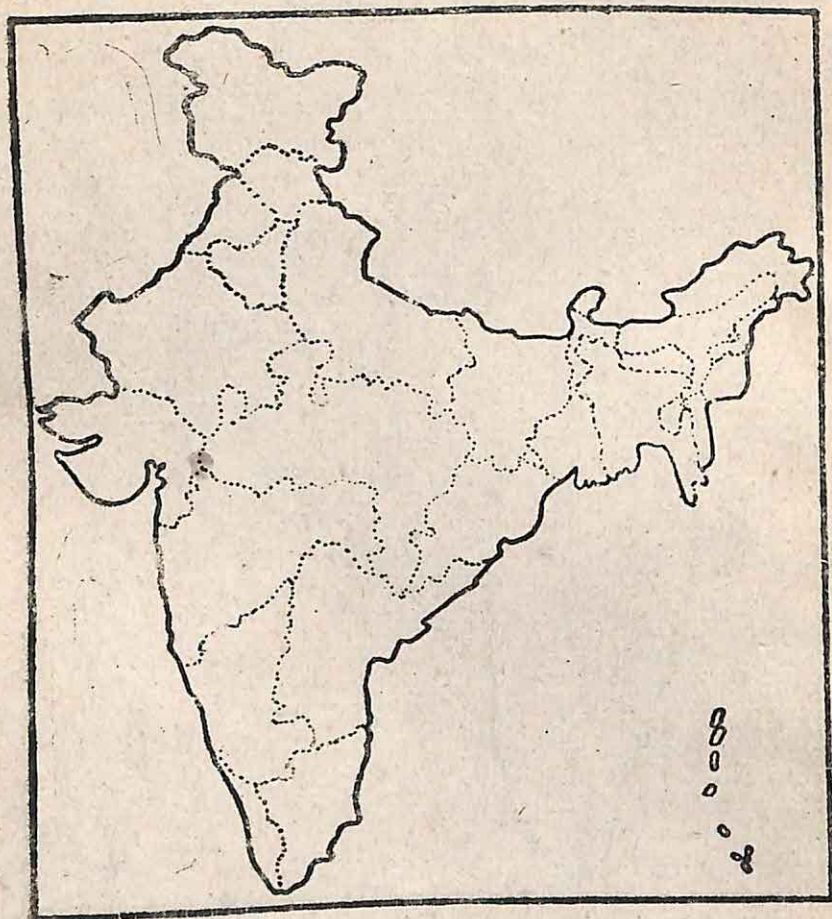
স্কেল—

বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ্—(বিভিন্ন সঙ্কেত চিহ্ন)

(viii) কৃষিজ সম্পদ্ সংক্রান্ত মানচিত্র আঁকিবার সময় মানচিত্র পাঠের সময় যাহা বলা হইয়াছে তাহা মনে রাখিতে হইবে। তারপর বেশী ও কম উৎপাদনের অঞ্চল নির্দেশ করিবে। বিভিন্ন কৃষিজ সম্পদের জন্য পৃথক্ পৃথক মানচিত্র আঁকিবে।
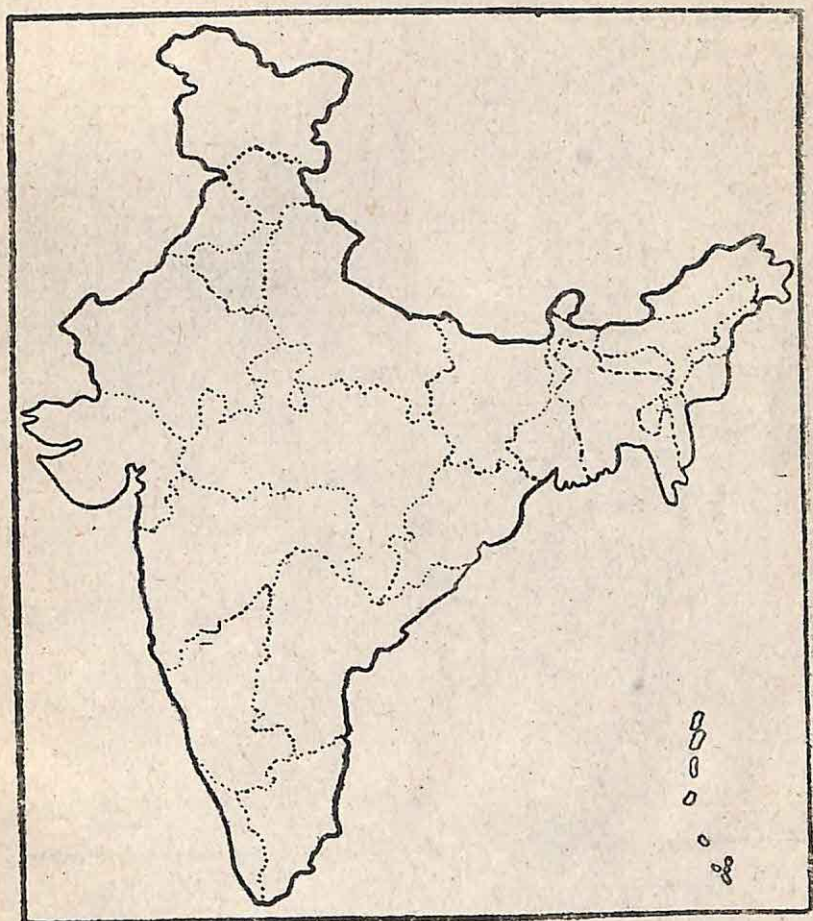
স্কেল—

কৃষিজ সম্পদ্—বিভিন্ন প্রকার কৃষিজ সম্পদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ মানচিত্র

(ix) শিল্পসম্ভার নির্দেশ করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ মানচিত্র ব্যবহার করিবে।

স্কেল—

শিল্পদ্রব্য—বিভিন্ন প্রকার শিল্পের জন্য পৃথক্ পৃথক্ মানচিত্র
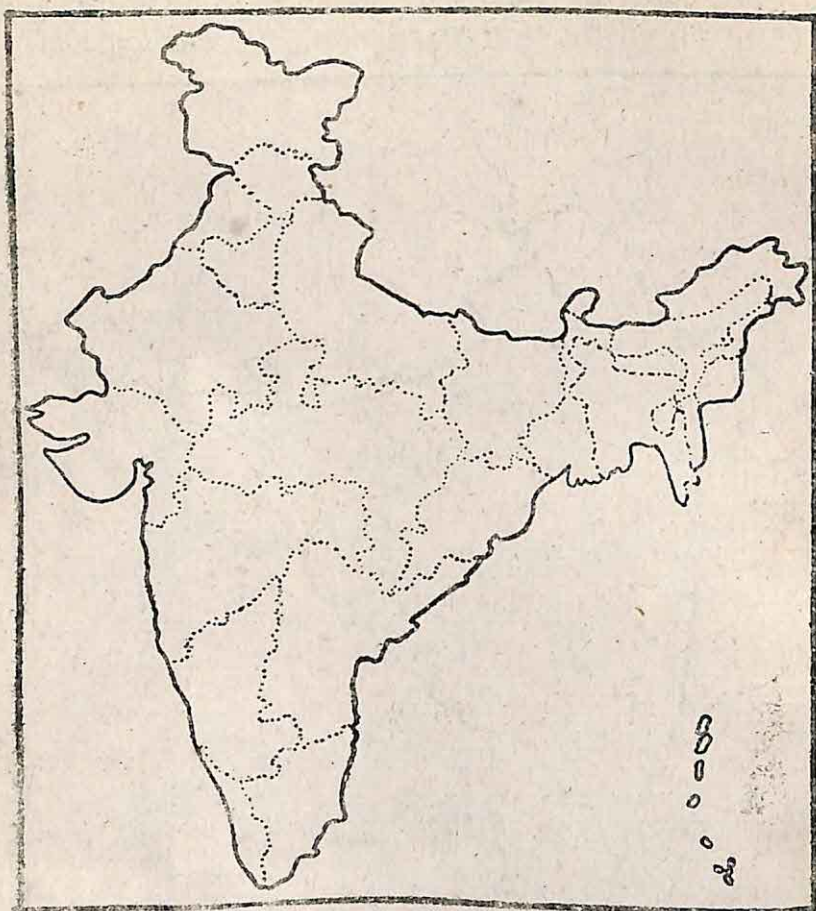
(x) লোকবসতির ঘনত্ব নির্দেশ করিবার জন্য নানারকম সঙ্কেত এবং বিন্দু—এই পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে পারা যায়। এবিষয়েও পূর্বে মানচিত্র পাঠের সময় যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা মনে রাখা দরকার।
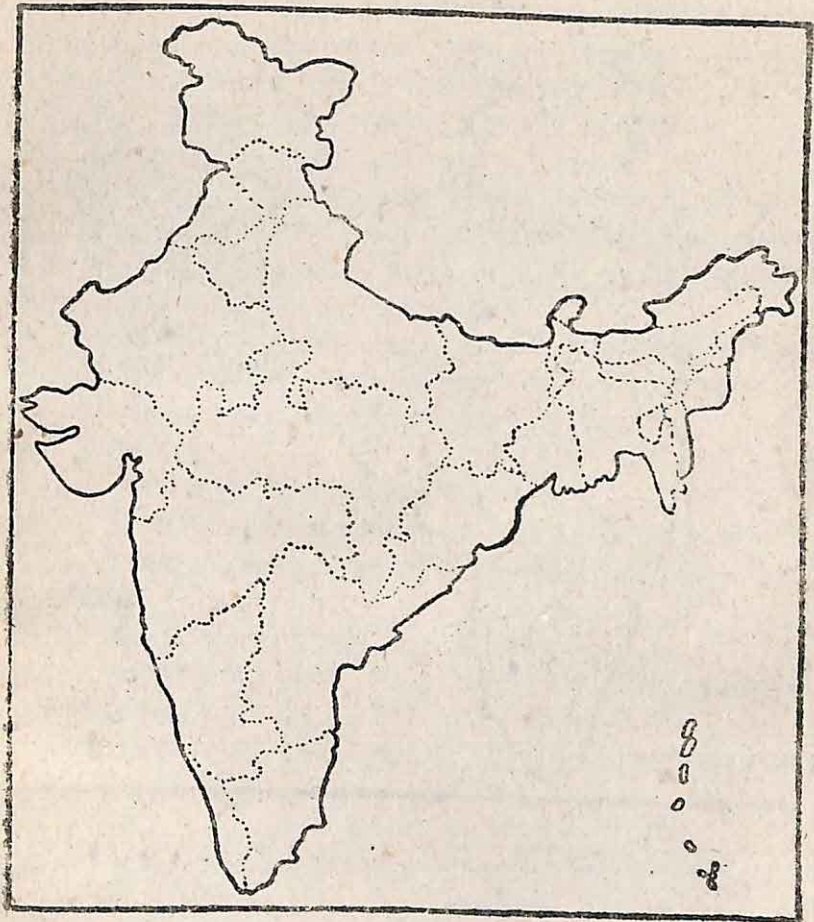
স্কেল—

লোকবসতি—(ছায়াপাতের সাহায্যে)
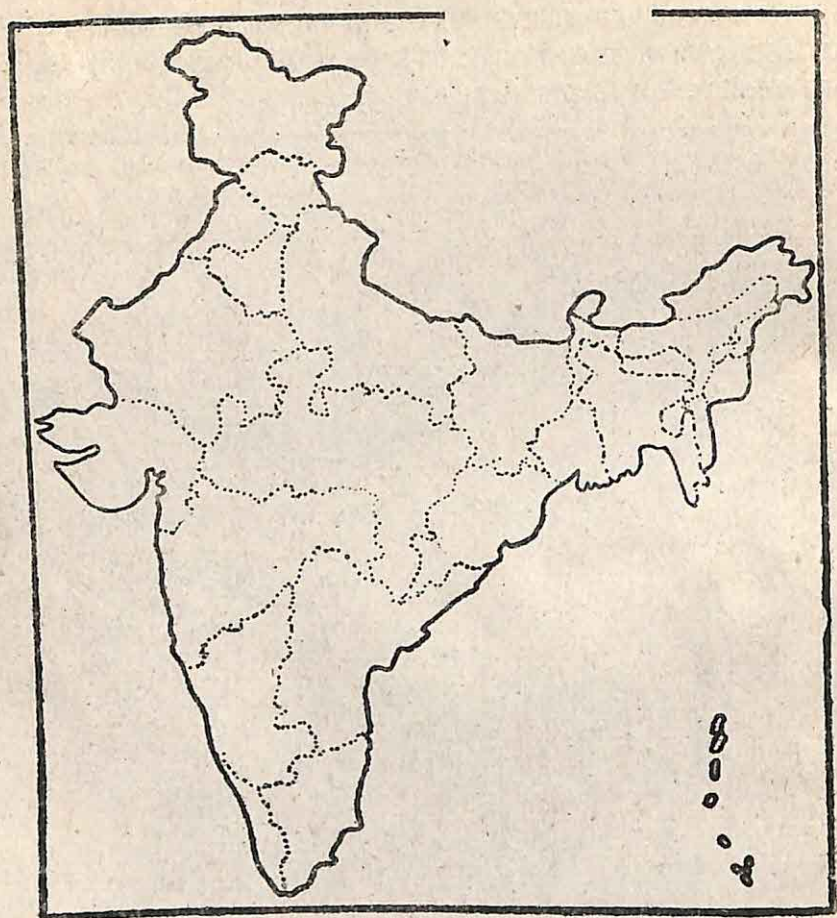
স্কেল—

লোকবসতি—(বিন্দুদ্বারা)

মানচিত্র অঙ্কন ও বিভিন্ন বিষয় নির্দেশ

ছাত্র-ছাত্রীগণ ষষ্ঠ শ্রেণীতে পশ্চিমবঙ্গের এবং এই শ্রেণীতে ভারতের মানচিত্র আঁকিবার পদ্ধতি শিখিয়াছে। এখন তাহারা নিজেরা যে পদ্ধতি সুবিধাজনক মনে করিবে সেই পদ্ধতিতেই এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের এবং নির্বাচিত অঞ্চলসমূহের (Type regions) মানচিত্রও আঁকিতে পারিবে। তবে ট্রেসিং টেবিল ও আলোর সাহায্যে আঁকাই সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। ছাত্র-ছাত্রীগণ নিম্নলিখিত মানচিত্রগুলি আঁকিবার পর তাহাতে এ সকল বিষয় নির্দেশ (point out) করিবে ঃ—

(1) এশিয়া

(i) উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম সীমাতে যে সকল দেশ আছে তাহাদের নাম লিখ।

(ii) ঠিক জায়গাতে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের নাম লিখ।

(iii) এশিয়ার বিভিন্ন অংশে হিমালয়, টিয়েনসান, আলটাই পর্বতের অবস্থিতি রেখা দ্বারা নির্দেশ কর ও পাশে পাশে নাম লিখ।

(iv) হোয়াং হো, ইয়াংসি কিয়াং, আমুর, ওব ও সিন্ধু নদীর গতিপথ রেখাদ্বারা নির্দেশ কর ও পাশে পাশে নাম লিখ।

(v) জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলঙ্কার নাম সঠিক স্থানে লিখ।

(2) মালয়শিয়া

(i) পশ্চিম ও পূর্ব মালয়শিয়া নির্দিষ্ট স্থানে লিখ।

(ii) সুমাত্রা (আন্দালাস) ও বোর্নিওর (কালিমান্তান) নাম নির্দিষ্ট স্থানে লিখ।

(iii) সিঙ্গাপুর ও কুয়ালামপুরের অবস্থিতি বিন্দুদ্বারা নির্দেশ কর ও নাম লিখ।

(3) ইরান

(i) এলবুর্জ পর্বতের অবস্থান নির্দেশ কর ও নাম লিখ।

(ii) আফগানিস্তান, ইরাক, পারস্য উপসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের নাম নির্দিষ্ট স্থানে লিখ।

(iii) আবাদান, তেহেরান ও বন্দর আব্বাসের অবস্থিতি বিন্দু দ্বারা নির্দেশ কর ও পাশে পাশে নাম লিখ।

(4) আফ্রিকা

(i) ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর, মোজাম্বিক প্রণালী ও আটলান্টিক মহাসাগরের নাম নির্দিষ্ট স্থানে লিখ।

(ii) কঙ্গো বা জায়রে নদী, নীল ও নাইজার নদীর গতিপথ রেখা দ্বারা নির্দেশ কর ও পাশে পাশে নাম লিখ।

(iii) ভিক্টোরিয়া ও ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের নাম নির্দিষ্ট স্থানে লিখ।

(iv) সাহারা ও কালাহারি মরুভূমির নাম নির্দিষ্ট স্থানে লিখ।

(v) ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতের অবস্থিতি নির্দেশ কর।

(5) নীল নদের অববাহিকা

(i) ভিক্টোরিয়া হ্রদের নাম লিখিয়া অবস্থিতি দেখাও।

(ii) বাহর-এল-জেবেল, হোয়াইট নীল, ব্লু নীল ও প্রধান নদী নীলের নাম নির্দিষ্ট স্থানে লিখ।

(iii) লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরের নাম নির্দিষ্ট স্থানে লিখ।

(iv) কায়রো ও আসোয়ানের অবস্থিতি বিন্দুদ্বারা নির্দেশ কর ও পাশে পাশে নাম লিখ।

(6) কঙ্গো অববাহিকা

(i) ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের নাম নির্দিষ্ট স্থানে লিখ।

(ii) উবাঙ্গি, কাসাই ও মূল নদী জায়রের (কঙ্গো) নাম নির্দিষ্ট অংশে লিখ।

(iii) স্ট্যানলি জলপ্রপাত দেখাও এবং নাম লিখ।

(iv) বিন্দুদ্বারা কিনসাসা ও ব্রাজ্জাভিলের অবস্থিতি দেখাও ও পাশে পাশে নাম লিখ।

2

4
5
6